মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ
তুলনামূলক পর্যালোচনা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে
পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য নিবেদিত

NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

মিতালী দত্ত

জুলাই ১৯৯৪

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

১। নিবেদন

২। প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা ১

ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব

বর্তমান গবেষণার বিষয় সীমা নির্দেশ

৩। দ্বিতীয় অধ্যায় – ১০

ক) মাধব কন্দলীর স্থান-কাল-জীবনকথা ও রামায়ণ পরিচয়

খ) মাধব কন্দলীর রামায়ণ বিশ্লেষণ

৪। তৃতীয় অধ্যায় – ২৭

ক) কৃত্তিবাসের স্থান-কাল-জীবনকথা ও রামায়ণ পরিচয়

খ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিশ্লেষণ

৫। চতুর্থ অধ্যায় – ১৭৬

বাল্মীকি-কন্দলী-কৃত্তিবাসের রামায়ণের সাদৃশ্যাদি বিচার

৬। পঞ্চম অধ্যায় – ১৯০

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৭। উপসংহার – ২০৪

৮। পরিশিষ্ট – গ্রন্থপঞ্জী ২০৭

নিবেদন

নি বে দ ন

একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় — হঠাৎ রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করতে নেমে কেন প্রশ্নটা অনেকের । শৈশবকালে রামায়ণ শোনেনি, পড়েনি, এবং পড়ে শুনে অবাক হয়নি, কাঁদেনি, হাসেনি এমন দুর্ভাগা শিশু এদেশে বিশেষ করে, হিন্দু পরিবারে কেউ আছে বলে জানি না । রাম-লক্ষ্মণ সীতা - হনুমান রাবণ এরা পরিচিত সকলের মতো আমারও ।

কর্ম ব্যপদেশে আমার পিতৃপরিবার আসামে ছিলেন । স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা সেখানেই । তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাতে এম.এ. পাশ করি । আসামে ফিরে যাই — দুটি কাজ হয়, একটি ডুয়ার্স কলেজে বাংলাতে অধ্যাপনা করার সুযোগ আর একটি একটি সম্ভ্রান্ত অসমীয়া পরিবারে বড় বধূ হবার বিরল সৌভাগ্য ।

গবেষণার ইচ্ছা জাগে, হয়ত অধ্যাপনা কর্মের সুবাদেই । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. হরিপদ চক্রবর্তী — কৃত্তিবাস ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনামূলক পর্যালোচনার বিষয় করতে বলেন -- দুটি ভাষা সমান দখলে থাকার জন্য আমি-ই নাকি যথার্থ অধিকারিণী । তাছাড়া বিষয়টিও চমৎকার । নাম নথিভুক্ত করে অগ্রসর হই । কিন্তু কাজ আকাঙ্ক্ষিত গতিতে অগ্রসর হয় না । সংসারে ঝামেলা বহু । পিতৃতুল্য অধ্যাপক ড. চক্রবর্তী নির্দেশ দেন — সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে তারপর অবশিষ্ট সময় থাকবে গবেষণার জন্য ব্যয় করতে । এতে কি হয় ?

যাহোক এর মধ্যে ছেলেমেয়ে বড় হল । কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখি নির্ধারিত সময় - পাঁচ বৎসর গত । ড. চক্রবর্তী, আমাদের মাসীমা ষোড়শী দেবীর সঙ্গে একবার ডুয়ার্সে আমাদের নতুন বাড়ীতে যান এবং কাজটি দ্রুত শেষ করতে বলেন । যথাসাধ্য তাঁরই প্রেরণা সূত্রে আবার নাম নথিভুক্ত করি । কিন্তু এবারও বাধা হল । মাসীমা আমাদের সকলকে ছেড়ে তাঁর বাঞ্ছিত বাসুদেব ধামে

চলে গেলেন । আর মনে হয় হবে না । হতাশ হয়ে পড়ি । কিন্তু এরই মধ্যে ড. চক্রবর্তী আসেন একবার ডিব্রুগড়ে – আমাকে অবিলম্বে কাজটি শেষ করতে বলেন । বলা নয় আদেশ দেন । অনেক কাজ করা ছিল, আমার সাধ্য মতো দ্রুত তার শেষ করি । করতে গিয়ে দেখি – সুদূর উত্তর আসামে বসে এ কাজ করা কঠিন । হুকুম মতো যথাশক্তি কাজটি শেষ করে ফেললাম ।

আমার গবেষণা নিবন্ধের শীর্ষক "মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ-- তুলনামূলক পর্যালোচনা" । অভিসন্দর্ভটি উপসংহার বাদে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে । প্রথম অধ্যায় ভূমিকা, ভারতীয় জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব এবং বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব এবং অভিসন্দর্ভের সীমাসূত্র নির্দেশ । দ্বিতীয় অধ্যায় (ক) মাধব কন্দলীর স্থান কাল জীবন প্রবাদ ও কন্দলীর রামায়ণ পরিচয়, (খ) কন্দলী রামায়ণ বিশ্লেষণ । তৃতীয় অধ্যায় - কৃত্তিবাসের স্থান - কাল - জীবন প্রসঙ্গ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিশ্লেষণ । চতুর্থ অধ্যায় – বাল্মীকি - মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাস রামায়ণের কাহিনী, চরিত্রাদির সাদৃশ্যাদি বিচার । পঞ্চম অধ্যায় - কন্দলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ - উপসংহার ।

এই কাজ করতে যাওয়ার পথে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি - সেই সময় আমাকে সাহস, পরামর্শ আর উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রথমেই শ্রদ্ধেয় ডা: হরেশ্বর দত্ত, শ্রদ্ধেয়াই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দত্ত, আমার কর্মস্থল ডুমডুমা কলেজের অধ্যক্ষ রবীন চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ ডঃ প্রফুল্ল মেধী ও অন্যান্য সহকর্মীদের নাম নিতে হয় । বিভিন্ন সময়ে সভা, সমিতিতে ডঃ মহেন্দ্র বরা, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ওনারাও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন । তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই । অবশেষে আমার দুটি সন্তান, মাসুম আর আরজু ওদের পড়তে বললে আমাকেও পড়তে বলে কাজ করায় উৎসাহিত করেছে ।

আমার গুরু ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, স্বর্গীয়া ষোড়শী চক্রবর্তী, শ্রীমহান চক্রবর্তী (দাদা), উমা চক্রবর্তী (বৌদি), নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত (দাদা), বৌদিমণি, ফুলদি এঁদের সাহায্য ছাড়া আমার যাত্রা সম্ভব ছিল না। এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করা হবে শুধু এটুকুই বলি এঁদের সস্নেহ আশীর্বাদ আমার পাথেয় হউক।

মিতালী দত্ত

ডুমডুমা কলেজ

রূপাই সাইডিং

৪।৭।১৯৯৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতীয় জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব ও বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতীয় জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব ও বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব

ক) "রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাস-ও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে — রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।(১)

খ) গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। * * * বাহু বল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত কামাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রু জলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। (১)

গ) বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোন ঐতিহাসিক গৌরব কাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে, বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে, এ কথা বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবর্ষীয় ঘরের শোক এত সত্য নহে — রাম লক্ষ্মণ-সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।"(১)

রামায়ণ সম্বন্ধে এই উৎকলন তিনটি রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন — দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রচিত রামায়ণী কথার ভূমিকা রূপে ১৬১০ বঙ্গাব্দে। পরে এটি প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাতিদীর্ঘ এই তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণের তিনটি পরিচয় পাওয়া যায় — (১) রামায়ণ ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস

(২) ভারতীয় আর্য সমাজের ভিত্তি স্বরূপ গৃহাশ্রমের কাব্য রামায়ণ (৩) রামায়ণের মূল বর্ণিতব্য বিষয় পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্র ।

রামায়ণ রচনার কাল, রামায়ণের কবি, রামায়ণে উল্লিখিত স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বর্ণিত বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার পরিচয়, কাহিনীর ঐতিহাসিকতা ও উৎস সম্বন্ধে ভারতীয় ও অভারতীয় পন্ডিতবর্গের মধ্যে নানা মতবিরোধ ও তর্ক আছে । কিন্তু উক্ত তিনটি বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ কম । বিশেষ করে ভারতের মনীষীগণের মনে রামায়ণ মহাভারতের সামাজিক অবদান ও মূল্যবোধ । এক সদর্থক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি সুস্পষ্ট ।

বৈদিক সাহিত্যে দশরথ, জনক, রাম, সীতা প্রমুখ কিছু নাম পাওয়া গেলেও রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ও সংযোগ অস্পষ্ট । যেমন সীতা-বৈদিক সাহিত্যে সাবিত্রী, কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর রামায়ণের সীতা পৃথিবী-দুহিতা । এতজ্জাতীয় সূক্ষ্ম তাৎপর্য ছাড়া অন্যান্য সূত্র পাওয়া যায় না । ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যধারায় উত্তরকালের মহাভারত পুরাণাদি ও বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে রূপকথার অনেক সূত্র পাওয়া যায় । সবগুলির সঙ্গে কোথাও সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য । এমন কি বৈপরীত্য থাকলেও রামায়ণ যে সুপ্রাচীন ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভারতে প্রবাহিত ছিল তা অনুমান করা চলে ।

রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ দুখানির পৌর্বাপর্ব সম্বন্ধে বিতর্ক আছে । ভারতীয় কাল ধারণায় রাম ত্রেতা যুগের এবং কৌরব পান্ডবরা দ্বাপর যুগের । তা ছাড়া কোন রামায়ণ গ্রন্থেই ভীমার্জুন বা পান্ডবদের কথা উল্লিখিত হয় নি, পরন্তু মহাভারতে বিভিন্ন স্থানে — বন পর্বে, দ্রোণ পর্বে, শান্তি পর্বে — রাম ও রামায়ণের কথা পাওয়া যায় । উত্তরকালে অর্বাচীন পুরাণে তার বিস্তৃতি ঘটেছে । বৌদ্ধ সাহিত্যে - দশরথ জাতক, অনামকজাতক প্রভৃতিতে এবং জৈন গ্রন্থাদিতে বিমল সুরি প্রমুখ পন্ডিতদিগের রচনায় প্রাকৃত ও সংস্কৃত দুটি ধারায়-ই রামকথার বিস্তৃতি আছে । অর্থাৎ ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জগতে সুদূর অতীত থেকে বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি বিশিষ্ট বহতা ধারায়-ই রামকথা সুলভ । কাজেই ইহা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান স্বাক্ষর ।

রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির নাম ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। বাল্মীকি কে ছিলেন – কোথায় ছিলেন – একাধিক ছিলেন কিনা তা নিয়েও তর্ক আছে। তিনি নিজে কাহিনীটি রচনা করেছিলেন না, বহু বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে রামায়ণ মহাকাব্যমালিকা রচনা করেছিলেন – এই জটিল প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে তাঁকে রামায়ণ গঙ্গার গোমুখ রূপে গ্রহণ করা যায়। হিমালয়ের বক্ষে পুঞ্জিত হিমবাহে বহু সমুদ্রের বাষ্পরাশির অবদান থাকলেও গোমুখ ধারায় যখন তার উৎসার ঘটে তখন তা একাত্মক। বাল্মীকি গোমুখ থেকেই রামায়ণ উৎসারিত - এইজন্য তিনি আদি কবি। বহু কবির ধ্যান সুপ্ত সাধনা – তার মধ্যে সমন্বিত।

রামায়ণের বাল-কান্ডে প্রথম তিনটি সর্গে – রামায়ণ রচনার ভূমিকা আছে। মহর্ষি বাল্মীকি একদা বেদজ্ঞ নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সংযমী, সত্যসন্ধ, প্রিয়দর্শন, জিতক্রোধ ইত্যাদি সর্ব গুণশালী কোন মানুষ আছে পৃথিবীতে ? নারদ বলেছিলেন যে এত গুণের একত্র সমাবেশ দেবতার মধ্যেও দুর্লভ তবে আছেন একজন – গাম্ভীর্যে সমুদ্রের, ধৈর্যে হিমালয়ের, বীর্যে বিষ্ণুর, সৌন্দর্যে চন্দ্রের, ক্রোধে কালাগ্নি, ক্ষমায় পৃথিবীর, দানে কুবেরের ও সত্যপালনে ধর্মের মতো মানুষ। তাঁর নাম রাম। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় –

কহ মোরে বীর্যবান ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র শ্রেষ্ঠি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজ ভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম -
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্যনাম।
নারদ কহিলা ধীরে – অযোধ্যার রঘুপতি রাম ॥

(ভাষা ও ছন্দ)

রামায়ণের বাল-কান্ডের প্রথম সর্গেই রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন নারদ। বাল্মীকি যাচ্ছিলেন রামের কথা ভাবতে ভাবতে তমসার দিকে স্নানের জন্য। সহসা এক ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ বধ দেখে বেদনার্দ্র হয়ে বললেন –

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী সমা:।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধী: কামমোহিতম্ ॥ (বাল-কান্ড ২।১৫)

বলেই চমকে উঠলেন। আদি কবি, তাঁর শোকার্ত হৃদয় থেকে এ কার আবির্ভাব। শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন এই যে সমান অক্ষর বিশিষ্ট চরণবন্ধ, ত-ত্রীলয়ে গেয় বাক্য আমার শোকার্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত হল – আজ থেকে এর পরিচয় হোক শ্লোক।

পাদবদ্ধো হ্যক্ষর সমস্ত-ত্রী লয়সমন্বিত:।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥ (তদেব ২।১৮)

তারপর আবির্ভূত হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। বাল্মীকিকে আদেশ করলেন – রামায়ণ রচনা করতে। কিন্তু রামের সব কথা তো বাল্মীকি জানেন না। ব্রহ্মা বললেন – সব অজানা বিষয়ও জেনে যাবে তুমি। তোমার কাব্যের কাণী কখনো মিথ্যা হবে না–

অজ্ঞাপ্য বিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ (তদেব ৪।৩৫)

রবীন্দ্র-ভাবনায় কাব্যসত্যটি আরও বৃহত্তর মাত্রা পেয়েছে।

নারদ কহিলা হাসি – সেই সত্য যা রচিবে তুমি।
যা ঘটে তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।''

(ভাষা ও ছন্দ)

বিশেষ এই যে রামায়ণে বক্তা আর ভাষা ও ছন্দে দেবদূত নারদ। যাহোক রামায়ণে ব্রহ্মা আরো বলেছিলেন – রামায়ণের সৃষ্টিতির কথা। বলেছিলেন যে যতদিন পৃথিবীতে থাকবে নদী ও পর্বত ততদিন পর্যন্ত থাকবে রামকথা, আর কাব্যের সঙ্গে কবিও থাকবেন লোকস্মৃতিতে চিরজীবী।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ।
তাবদ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ।
যাবদ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি ।
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ।। (তদেব ২৭, ৩৬-৩৮)

পৌরাণিক ভাবনায় রাম বিষ্ণুর অবতার । সৃষ্টি - স্থিতি - লয় – এই তিনটি নিয়ত কর্মের দায়িত্ব পুরাণ মতে তিনটি দেবতার হাতে ন্যস্ত । সৃষ্টি করেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, স্থিতি তথা রক্ষণ কর্ম বিষ্ণুর দায়িত্বে এবং নিধন শক্তির দেবতা শিবরুদ্র । জগতকে অশুভর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য, শুভ শক্তি বা ধার্মিকদের বাঁচাবার জন্য ধর্ম সংস্থিতির জন্য বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে উৎকট অশুভ শক্তির নাশ করে নতুন ব্যবস্থা করেন । ভারতের ভক্তি সাধনাতে অবতারগণের – বিশেষ করে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের – স্থান সমুচ্চ । অশ্রৌত উপনিষদাদি রাম-তাপনী, কলি সন্তরণ [illegible] তাপিনী, তার সার, রামরহস্যোপনিষৎ প্রমুখ উপনিষদে, অগস্ত্য সংহিতা, কলি রাঘব, বৃহৎবাসর প্রমুখ গ্রন্থে, মহাকাব্য ও হরিবংশে, মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বায়ু, ভাগবত-কূর্ম-বরাহ-অগ্নি, বামন-ভবিষ্য নারদীয় পদ্ম-গরুড়, স্কন্ধ প্রমুখ পুরাণ গ্রন্থে রামকথা পাওয়া যায় । তাছাড়া বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণাদি, রামায়ণাখ্য বহু রামায়ণ গ্রন্থ আছে । সংস্কৃত ললিত সাহিত্যেও রামকথা বা রামায়ণ-কাহিনী আশ্রিত বহু বিষয় নিয়ে মহাকাব্য, নাটক, চম্পু ইত্যাদি বিপুল ও কালজয়ী সৃষ্টি আছে – যেমন মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ ভট্টিকাব্য, জানকী হরণ, অভিনন্দ কৃত রামচরিত, রামায়ণ মঞ্জরী, উদার রাঘব প্রমুখ মহাকাব্য, ভাস রচিত অভিষেক ও প্রতিমা নাটক, ভবভূতি কৃত মহাবীর চরিত ও উত্তর রামচরিত উদাত্ত রাঘব, কুন্দমালা, অনর্ঘ রাঘব মহানাটকাদি নাটক – এক কথায় ললিত সংস্কৃত সাহিত্য রচনার অক্ষয় উৎস রামকথা ।

ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যাবতীয় ভাষায় রামায়ণ গ্রন্থের অনুবাদ আছে । এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তামিলী কম্বর রামায়ণ । তেলেগু দ্বিপদ রামায়ণ, মলয়ালম - রামচরিতম্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আর্যভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সিংহলী রামকম, কাশ্মীরী রামায়ণ, অসমীয়া মাধব কন্দলীর, বাঙালী

কৃত্তিবাসী, উড়িয়া সরলা দাস, হিন্দী রামচরিতমানস, মারাঠী ভাবার্থ রামায়ণ, গুজরাতী রামলালা না পদো, নেপালী ভানুভক্ত রামায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উর্দু-ফারসীতেও রামায়ণের অনুবাদ হয়েছে। বহির্ভারতে – তিব্বতী, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো চীন, শ্যাম দেশের রাম কিয়েন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কাজেই একথা বলা কোন দিক থেকেই অত্যুক্তি নয় যে বিষয় হিসাবে রামকথা ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন ভাষায় – সংঘবন্ধ প্রচারমূলক অভিযান ছাড়াই যে অভ্যর্থনা ও সমাদর পেয়েছে এবং এখনো যে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে – তা বিশ্বের যেকোন প্রাচীন সাহিত্যের অপেক্ষা মানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইন্দোনেশিয়া এখন ইসলাম ধর্মীয় দেশ কিন্তু প্রাচীন রামকথা সাহিত্য ও সংস্কৃতি – সেখানে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে বরণীয় ও সুস্থিত।

সাহিত্যের বিষয় হিসাবে রামায়ণের যে শাশ্বত মূল্য, তথা সর্ব মানবিক মূল্য আছে, রামকথা অবলম্বন করে ভারতে ও বহির্ভারতে সুদীর্ঘ কাল থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ তার প্রমাণ। সাহিত্যের মূল বিষয় মানুষ, মনুষ্য জীবন মানব-সমাজ তথা মানবত্বের রসাস্বাদন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা একটি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সংধান করি, তার চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনে অর্থ ও সার্থকতার স্পর্শ পাই, আস্বাদন করি কিন্তু সর্বদা সচেতন ভাবে করি না সে কারণে বিষয় মাত্রেই বিশ্বজনীন হয় না, সর্বদা ও সর্বথা মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে না। ভারতবর্ষের অন্তরে মনুষ্যত্বের ভাব আদর্শ ছিল – রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

"পরিপূর্ণ মানুষের আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল।"

সেটি রামায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছিল। সেই কারণেই কেবল ভারত-ভূমিতেই নয় বিশ্বের সব দেশ ও জিজ্ঞাসু জাতির অন্তরেই রামায়ণের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা আছে। তাহলেও এ কথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে অন্যান্য স্থানে রামায়ণের পাঠ ও আস্বাদনের তুলনায় – ভারত ভূখন্ডে রামায়ণের একটি বিশেষ গৌরব, স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। কারণ কেবল চর্চা বা সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য নয়, চর্যা ও জীবন সাধনার ক্ষেত্রেও রামায়ণ ভারতীয় জীবনের অপরিহার্য সম্পদ। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে বলেছেন – "ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস, বলেছেন "ভারতবর্ষীয় ঘরের লোক এত সত্য নহে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তাহার কাছে যত সত্য।" বলেছেন "রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।"

'গৃহাশ্রম' কথাটির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। ভারতীয় জীবনভাবনার ক্ষেত্রে চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্গ - জীবনচর্যা ও আদর্শের দিক থেকে বিচার্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চতুর্বর্গ বা চারিটি ভাববস্তু নিয়েই জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মানব জীবনের পূর্ণতা। মানুষ মাত্রেই কামনার পূর্তি প্রার্থনা করে। তার জন্য কতগুলি বিশেষ পন্থা বা উপায় অবলম্বন করে -- এই উপায়ের নাম অর্থ। আর অর্থ বা উপায়টিকে বিশেষ গুণমন্ডিত না করলে তা সুখদ ও স্থায়ী হয় না বলে এই বিশেষ গুণকে বলে ধর্ম। 'ধর্ম' কথাটির তাৎপর্য আরও গভীর। যাহোক ধর্ম-অর্থ-কাম, অর্থাৎ চাওয়া আর পাওয়া এই নিয়ে জীবন বা সংসার। এই জীবন ভারতীয় ভাবনায় বন্ধন বিশেষ – কর্মবন্ধন। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে জীবনে কর্মফল ভোগ করতে হয় সংসারের-ত্রিতাপ ভোগ করতে হয় এর থেকে মুক্তি বা মোক্ষই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। প্রথম তিনটি পুরুষার্থ আর চতুর্থটি মোক্ষটির গৌরবাধিক্যের হেতুর জন্য বিশেষ নাম পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধনক্ষেত্র জীবন, জীবনকেও প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় চারটি স্থিতিতে ভাগে বা আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য শিক্ষা জীবন, গৃহস্থ সংসার জীবন, তৃতীয় ছেড়ে গৃহ ছেড়ে বিশ্ব সংসারে পর্যটন। চতুর্থটি সবকিছু ত্যাগ করে মোক্ষ বা পরমপুরুষার্থের সাধন। চতুরাশ্রমের ভিত্তি গৃহস্থাশ্রম – কারণ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমী সাধুসন্তের ভরণপোষণের দায়িত্ব গৃহস্থাশ্রমীর বা গৃহীর। এইজন্য গৃহাশ্রমের প্রাধান্য। মনুসংহিতা বলেন যে যেমন বায়ু ছাড়া কোন জীব জীবনধারণ করতে পারে না, তেমনি গৃহাশ্রমের আনুকূল্য ছাড়া অন্য আশ্রমগুলি বাঁচতে পারে না –

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তব:।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমা:॥ (মনু ৩।৭৭)

সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের শুচিতা ও সুস্থিতির উপর ভারতীয় তথা মানবীয় জীবনসাধনার ধারাটির স্থিতি ও পুষ্টি নির্ভরশীল। রামায়ণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবনে গৃহ ও পরিবারের কথাটি বড় হয়ে উঠেছে -- মাতা-পিতা-ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী, পরিবার পরিজনের কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত – তার একটা উজ্জ্বল চিত্র আছে। লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদির অসংযম কি করুণ পরিণাম সৃষ্টি করে তার কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে রামায়ণে। এই প্রভাব জাতীয় জীবনে কত

গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায় বালিকাদের শৈশবে আচরণীয় ব্রতের মধ্যে । পুণ্যপুকুর ব্রতের প্রার্থনা মন্ত্র —

সীতার মতো সতী হব
রামের মতো পতি পাব
লক্ষ্মণের মতো দেওর হবে
কৌশল্যার মতো শাশুড়ি হবে
পতির কোলে পুত্র দেখলে
এক গলা গঙ্গা জলে
মরণ হোক হরির চরণ তলে ।

(খ) গবেষণা নিবন্ধের সীমা ও সূত্র নির্দেশ

হিমালয়ের বিভিন্ন নির্ঝর যেমন মূল গঙ্গাধারার মধ্যে সমর্পিত হয়ে তাকে পুষ্ট, প্রবল ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ও গতিতে উদ্বেল করে তুলেছে – সেই জানা, স্বল্প জানা অজানা ঝোরা বা ঝর্ণাগুলির অস্তিত্বের সূত্র-ত্র প্রশ্ন । আজ আর সাধারণ চিত্তকে চঞ্চল করে না, গঙ্গার মধ্যেই তার স্থিতি ও সমাধান লাভ করে তৃপ্ত থাকে । তেমনি বহু কথা, গাথা-কিংবদন্তী আখ্যান উপাখ্যান রামচরিত্রকে আশ্রয় করে দিকে দিকে ছড়িয়েছিল – তার সবগুলি সংহত করে মহর্ষি বাল্মীকি যে একটা সর্বাঙ্গীণ রূপ দিলেন – তার নাম রামায়ণ । নানা অঞ্চলে এই মহাগ্রন্থের নানা রূপান্তর ঘটেছে, নানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে রামায়ণের রূপবৈচিত্র্য আরও বেড়েছে । এই পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম । গোমুখের গঙ্গা, হরিদ্বারের গঙ্গা, বারাণসীর গঙ্গা আর সাগর সঙ্গমের গঙ্গা – ধারা হিসাবে অবিচ্ছিন্ন হয়ে রূপে রূপান্তরে কত বিচিত্র – কত সূত্র-ত্র । রামায়ণও তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের কবি গোষ্ঠীর মানসে স্বাভাবিক ভাবেই বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে । তার মধ্য দিয়ে সনাতন ও শাশ্বতকে অনিত্য জীবনের তরঙ্গের মধ্যে নতুন করে, নিজের করে আস্বাদন করার একটা অচেষ্টাকৃত সূত: প্রয়াস থাকে যা একাধারে জাতীয় ও আঞ্চলিক সনাতন ও সাময়িক । এই জন্যই ভাষা ও অঞ্চল ভেদে রামায়ণ অনুবাদে ও অনুভাবনায় সূত্র-ত্র দেখা যায় ।

পূর্ব ভারতেও রামকথা অবলম্বন করে প্রতিটি প্রাদেশীয় ভাষাতেই রামায়ণ অনূদিত তথা রচিত হয়েছে। অনেকে অংশত: বা পুরোপুরি কাহিনী রচনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে যুগপৎ রামায়ণের কাহিনী-চরিত্র-প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রদেশ ও প্রান্তগুলির জীবনধারা – দেশ ও কালে বিধৃত মানুষ ও মাটির সুত্র-ত্র পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় রচিত রামকথার মধ্যে – যেটি সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক, কালজয়ী ও জনপ্রিয় রূপে স্বীকৃত, তার পরিচয়ের মধ্যে বিশেষ ভাষা ও ভাষাভাষীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য রং ও রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে রামকথার কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এই স্থানটি কবি কৃত্তিবাসের আর অসমে – মাধব কন্দলীর। সুতরাং এই দুজন প্রতিনিধিমূলক মহাকবির রামায়ণের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ রসাস্বাদনের জন্য প্রস্তুত গবেষণা কর্মটি – তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়াস। অন্যান্য রামকথাকারদের প্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ থাকলেও মাধব কন্দলী, কৃত্তিবাস এই দুজনের রচনার রসাস্বাদন কার্যে এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য ও সীমা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধব কন্দলীর স্থান কাল জীবন প্রসঙ্গ ও রামায়ণ পরিচয়

(ক) প্রথম ভাগ - কবিকথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

'কবি' এই শব্দটিই রহস্যময়। কবি যদিও সমাজেরই একজন তবু যেন এক অপরিচয়ের আড়ালে থাকেন। কবিকে ব্যক্তিগত হিসাবে জানলেও ভাবগত ভাবে যেন কখনই জানা হয়ে ওঠে না। তাই কবি সর্বকালে সর্বযুগেই এক কল্পনার সামগ্রী। কবির কল্পনার প্রকাশই কবিকে জনসাধারণ থেকে একটু দূরত্ব দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন' কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবির ভাবগত জীবন ও সামাজিক জীবনে এই বিরোধ কখনো বা বৈপরীত্য - বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বোধহয় এই ধারণার ভিত্তিতেই এরিস্টোটল বলেছিলেন কবির রথের ঘোড়ার রঙ কালো ; কবি মিথ্যে কথা বলেন আর সেই মিথ্যেকে সত্য বলে ধরে নিতে পাঠকসমাজকে বাধ্য করেন। তাই তাঁর আদর্শ নগর থেকে কবিকে নির্বাসিত করেছিলেন।

ভারতের বিশ্রুত ও চিরায়ত দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণ বা রামকথা লৌকিক সংস্কৃতে রচিত ও স্বীকৃত সর্ব প্রাচীন মহাকাব্য এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রাচীন কালে থেকেই এই কাব্য নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অসমীয় ভাষার একদা প্রাচীন অনুবাদক কবি মাধব কন্দলী।

কবিরাজ কন্দলী

মধ্যযুগের কবি হওয়ার দরুণ তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পরিচয় সম্বন্ধে পাঠকের জ্ঞান খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। কাব্যের ভণিতায় বিভিন্ন স্থানে কবির নাম 'কবিরাজ কন্দলী' বা মাধব কন্দলী বিপ্র বা বিপ্ররাজ পাওয়া যায়। বিপ্র বা বিপ্ররাজ উল্লেখে প্রমাণিত হয় যে তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'কবিরাজ' সম্ভবত: কবির রাজা এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার কোন রাজার সভাকবিকে ছন্দের প্রয়োজনে 'কবিরাজ' সম্বোধনের সম্ভাবনাও থাকে। তবে মনে হয় এই সম্মান তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের দান। যাহোক তাঁর রামায়ণে মাধব ও এক স্থানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন –
"কবিরাজে কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয় মাধব কন্দলী মোর নাম।"

কন্দলী উপাধি বিশিষ্ট প্রাচীন আসামের বেশ কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন রুদ্র কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী ইত্যাদি। কন্দলী বিপ্রেরা সাধারণত: বিধ্যাত পন্ডিত হতেন আর কূটনৈতিক কাজেও পান্ডিত্যের প্রয়োজন হত। অনন্ত কন্দলীর উক্তিতে পাওয়া যায় যে তিনি তর্কে জয়ী হওয়ায় কন্দলী আখ্যা পেয়েছিলেন। সুতার্কিককেও কন্দলী আখ্যা দেওয়া যায়। সংস্কৃতে কন্দন শব্দের অর্থ যুদ্ধ বা তর্ক + অসমীয়া ই প্রত্যয় যোগে কন্দলী শব্দ নিষ্পন্ন। তাই এটা বংশানুক্রমিক উপাধি নাও হতে পারে। আবার আসামের নগাঁও অঞ্চলে 'কন্দলী গাঁও' নামে একটি গ্রাম আছে। এমনও হতে পারে যে এই গ্রামের কোনো অধিবাসী সুতার্কিক ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতির গোচরে কন্দলীর গ্রাম থেকে কন্দলী গাঁও হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে মাধব কন্দলী একজন জ্ঞানী পন্ডিত ও তার্কিক ছিলেন, এবং তাঁর রচনায় এর খানিকটা পরিচয়ও পাওয়া যায়। কথাটি বিশ্লেষণযোগ্য। তার্কিক কথাটির তাৎপর্য যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে নব্য ন্যায় শাস্ত্রের অন্য নাম তর্ক বিদ্যা। নব্যন্যায় শাস্ত্রে উত্তীর্ণ পন্ডিতগণ উপাধি লাভ করেন – তর্কতীর্থ, তর্করত্ন, তর্কভূষণ ইত্যাদি। মাধব কন্দলী নিজের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

১. বাল্মীকি রচিল শাস্ত্র পদ্য পদ্য ছন্দে।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ॥
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুজিলো।
সংযোগ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ॥
সমস্ত বয়স্ক কোনে জানিবাক পারে।
পক্ষী সব উরয় যেন পথা অনুসারে ॥ (কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড ৩১১১-১২)

পুনশ্চ - ২. সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
নম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত।
মহামাণিক্যের মোলে কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত ॥ (লঙ্কাকান্ড - ৬৭১০)

উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে মূল তাৎপর্য হচ্ছে এই যে কবি বিচার করে বাহুল্য বর্জন করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রামায়ণ রচনা করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য রেখেছেন যেন রস হানি না হয় এবং তাই কাব্যরসও প্রয়োজনে সংযোজন করেছিলেন। রামায়ণ অনুবাদে মাধব কন্দলীর এই বিচারবুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। বোধহয় এই কারণেই পরবর্তী কবি - অসম সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক শ্রীশঙ্করদেব বলেছেন —

পূর্ব কবি অপ্রমাদী মাধব কন্দলী আদি
তেহে বিরচিলা রামকথা।
হস্তীর দেখিয়া লাদ শশা যেন পারে ঘাদ
মোর ভৈল তেহ্নয় অবস্থা॥
(উত্তর কান্ড - ৭০৪১)

অপ্রমাদী - কথাটির তাৎপর্য - বুদ্ধিযুক্ত নৈপুণ্যে পারদর্শী, যিনি ভুলত্রুটি বর্জিত।

মাধব কন্দলী সুবক্তা ও সুকথক ছিলেন। তিনি রাজসভাতে ব্যাখ্যা করে - সর্বদা রামভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন বর্ণনা শেষ করে তিনি যে সব ভণিতা দিয়েছেন তার মধ্যে রচনার মাধুর্য ও অন্তরের রামভক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রত্যেক কান্ড থেকে একটি করে ভণিতা উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

১. শুনা রামায়ণ সভাসদ নিরন্তর।
শ্রবণেতে তরি সুখে সংসার সাগর॥
পরম মঙ্গল রূপ মাধবের নাম।
তাওক মনে ধরি ডাকি বোলা রাম রাম॥ (অযোধ্যা কান্ড ১৬৫৭)

২. পুণ্যক সঞ্চিয়োঁ সমক বঞ্চিয়োঁ
সংসার করি মোচনে।
এরি আন কাম বোলা রাম রাম
ঘুমিয়োক মনে মনে॥ (অরণ্য কান্ড ৩০৫৫)

৩. শুনা সভাসদচয় সাক্ষাতে অমৃতময়
রামর চরিত্র অনুপায় ।
মাধব কন্দলি ভনে বুলিলেক জনে জনে
ডাকি উচ্চ করি রাম নাম ॥
(কিষ্কি-ধ্যা কান্ড ৩৭২৩)

৪. শুনিয়োক সভাসদ মধুর কোমলপদ
পুণ্যকথা রামর চরিত্র ।
যমপথ নিবারণ কলিমল সংহারণ
মহারস শ্রবণে-অমৃত ॥ (সুন্দরা কান্ড ৪৮৪৮)

৫. শুনা নিরন্তরে ইটো রামায়ণ কথা ।
ইহেন মানবী জন্ম ন করিয়ো বৃথা ॥
রামর চরিত্র ইটো শুনা সভাসদ
বোলা রাম রাম পাইবা পরম সম্মাদ ॥ (লঙ্কা কান্ড ৬৬৮৬)

মাধব কন্দলীর রামায়ণ পাঁচ কান্ড কেন ?

এখানে আর একটি জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক । লঙ্কা কান্ডের সমাপ্তির কালে কবি মাধব কন্দলী লিখেছেন —

সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লঙ্কা পরিহরি সরোদ্ধৃত । (৬৭১০)

অথচ মাধব কন্দলীর রচিত পাঁচ কান্ড – অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কি-ধ্যা, সুন্দরা ও লঙ্কা কান্ড মাত্র পাওয়া যায় । এই খন্ডিত রামায়ণকে পূর্ণতা দান করার জন্যই শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধব দেব – যথাক্রমে উত্তরা কান্ড ও আদি কান্ড রচনা করে – সপ্তকান্ড রামায়ণ রচনা করেছিলেন । মাধব কন্দলীর কাল থেকে শ্রীশঙ্করদেবের ব্যবধান খুব বেশি হলেও শতাধিক বৎসরের অধিক মনে হয় না । এই সুদীর্ঘ কালের

মধ্যে কি রচিত দুই কান্ড লুপ্ত হয়ে যেতে পারে ? সাধারণ বুদ্ধিতে এবং জনপ্রিয় রচনার ধারার সাক্ষ্যে, তাই মনে হয় হয়ত মাধব কন্দলী আদি ও উত্তর কান্ড রচনা করেন নি, পাঁচটি কান্ডই রচনা করেছিলেন। উত্তরা কান্ড যে অপর কবি বা অন্য বাল্মীকি দ্বারা রচিত - মূল রামায়ণের অঙ্গ নয়, এই মত বহুল প্রচারিত। আদিকান্ডও রামায়ণের মূল কাহিনী — রামের বনবাস, সুগ্রীব মিলন - সীতাহরণ - রাবণ বধ — রচনার পরে পূর্ব সূত্র রক্ষার জন্য পরে সংযোজিত হয়েছিল বলে মনে করেন অনেক পন্ডিত। এই প্রসঙ্গে সপ্তকান্ড রামায়ণ গ্রন্থের সম্পাদক হরিনারায়ণ দত্ত বড়ুয়া সাহিত্যরত্নের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য — "প্রাচ্য আরু পাশ্চাত্য পন্ডিত কিছুমানর মতে রামায়ণ আদিতে পাঁচ কান্ড হে আছিল। আদিকান্ড আরু উত্তরাকান্ড পাচতহে রচিত হৈছিল। সংস্কৃত পন্ডিত কারো কারো মতে আদি আরু উত্তর কান্ডর কবিত্ব হেনো আন পাঁচ কান্ড তকৈ অনুপ্লাপর। তদুপরি এই দুই কান্ডত রামক পূর্ণ ব্রহ্ম করিছে কিন্তু মাজর পাঁচ কান্ডত বাল্মীকিয়ে রামক আদর্শ মানব হিচাবে বর্ণনা করিছে। সম্ভবত: এই কারণে বিভিন্ন ভাষায় কিছুমান রামায়ণ পাঁচ কান্ডর।"[২]

তাহলে গ্রন্থশেষে মাধব কন্দলী উল্লিখিত —

" সাত কান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরি হরি সারোদ্ধৃত।"

এই উক্তির তাৎপর্য কি ? উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। সুতরাং মাধব কন্দলী সপ্তকান্ড রামায়ণের মূল ও সার কথা সংগ্রহ করে এবং লম্ভা বা অসার অংশ পরিত্যাগ করে — পাঁচ খন্ডের মধ্যেই সম্পূর্ণ করেছেন, অনাবশ্যক বোধে আদি ও উত্তর কান্ড রচনা করেন নি — এই তাৎপর্যটি গ্রহণযোগ্য হয় না কি ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অসমের রামায়ণ প্রণেতাদের মধ্যে — এই দুই খন্ড পাওয়া যায় না কেন ? আসামের বিদগ্ধ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ লেখারু মহাশয়ও মনে করেন যে রামায়ণ সপ্তকান্ডে বিভক্ত বলেই সারসংক্ষেপ করার সময় সপ্তকান্ডের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বখ্যাত রামায়ণ গবেষক কামিল বুলকে - তাঁর গবেষণা গ্রন্থ রামকথায় উল্লেখ করেছেন যে মহাভারতের দ্রোণপর্ব, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ আদি প্রাচীন বর্ণনায় রামের বনবাস থেকে রাবণবধ পর্যন্তই উল্লেখ আছে। সুতরাং মাধব কন্দলী যে সপ্তকান্ডের মূল বিষয়

নিয়েই সংক্ষেপে সংহতভাবে রামায়ণের মূল কাহিনী পাঁচটি কান্ডে-ই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তদধিক দুই কান্ডের রচনার কথা অনাবশ্যকবোধে ভাবেন নি – এই সিদ্ধান্ত কি যুক্তিহীন সুকপোলকল্পিত মনে হবে ?

মাধব কন্দলীর রামায়ণে লৌকিক কথা

রামায়ণের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকগণের মধ্যে বাল্মীকির মূল কাঠামোর প্রতি আনুগত্যে ও সংহত যুক্তিসিদ্ধ কাহিনী কথনে – মাধব কন্দলীর স্থান সর্বাগ্রে ও সমুচ্চ । এই জন্যই মূলত: শ্রীশঙ্করদেব তাঁকে অপ্রমাদী কবি বলে আখ্যাত করেছিলেন। কবি নিজেও বলেছেন –

"সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লঙ্কা পরি হরি সারোদ্ধৃত ।"

অসার অংশ বাদ দিয়ে সারকথা বলেছেন তিনি । কিন্তু কবি তো কেবল ঘটনার বিবরণ করেন না ঐতিহাসিকের মত, তিনি কাব্য রচনা করেন । কাব্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য – কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্ । রস সৃষ্টির জন্য, কবিকে অবশ্যই নানা সরস কথা, বিষয়, ঘটনা সংযোজন করে কথাকে পাঠক ও শ্রোতবর্গের হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হয় । কবি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, আগ্রহী ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক বরাহরাজ শ্রীমহামাণিক্য দেবও । তাই নিজের কবিহৃদয়ের প্রেরণায়- ও পৃষ্ঠপোষক রাজার অনুরোধে কিছু কাব্য-রসও দিয়েছেন । কবি বলেছেন –

"কবিরাজ কন্দলি যে আমাকে সে বুলি বয়
করিনোহো সর্বজন বোধে ।
রামায়ণ সুপয়ায় শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে ॥
সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লঙ্কা পরি হরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিকর বোলে কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত ।" (লঙ্কাকান্ড - ৬৭১০)

112945
P / MAY
NORTH BENGAL

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড রচনা শেষ করে কবি সবিনয়ে বলেছেন যে রামায়ণ রচনায় রস সৃষ্টির জন্য যে কিঞ্চিৎ 'লম্ভা' ও বাল্মীকি রচনা বহির্ভূত 'লৌকিক' কথা ও ভাব আছে — তা নিবেদন করেছেন। পাছে রামচরিত্রের প্রতি একান্ত ভক্তিপত ও মহর্ষি রচনার প্রতি সর্বথা শ্রদ্ধাশীল কবি মাধব কন্দলীর এই জাতীয় রচনাংশে কেউ দোষ ধরেন — তার জন্য দেববাণী ও লৌকিক কথার পার্থক্য সম্বন্ধে নিবেদন করেছেন — পক্ষী যেমন তার ডানার শক্তি অনুসারে উড়তে পারে আকাশে, তেমনি কবিরও বুদ্ধি ও রস রচনার শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে — এই কথা স্মরণ করিয়েছেন ও মার্জনা ভিক্ষা করেছেন।

'' বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র গদ্য পদ্য ছন্দে।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ॥
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুঝিলো।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ॥
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে।
পক্ষী সব উরয় যেন পথা অনুসারে ॥
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে।
কতো নিজ কতো লম্ভা কথা অনুসারে ॥
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ॥

(কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড - ৩১১১-১৪)

মাধব কন্দলীর এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয় মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ রচনার প্রারম্ভে সেই বিখ্যাত বিদগ্ধ বিনীত বচনটি —

''মন্দ: কবি যশ:প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামন:।''[৫]

আদি ও উত্তর কান্ড সংযোজন পর্যালোচনা

মোটামুটি ষষ্ঠ শতক থেকেই বৈষ্ণব তথা ভাগবত ধর্ম আলোচনার সূত্রে সন্ত ও সাধক সাধিকাদের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারত তামিলে একটি বড় ভক্তি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চরাত্র, নারায়ণীয়, সাত্বত, একান্তিক প্রমুখ নানা নামে ছিল এর পরিচিতি। ভাগবদগীতা, ভাগবতপুরাণ, নারদসূত্র, শান্ডিল্যসূত্রাদি ছিল ইহার উৎস। বহির্মন্ডলে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য যুগল। তারপর শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত: রামানুজাচার্যের নেতৃত্বে তা সর্বভারতে ব্যাপ্তি লাভ করে। কর্ণাটকে পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি সন্ত, মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রমুক্ত সন্তমন্ডলীরনাম ভাগবতধর্ম বিকাশে উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতে রামানুজপন্থী সাধক রামানন্দ – রামনামকে প্রাধান্য দিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রধান বারজন শিষ্যের মধ্যে নানা জাত শ্রেণী বর্ণের সমন্বয় ঘটেছিল। যেমন রবিদাস ছিলেন চর্মকার, কবীর জোলা, ধন্না জাট কৃষক, সেনা ক্ষৌরকার, পীপা রাজপুত ইত্যাদি। এই ধারায়ই এসেছিলেন উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সন্ত সাধক মন্ডলী, তুলসীদাস, সুরদাস, দাদু, রজ্জব প্রমুখ। এই ভক্তি-আন্দোলনে প্রথম তরঙ্গ আসে রামকথার। রামায়ণ মহাকাব্যের সুললিত পুণ্যকথা তীর্থযাত্রীরা প্রথম আস্বাদন করেন। তারপর পূর্ব প্রান্তে উৎকল-বঙ্গ-আসামে তা বিস্তৃত হয়, কাব্য রচনা, পাঠ, গীত, নাটক, পালাগানে প্রাদেশিক ভাষায় রামকথা আলোচিত হতে থাকে। মাধব কন্দলীর রামায়ণ – এই তরঙ্গাবেগের প্রথম স্বাদু ফল। অবশ্য এই সময় জনজাতীয় রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও রামকথার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পৃষ্ঠপোষকরূপে রাজশক্তিকে লাভ করেও মাধব কন্দলীর কাব্যশক্তি প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। ভাগবত ধর্মের দ্বিতীয় তরঙ্গ কৃষ্ণাশ্রয়ী - মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপুরুষ শঙ্করদেব – পূর্ব ভারতে বঙ্গে ও আসামে যার মধ্য, ধারক বাহক ও চিরন্তন উৎস হয়ে আছেন।

মনে হয় এই ভাগবত ধর্মের প্রথম ধাপ - রামায়ণাশ্রয়ী দিব্যকথা, মাধব কন্দলী কৃত রামকথাকে স্থায়ী করার জন্যই শ্রীশঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব – বাল্মীকির প্রচলিত রামায়ণের মতো সপ্তকান্ডে পূর্ণতা দিবার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন।

কথা পুরুচরিতে উক্ত হয়েছে যে মাধব কন্দলীর রামায়ণ লুপ্ত হবার আশংকাতেই শ্রীশঙ্করদেব লেখনী ধারণ করেন। এই আশংকার একটি কারণ এই হতে পারে যে আহোম শক্তির কাছে কাছারি রাজশক্তির পরাভবে যে নৈরাজ্য দেখার সম্ভাবনা তাতে পুথিপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। উত্তরকবি ষোড়শ শতকের অনন্ত কন্দলীও রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং তার সঙ্গে ভাবাদর্শের দিক থেকে মাধব কন্দলীর রচনার পার্থক্য আছে। ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার রামায়ণের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেন যে অনন্ত কন্দলী রামায়ণে রামের অবতারত্ব আরোপ করেছেন যেটি বাল্মীকি তথা মাধব কন্দলীর অভিপ্রেত ছিল না। যাহোক শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেব – কিন্তু মহাপুরুষীয়া ধারার ভাব আরোপ করে – উত্তরকান্ডে ও আদিকান্ডে এবং গ্রন্থ সম্পাদনায় – মাধব কন্দলী তথা বাল্মীকির ধারার কোন অংশ ক্ষুণ্ন করেন নি।

কবির কাল বিচার

মাধব কন্দলীর রামায়ণে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে খুব কিছু জানা যায় না। প্রাসঙ্গিক, প্রত্নতাত্ত্বিকাদি বিচারে কন্দলীর জন্মস্থান মধ্য আসাম বা নগাঁও অঞ্চল বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ? লঙ্কাকান্ড সমাপ্তি মুখে কবি বলেছেন —

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
করিলোহো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে। (৬৭১০)

কে এই বরাহ রাজা মহামাণিক্য ? তিনি কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করতেন – এটি বিচার্য।

এই মহামাণিক্যের কাল সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে না এলে মাধব কন্দলীর কাল সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়া সম্ভব নয়। নানা বিদ্বান পন্ডিতের মতে মহামাণিক্য ছিলেন জয়ন্তাপুরের তিনজন কছারি রাজারা নিজেদের বরাহীরাজ বা জয়ন্তাপুরেশ্বর নামে মধ্য আসামের নগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডের শাসন করতেন। তাঁদের সময় ছিল ১২শ

থেকে ১৪শ শতাব্দী। শ্রীমাধবচন্দ্র বরদলৈ যিনি প্রথম রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এই বক্তব্য তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত আছে। তিনি আরও বলেছেন যে 'বরাহ' নাম 'বড়ো'দের সঙ্গে যুক্ত যে ভোট বর্মনরা আসামে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে শাসনও করতেন — আর কন্দলী নগাঁও অঞ্চলের লোক ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক গোটের মতে বিজয়মাণিক্য ও ধনমাণিক্যের কাল ১৪৪১ - ১৫৬৮ খৃঃ। এতে দেখা যায় যে মাধবচন্দ্র বরদলৈয়ের মত গ্রহণযোগ্য হলে মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের সমসাময়িক হয়ে পড়েন। কিন্তু মাধব কন্দলীর রামায়ণখানি বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য শঙ্করদেব এবং মাধবদেব এর সম্পাদনা করেছিলেন, সেকথা সর্বজনগ্রাহ্য। আর শঙ্করদেব মাধব কন্দলীকে 'পূর্বকবি অগ্রমাদী' বলে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন তাতে দুজনার সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকে না।

পন্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর মতে মহামাণিক্য ছিলেন কছারি বরাহী রাজা; যিনি ডিমাপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাজত্ব করতেন। একখানা প্রাচীন আহোম ইতিহাস মতে মহামাণিক্যের সপ্তম পুরুষ ডেইসিং আহোম দিহিঙ্গীয়া রাজার সমসাময়িক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আহোমরা ইতিহাস রক্ষায় প্রাচীনতম জাতিদের একটি।

পন্ডিত গোস্বামীদেবের মতে বরাহী রাজারা ছিলেন কছারিদের একটি শাখা যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা আহোমদের রাজত্বের পূর্বে সদিয়ার কাছাকাছি কোনোস্থানে সোনাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করে ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণপার শাসন করতেন। তাঁদের সম্ভাব্য সময় ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সদিয়া বর্তমান অরুনাচল প্রদেশের সীমায় অবস্থিত। মহাভারতোক্ত রুক্মি ও রুক্মিনীর দেশ বলেও পরিচিত।

শ্রীগোস্বামীর উল্লেখিত 'আহোম বুরঞ্জী' (আহোম ইতিহাস) 'কছারী বুরঞ্জী' নামে ডঃ সূর্য কুমার ভূঞার দ্বারা প্রকাশিত। এখানে রাজার নাম মহা-মণিফা রূপে বর্ণিত। সম্ভবতঃ ছয়শত বৎসরের পূর্বে কোন লিপিকারের প্রমাদে মহামাণিক্যে পরিণত হয়েছেন। মাধব কন্দলী কোন স্থানে রাজার নাম 'মহা-মণি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। (অরণ্য কান্ড - শ্লোক সংখ্যা ৩৩৯১) ফা-শব্দটি অসম জয়ন্তা এবং ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত দেখা যায়। আহোম রাজারা তো সবাই 'ফা' ছিলেন — যতদিন না হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন।

শ্রীগোস্বামী উল্লিখিত ডেইসিং বা ডেরচোংফার সমসাময়িক দিহিঙ্গিয়া (দিহিঙ - ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্র পারের রাজা) রাজার কাল হচ্ছে ১৪১৫ - ১৫৩১ খ্রী: । তাই মহামাণিক্যের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে বিচার করা যায় ।

কছারি বুরঞ্জীতে উল্লেখ করা কিছু স্থানের নাম নামচাং, বরহাট, সোনাপুর, বাণপুর ইত্যাদি নাম থেকে এই রাজাদের রাজধানী বর্তমান শিবসাগর জেলার কোন স্থানে ছিল বলে পন্ডিত বেণুধর শর্ম্মার বিশ্বাস । কেননা এই অঞ্চলে বাণফেরা, সোনারি, বরাহী ইত্যাদি চা-বাগানের অবস্থিতি তারই কাছাকাছি বলে ধরা যায় ।

শ্রীকালিরাম মেধীর মতে মহামাণিক্য চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন । মহামাণিক্য নামে একজন রাজা ১৩১৬ - ১৪০৬ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছেন । তাঁর কোন পূর্বপুরুষ কপিলী নদীর উপত্যকায় সম্ভবত: রাজত্ব করতেন । তৎপরবর্তী রাজা ধর্মমাণিক্যের দিনে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুই ব্যক্তি 'ত্রিপুরা রাজমালা' রচনা করেন । ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি উল্লেখযোগ্য ।

অসমীয়া ভাষাতত্ত্ববিদ ড: বাণীকান্ত কাকতি মহামাণিক্য জয়ন্তাপুরের কছারি রাজা আর মাধব কন্দলীকে আধুনিক নগাঁওর কোন স্থানের লোক বলে উল্লেখ করলেও কন্দলীর কাব্যের ভাষা বিচার করে তাকে চতুর্দ্দশ শতকের কবি বলেই বর্ণনা করেছেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কামরূপের পাল বংশের রাজা ইন্দ্রপাল আর ধর্ম্মপালও তাঁদের তাম্রশাসনে নিজেদের বারাহ বা শ্রীবারাহ উপাধি লিপিবদ্ধ করেছেন । আবার 'কথাগুরুচরিত' গ্রন্থে শ্রীশঙ্করদেবের গুরু মহেন্দ্র কন্দলীর চৌদ্দ পরিদর্শক বাঘ আচার্য্যের গুরুর নামও মাধব কন্দলী । কিন্তু চরিত গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ নেই যে শঙ্করদেবের বাল্যকালে মাধব কন্দলী জীবিত ছিলেন ।

ড: সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মাধব কন্দলীর পরিচয় পর্বে বরাহী রাজাদের নারায়ণের বরাহ অবতারের পৌত্র ভগদত্তের বংশধর বলে গৌরবান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ।

ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর 'রামায়ণের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সংক্ষেপে এই কথা বলেছেন যে 'বরাহ বা বারাহ' রাজ সম্ভবত: বৃহৎ মঙ্গোলীয় প্রজাতির কছারি শাখার একটা অংশ আর এঁরা বরাহী নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের রাজারা নারায়ণের বরাহ অবতারের বংশধর বা বরাহী বলে পরিচয় দিতেন। এঁরা হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করে কপিলী উপত্যকার ডবকা, যোগীজান অঞ্চলে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতকে এক উন্নত হিন্দু সভ্যতা গঠনে সহায়তা করেছিলেন আর রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের একটি শাখা প্রথমে বরাক উপত্যকায় আর তারপর ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ত্রিপুরা রাজ্য ভারত সরকারের অধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা 'মাণিক্য' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

মহামাণিক্য বা মহামণিক্যর কাল সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সময় পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পন্ডিতের মতানুসারে ধরে নেওয়া যায় যে মাধব কন্দলী চতুর্দশ শতকেরই কবি ছিলেন। চতুর্দশ শতকের পরবর্তী সময়ে অপ্রচলিত কিছু ধ্বনি ও রূপ মাধব কন্দলীর গ্রন্থে রক্ষিত। লিপিকারের প্রমাদে এ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নষ্ট না হওয়ায় যুগ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। এবং এইসব বিচারের ভিত্তিতে মাধব কন্দলীর সময় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে। আর এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে উত্তর ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ প্রথম অসমীয়া ভাষাতেই অনূদিত হয়। পন্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ উল্লেখ করেছেন যে এই প্রাচীন আঞ্চলিক গ্রন্থখানা আদি রামায়ণের পাঠ নিরূপণে ও ইতিহাস নির্ধারণে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে রামায়ণ ছাড়া মাধব কন্দলীর 'দেবজিৎ' নামে আর একখানি বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক ছিল বলে পন্ডিতগণ মনে করেন।

(খ) কাব্যকথা — রামায়ণ পরিচয়

অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লংকা — এই পাঁচ কাণ্ড রামায়ণ-মাধব কন্দলী রচনা করেছিলেন। পদ, দুলড়ী, ছবি, ছন্দ রীতিতে রচিত, মাঝে মাঝে ঝুমুরী আছে। সর্বত্র অলংকার সমৃদ্ধ, কাব্যপূর্ণ, ভাবগম্ভীর শ্লোকে রচিত। এবারে কাণ্ড পঞ্চকের বহিরঙ্গ পরিচিতি দেওয়া যাক।

অযোধ্যাকাণ্ডের বিষয়ানুক্রম এই প্রকার — মিথিলা থেকে শ্রীরামাদির অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, ভরত-শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে গমন, রামকে যুবরাজ পদে নিয়োগের জন্য প্রজাগণের অনুরোধ, অভিষেক আয়োজন, মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, রামের বনগমনে সম্মতি, লক্ষ্মণের ক্রোধ, কৌশল্যাকে রামের প্রবোধ, সীতা রামের অনুগমনের প্রার্থনা, রামের সম্মতি, লক্ষ্মণও বনগমনে প্রস্তুতি, বল্কল ধারণ, বন-যাত্রা। প্রজাদের এড়িয়ে রামের বনগমন, গুহমিলন, ভরদ্বাজ আশ্রমে রাম, সুমন্ত্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের কাছে দূত প্রেরণ, ভরতের অযোধ্যা আগমন, কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ, শত্রুঘ্নের হাতে মন্থরার লাঞ্ছনা, কৌশল্যা-ভরত সংবাদ, রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সদলে ভরতের বনে যাত্রা, গুহক-ভরত ভরদ্বাজাশ্রমে ভরত, চিত্রকূটে রাম-ভরত মিলন, রামের পিতৃতর্পণ, রাজ্যগ্রহণে রামের অসম্মতি, রামের পাদুকা সহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ও নন্দীগ্রামে বাস। মোট ৩১টি শীর্ষকে — ৩৩টি পদ ও ৮টি দুলড়ী নিয়ে সাকুল্যে ১১২৬টি শ্লোকে অযোধ্যা কাণ্ড রচিত।

অরণ্যকাণ্ডের সুরু একদিকে ভরতের নন্দীগ্রামে বাস ও রামাদির অত্রি আশ্রমে প্রবেশ আখ্যান নিয়ে। তারপর রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ মুনির দর্শন। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে বাস, ধর্মভৃত্য মুনি কর্তৃক মন্দকর্ণি মুনির বৃত্তান্ত কথন, ইল্বল-বাতাপি বৃত্তান্ত, অগস্ত্য আশ্রমে রাম, পঞ্চবটী বনপথে জটায়ুর সঙ্গে পরিচয়। শূর্পনখার নাক-কান ছেদন, রাম কর্তৃক ১৪ জন রাক্ষস এবং খরদূষণ বধ। শূর্পনখা রাবণের কাছে মারীচ রাবণ সংবাদ — রামের সঙ্গে বিবাদ করতে মারীচের নিষেধ, মায়ামৃগ রূপ ধারণ, রামচন্দ্রের মৃগানুসরণ, পরে সীতাকে একা রেখে লক্ষ্মণের গমন, তপস্বী বেশে রাবণের আগমন ও পরে পরিচয়

প্রদান, সীতার ভর্ৎসনা। সীতাহরণ, জটায়ুর বাধা দান, সীতার অভিশাপ, ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রের সীতাকে পায়স দান। রাম লক্ষ্মণের সীতা অন্বেষণ, জটায়ুর কাছে সীতাহরণের সংবাদ জটায়ুর মৃত্যু ও অগ্নি সংস্কার। কবন্ধ সমাগম ও নির্দেশ রামলক্ষ্মণের চম্পা সরোবর দর্শন। অরণ্য পদ ১৪ টি, দুলাড়ী - ৪ টি, ছবি-২টি ঝুমুরী - ৩টি, মোট ২০ টি শীর্ষক শ্লোকসংখ্যা ৭৭৩। একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে —

''কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি র্নবুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে।

সুবুদ্ধিরপি রামাদ্যৈঃ হৈমং হরিণমন্বগাৎ

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের মুখ্য বিষয় শ্রীরামের সহিত সুগ্রীবের মিলন, বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের মনান্তরের কাহিনী। উভয়ের বন্ধুত্ব, রাম কর্তৃক বালী বধ, বালীর রামনিন্দা, তারার বিলাপ ও অভিশাপ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, সুগ্রীবের প্রতি রাম-লক্ষ্মণের ক্রোধ, সীতা অন্বেষণে সুগ্রীবের নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ অঙ্গদের অসুর বধ বানর সৈন্যগণ স্বয়ং প্রভার আশ্রমে, বানরগণের সমুদ্রদর্শন ও সম্পাতি সাক্ষাৎ, সুপার্শ্বের সীতা ও রাবণকে দর্শনের বিবরণ। ১৮টি শীর্ষকে, ১৭টি পদ, ২টি দুলাড়ী, ৪টি ছবি ও ৩টি ঝুমরী সহ সাকুল্যে ৬০৩টি শ্লোকে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিত।

সুন্দরা কাণ্ডের মূল বিষয় বানরদের সমুদ্র লংঘনের মন্ত্রণা, হনুমানের জন্ম বিবরণ, হনুমানের লংকা যাত্রা, সুরমার সহিত সাক্ষাৎ, হনুর লংকা দর্শন, লংকাবর্ণনা, সীতা দর্শন, রাবণের সীতার প্রতি দুর্ব্যবহার বর্ণনা, সীতার সহিত হনুমানের কথবার্তা, হনুমান কর্তৃক রাবণের মধুবন ধ্বংস ও জম্বুমালী বধ, অক্ষ-কুমার বধ, ইন্দ্রজিত কর্তৃক হনুমানের বন্ধন, লংকা দাহন, হনুমানের প্রত্যাবর্তনে বানরগণের আনন্দ, কপিসৈন্যের মধুবন ভঙ্গ, শ্রীরামের নিকট সীতার সমাচার, রামের লংকামুখি সসৈন্যে গমন। রাবণের প্রতি বিভীষণের হিতোপদেশ ও রাবণ কর্তৃক পদাঘাত। বিভীষণের রাম শিবিরে আগমন। মোট ২২টি শীর্ষকে, ২৫টি পদ, ১টি দুলাড়ী, ৫টি ছবি, ১টি ঝুমরী সহ সাকুল্যে ৮৫৪ টি শ্লোকে - সুন্দরা কাণ্ড রচিত।

লঙ্কাকান্ডের মূল বিষয় ক্রমবিবরণ এই প্রকার – রামের শিবির দর্শনান্তে শুক সারণ কর্তৃক সমাচার জ্ঞাপন, রাবণ রামের কাটা মুন্ড দেখান সীতাকে, ও সরমার প্রবোধ। রাবণের প্রতি মান্যবন্তের উপদেশ সুষেণ পর্বত থেকে রামের লঙ্কা দর্শন, অঙ্গদকে লঙ্কার দূতরূপে প্রেরণ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্দী, নাগপাশ মোচন, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধ ও মৃত্যু, রাবণের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধ ও মৃত্যু, অতিকায়াদির মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ রাম লক্ষ্মণের মূর্ছা। হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়ন, কুম্ভ, নিকুম্ভ ও মকরাক্ষ বধ। তৃতীয়বার ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, সীতা বধ ও বিভীষণ কর্তৃক রামকে সান্ত্বনা। যজ্ঞভূমিতে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ। রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। হনুমানের ঔষধ আনয়ন গন্ধ-কালীর মুক্তি, কালনেমি বধ, লক্ষ্মণের জীবনলাভ ও গন্ধমাদন যথাস্থানে হনুমান কর্তৃক সংস্থাপন, রামরাবণের যুদ্ধ ও রাবণ বধ। বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক, হনুমানাদির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও রামের রাজ্য শাসন। ৩৪টি শীর্ষকে ৩০টি পদ, ১৭টি দুলড়ী, ১১টি ছবি সহ ১৮৭০ টি শ্লোকে লঙ্কাকান্ড রচিত। লঙ্কাকান্ড প্রারম্ভে "রামং লক্ষ্মণ পূর্বজং ও রাজেন্দ্র সত্যসন্ধং ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোক দুটি আছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সম্পূর্ণ তথ্য ও হিসাব গৃহীত হয়েছে "হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া সম্পাদিত সপ্তকান্ড রামায়ণ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭২ থেকে। পালা শীর্ষকগুলি সম্পাদক কৃত বলেই মনে করি, শুধু কাহিনী বিস্তারে ও বিষয় নির্দেশে সহায়ক বলে এই সংখ্যা উল্লিখিত। লঙ্কাকান্ডের প্রণাম সূত্রটিও যে সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত তা বুঝা যায়। যাহোক এবার একটা মোটা হিসাবে দেখা যায় যে মাধব কন্দলীর রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা (১১২৬ + ৭৭০ + ৬০৩ + ৬৫৪ + ১৮৭০) = ৫২২৩, পদসংখ্যা (৩৩ + ১৪ + ২৫ + ৩০) = ১১২, দুলড়ি সংখ্যা (৮ + ৪ + ২ + ১ + ১৭) = ৪০, ছবি সংখ্যা (০ + ৪ + ৪ + ৫ + ১১) = ২৪, ঝুমুরি সংখ্যা (০ + ০ + ০ + ১ + ০) = ৭। ইহাই সংক্ষেপে মাধব কন্দলীর রামায়ণের বহিরঙ্গ পরিচয়।

রামায়ণের বিশ্লেষণ

কাহিনীমূলক কাব্যের বিশ্লেষণে – (ক) কাহিনী বিন্যাস, (খ) চরিত্র সৃষ্টি, (গ) সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন (ঘ) শিল্প সৌন্দর্য এবং (ঙ) বিশিষ্টতা – এই পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করলেই গ্রন্থের বা বিষয়ের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ও মূল্যায়ণ করা হয় বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। আমরা এই ধারাটি অনুসরণের চেষ্টা করব।

রামায়ণ কাহিনী পরম্পরাগতভাবে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির মানস থেকে উৎসারিত। এখানে কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় – মুখ্যতঃ দুইটি – পরিবর্ধন ও সংযোজন। উত্তরকালের কবি বা অনুবাদক, তাঁর নিজস্ব রুচি, বুদ্ধি ও শিল্পধর্মের তাগিদে প্রাচীন কবির কোন কোন অংশ বর্জন করেন এবং নতুন কিছু কথার সংযোজন করেন। তাছাড়া নিজের অভিমত পরিমার্জনাও করে থাকেন। মাধব কন্দলী আদি কবির কাহিনী ধারা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছেন – মূল কাহিনী সংগঠনে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুতঃ মধ্যযুগের অনুদিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বলরাম দাস, কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী দাস ও মাধব কন্দলীর মধ্যে – কন্দলীই সর্বাপেক্ষা বেশী মূলানুগ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বর্ণনার দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে দশরথ নিজেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার কথা পূর্বে বলে পরে পুরু মন্ত্রী ও প্রজাদের অনুমোদন চেয়েছিলেন। মাধব কন্দলী কিন্তু প্রজাদের মুখ থেকেই রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যের প্রস্তাব প্রথম এসেছে বলেছেন। পাছে রাম কোন আপত্তি করে এই আশংকায় বোধহয় দশরথ নিজের বার্ধক্য, একটা দুঃস্বপ্ন দর্শন ও রাহুমঙ্গল যোগের ফলে অনিষ্টকর হতে পারে এই ভূমিকা করলেন –

স্বপ্নকে দেখিয়া বিচলিত মোর চিত্ত।
ভূমিকম্পে নির্ঘাত পরিল পৃথিবীত।
দুই গ্রহ মন্দ মোর রাহুরে মঙ্গলে।
দৈবজ্ঞে গণিয়া মোত কহিল সকলে॥ (১৫৪৭)

তার পূর্বে কৃন্দলীর দশরথ রামকে রাজ্য শাসন ও রাজার কর্তব্য বলতে গিয়ে ছয়-গুণ, সাত সিদ্ধি ও অষ্ট অঙ্গের কথা বলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের মূল বিষয় তিনটি -- রামের অযোধ্যা ত্যাগ করে বনে যাত্রা। দ্বিতীয়টি বনের পথে রাম, তৃতীয় রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের উদ্যোগ। মন্থরা-কৈকেয়ী অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। রামের যৌবরাজ্যের কথা শুনে আনন্দে কৈকেয়ী মন্থরাকে হার উপহার দিয়েছিলেন, মন্থরা সে হার ছুঁড়ে ফেলেছিল --

'ক্রোধত সেদিন কুজী অজ্বল্য সমান।
আছারিয়া ফেলাইলো কৈকেয়ীর দান।।

তারপর উঠল সপত্নীর প্রসঙ্গ, কৌশল্যা রাজমাতা তার অধীন থাকতে হবে।

দশরথ সাগর তরঙ্গী নদী তই।
অনপেতে শুখাই যাইবি জানলোহো মই।
প্রিয় গঙ্গা কৌশল্যা গম্ভীর বেগে বহে।
রাম অভিষেক বেকত কবি কহে।। (১৫৮০)

কৈকেয়ীর মতিভ্রম হয়। মন্থরার বুদ্ধিতে কাজ করলেন। কৃন্দলীর বর্ণনা সুন্দর। তারপর ঘটনাবলী স্বচ্ছ -- অনুবাদ বলে মনে হয় না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর দুই বর --

"রামকে চৈধ্য বরিষক নাগি দিয়া বনবাস
করি যুবরাজ রাজ্যে আনিও ভরত।"

দশরথ মূর্চ্ছিত হলেন, কৈকেয়ীর হাতেপায়ে ধরলেন, কাজ হল না। বিলাপ করে রাত্রি ভোর হল দশরথের। রাজা রামকে দেখতে চান। সুমন্ত্র গেলেন রামের ভবনে। রামের প্রাসাদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কৃন্দলী "রামের প্রাসাদ সোভে কৈলাস সমান" বলে সুরু করে ১৬৪১ থেকে ১৬৫২ পর্যন্ত ১০টি শ্লোকে। রাম এলেন। দশরথ বিমনা, নির্বাক। রাম বললেন পিতার তৃপ্তির জন্য সবকিছু করতে পারেন।

নিশ্চৈ বোলো যদ্যপি বাপের আজ্ঞা পাও।
রাজ্য পরিহরি তেবে বনবাসে যাও।। (১৬৯২)

তখন কৈকেয়ী দুইটি বরের কথা শোনালেন। দশরথ মূর্চ্ছিত হলেন। রাম এলেন কৌশল্যার কাছে। কিছু পূজো দিলেন তিনি। রামের মুখে বনগমনের আদেশ শুনে — "গুরিত ছেদিল যেন বৃক্ষ হোয়ে ছিন্ন" — সেই ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো অজ্ঞান হলেন মাতা। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে দশরথকে বধ করতে চাইলেন — "বুঢ়ারে আগতে কাটি করে খণ্ড খণ্ড"। রাম শান্তভাবে ভ্রাতা ও মাতাকে বুঝালেন। অনেক তর্ক, আবেগ, অভিমানের পর রামের কথা মেনে নিলেন কৌশল্যা — রাজাকে সেবা করার জন্য অযোধ্যায় থাকিবেন। এবং রামকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন তিনি। ছেলের কল্যানে রক্ষাবন্ধন ও মঙ্গল অনুষ্ঠান করলেন। অযোধ্যাকাণ্ডে বাল্মীকি পঞ্চবিংশ সর্গে ৪৬টি শ্লোকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এবং কৌশল্যা কেবল রামের জন্যই করেছেন কিন্তু কন্দলী সংলাপ পাঁচটি পদে রামলক্ষ্মণ দুজনের জন্যই উল্লেখ করেছেন।

দেবতা পূজিয়া দেবী করি সমাপতি।
মঙ্গল করিলা মন্ত্র জানিয়া সম্প্রতি ॥ (১৮০৩)

রক্ষা বেঁধে দিলেন, দেবতার নির্মাল্য দিলেন মাথায়।

ধৃতি স্মৃতি কীর্ত্তি কান্তি সতী সরস্বতী
গতি মতি শান্তি আদি করি তুতি নাতি ॥ (১৮০৪)
অসংখ্য রহস্য শাস্ত্র নিগম পুরাণ।
ইতিহাস আদি করি করন্তো কল্যাণ ॥
সিংহ বাঘ বোড আদি কুক্কুর মহিষ।
রাক্ষস পিশাচ সর্পগণ - মহাবিষ ॥ (১৮০৫)
বরাহ ভালুক গণ্ড গবয় সকল।
ঋষভ প্রভৃতি করি করন্ত মঙ্গল ॥ (১৮০৬)

ইত্যাদি মন্ত্রে রামলক্ষ্মণকে অভিস্নাত করে —

পুত্র দুইকো কৌশল্যা কোলেক লাগি নিলা।
আপন পায়ুর ধুলি দুইরো মাথে দিলা ॥ (১৮০৮)

এবার রামসীতা প্রসঙ্গ। রাম সীতাকে বললেন — গৃহে থেকে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করতে। বনে কষ্ট হবে, জন্তুজানোয়ার আছে - ইত্যাদিও বল্লেন। বাল্মীকি রামসীতা প্রসঙ্গটি ২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত ৫টি সর্গে মোট ১৫৮ টি শ্লোকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন — মিনতি, ভর্ৎসনা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, আকুতি, অভিমান, অশ্রু নিষেক, রতি ভাবের বিচিত্র সম্ভারে এই অংশটি মনোরম। কিন্তু কন্দলী প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন মাত্র ১৬ টি দুলড়ী ও ৩৭টি পদ মোট ৫৩টি শ্লোকে। কিছু অংশের সহজ অনুবাদ আছে। যেমন —

ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।

ইত্যাদির অনুবাদ

স্বামীর সুকৃতি ভুঞ্জে পতিব্রতাজন।
প্রভুর লাগত আর শোকে যাইব বন॥ (১৮৪৭)
বনক যাইস্তে আগে মিলিবেক যত।
ভাঙ্গিয়া কণ্টক বন চলিবো আগত॥ (১৮৪৮)

কন্দলী সাবিত্রী প্রমুখ সতী নারীর প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তির কথা বলেন নি সহজ সরলভাবে বলেছেন — কন্দলীর সীতা

তুমি এরি গৈলে মোর জীবন নিষ্ফল।
কটারো ভব নুহি ভুঞ্জিব গরল॥ (১৮৬৩)

বাল্মীকির সীতার উক্তি —

যদিমাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ॥ (২৯।১১)

কন্দলী এখানে -- রামের জবানী

মুখচন্দ্র মোরি অমৃতর অভিলাষে।
গ্রাসিবাক লাগি রাহু আসি (ভলাপাশে॥

ইত্যাদি (১৮২৮ - ১৮৩৫) আটটি পদ শ্লোকে — সীতার রূপযৌবনের বর্ণনা দিয়েছেন।

আবার সীতার জবানী –

চৈধ্যায় বরিষ লাগি তুমি বন যাইবা ।
ইন্দ্রমক লাগি মোর মানে বুবুয়াইবা ॥
চম্পক কলিকা যেন মোর কলেবর ।
নিন্দিত ভৃঙ্গ আছিলাহা যেহ্নো ভ্রমর ॥ (১৮৩৯)

ইত্যাদি শৃঙ্গার রস সর্বস্ব আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে । তা সাধারণ তরুণ তরুণীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্দর ও বাস্তব, কিন্তু রাম-সীতা সম্বন্ধে এর ঔচিত্য প্রশ্নাতীত নয় ।

যাহোক রাম সীতাকে বনে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন । লক্ষ্মণ-ও অনুমতি পেলেন রামের সঙ্গে যেতে । তারপর কাহিনী বাল্মীকির ধারায় প্রবাহিত । বনগমন কালে কৌশল্যা সীতাকে বলেছিলেন যে বনবাসী দরিদ্র স্বামীকে যেন সীতা উপেক্ষা না করেন । বাল্মীকির সীতা বলেছিলেন –

না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ ।
না পতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি - শতাত্মজা ॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ।। (২৯।৩০)

কন্দলীর অনুবাদ –-

সুস্বামী থাকন্তে শোভে সবে অলংকার ।
স্বামীহীন হৈলে হোয়ে সবে ছারখার ॥
পরিমিত ধন মাত্র দেন্ত বাপ ভাই ।
পুত্রত থাকিলে ধন হাতে তো না পাই ॥
স্বামীর ধনক সুখ ভোগে করে দান ।
কোন নারী করয় স্বামীক অপমান ॥
কোকিল শোভন হোয়ে সুশোভন রায়ে ।
নারীগণ শোভে পতিব্রতা ধর্ম ভাঁয়ে ॥
পুরুষ শোভন গুণ সদবিদ্যা ভারে ।
তাপস শোভন হোয়ে ক্ষমা অলংকারে ॥ (১৯৪২-৪৪)

লক্ষণীয় যে শেষের দুই চরণ অপ্রাসঙ্গিক হিতোক্তি । সুমিত্রার বিখ্যাত উক্তিটি — লক্ষ্মণের প্রতি —

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম ।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ (৪০।৯)

কন্দলী —

সীতা জেরে মই সম রাম দশরথ ।
অবিরোধে চল বনে কল্যাণের পথ ॥ (১৯৫৭)

তারপর সুমন্ত্রের রথে বনগমন এবং প্রথম রাত্রি তমসা নদীতীরে তৃণ-শয্যায় রাম-সীতা । শেষ রাত্রে অযোধ্যাবাসীদের বিভ্রান্ত করে সরযূ পার হয়ে শৃঙ্গবেরপুরে গুহ মিলন । পরদিন গঙ্গাপার হলেন । সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন । গঙ্গার কাছে সীতার প্রার্থনাটি নারীহৃদয়ের চিরন্তন মাধুর্যে ভরা । চতুর্দশ বৎসর পরে স্বামীদেবর সহ ফিরে এসে —

গবাং শত সহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয় চিকীর্ষয়া ॥
সুরাঘটসহস্রেণ মাংস ভূতোদানেন চ ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥

(সর্গ ৫২।৮৮-৮৯)

কন্দলী দ্বিতীয় শ্লোকটি বর্জন করে লিখেছেন —

অযোধ্যাক আসিলে করিবো বহু মান ।
তোমার উদ্দেশ্যে দিব সহস্র গোদান ॥ (২০৪৮)

অযোধ্যায় ফিরে গেলেন সুমন্ত্র কাঁদতে কাঁদতে আর রাম গেলেন প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে । সেখান থেকে চিত্রকূট পর্বত ও বনে । শীত ঋতুর অবসানে বহু পুষ্প সমৃদ্ধ বনের সৌন্দর্যে তিনজন প্রফুল্ল হলেন । দুই ভাই মিলে কুটির নির্মাণ করে বাসের ব্যবস্থা করলেন । চিত্রকূট বর্ণনা আছে । বাল্মীকি রাম চিত্রকূটের গাছ,

ফুল, পত্রশোভার পরিচয় দিয়েছেন ৬।৭টি শ্লোকে (৫৬ সর্গ ৬-১০) কিন্তু এই বর্ণনাটির অনুবাদ দিয়েছেন কন্দলী নিজের মতো করে ১৫টি পদে নিপুণভাবে মাঝে মাঝে শৃঙ্গার রসের ফোড়ন দিয়ে —

জাই যুতী বকুল বন্দুলি কর্ণিকার ।
কাঞ্চন তগর কুন্দ [illegible] মন্দার ॥
* * *   * * *   * * *
রাজহংস দেখা সীতা তোমার গমন ।
চক্রবাক যুগল তোমার দুই স্তন ॥
কলহংস রাব কাঞ্চি নূপুরর নাদ ।
বদন উপরে তোর দেখন্তে আহ্লাদ ॥ (২০৮০)

অযোধ্যা কাণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায় অযোধ্যা । সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, অন্ধ মুনির অভিশাপ কাহিনী সংলাপ বিবৃত হয়েছে । বাল্মীকির দশরথের বুকফাটা আর্তনাদ —

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন ।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা ক্বাসি গতঃ সুতঃ ॥ (৬৪।৭০)

কন্দলীর পাঁচটি পদে প্রতিধ্বনিত —

মরণ কালত রাম না দেখিলো তোক ।
মম কয়লকো গৈলে নেরাই বোহো শোক ॥
* * *   * * *   * * *
তাক দেখিবাক কপালেত ভাগ্য নাই ।
পুত্র শোকে হেরা মোর প্রাণ দুটি যায় ॥
হা রাম বুলিয়া শয্যাত এরি গায় ।
ভৈলন্ত নিশ্চেষ্ট সদা বিমোহিত ভায় ॥
বনত যাইবার ছয়দিন ভৈল কাল ।
মধ্য নিশা ভৈল মরিলন্ত মহীপাল ॥ (২১৮৩-৮৬)

তারপর শোক, ক্রন্দন - পুরু অমাত্যের সভা । তৈলদ্রোণীর মধ্যে দশরথের দেহ রেখে - ভরতকে নিয়ে আসবার জন্য দ্রুতগামী দূত পাঠানো গেল । ভরত দুঃস্বপ্ন দেখেছেন — পিতা গোময় হ্রদে পড়ে গেছেন, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূপতিত, পিতা কৃষ্ণবসন পরে রক্তমালা ধারণ করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন । স্বপ্নে পিতর দ্রাক্ষ ইত্যাদি ১টি শ্লোকে (৬১।৮ - ১৬) রচিত বাল্মীকি রচনার সুন্দর ও যথাযথ অনুবাদ করেছেন কন্দলী ৫টি দুলড়ীতে —

আকাশ ছানিয়া দেখিলো সম্পূর্ণ
পরিল চন্দ্র ভূমিত ॥
আওর দেখিলো সাগর শুকাইল
রাহুরে গ্রাসিল সুর ।
বিনা মেঘে আসি নির্ঘাত পরিয়া
যেন ভূমি হইল চুর ॥
আমার পিতৃর শরীর দেখিলো
রক্ত বস্ত্র আনি দিল ।
খির নুহি কায়া খাটিত বসাইয়া
দক্ষিণক লাগি নিল ॥ (২২২১ - ২২২২)

বাল্মীকি লিখেছেন "কৃষ্ণ বাসকম্" (৬১।১৪) কন্দলী "রক্ত বস্ত্র" । বাল্মীকির "রক্ত মাল্য" (৬১।১৫) অনুবাদ "রাতুল পুষ্পর মালা" (২২২৪) লিখেছেন কন্দলী । মনে হয় এখানে দুটি লাল রং হবার কারণ — কবির লৌকিক সংস্কারের জন্য । আর একটি বিশেষ বাল্মীকির ভরত আশংকা করেছিলেন যে ভরত নিজে পিতা, রাম বা লক্ষ্মণ একজনের মৃত্যুকাল সমাগত — "অহং রামোহথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি ।" (৬১।১৭) । কিন্তু কন্দলীর ভরত বলেছেন —

লয় মোর মন নোহে বা জীবন
তেজিলেন্ত মহীপাল ॥ (২২২৪)

যাহোক অযোধ্যার দূতরা সকলে ভাল আছেন জানিয়ে ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে চলে আসায় কৈকেয়ী সানন্দে পুত্রকে আহ্বান করে রামের বনগমন, ভরতের রাজ্যলাভ ও দশরথের মৃত্যুর খবর দিলেন। ভরত অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন – বাল্মীকির সেই উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি কন্দলী – তবে ভাবটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে লিখেছেন - নিজের ভাষায় –

শূর্পিণী নাগিনী নিকারুণী সংহারিণী।
নির্দয়িনী রাক্ষসিণী বাঘিনী দাষুণী॥
যক্ষিণী ডাইনি তই সুস্বামী ভক্ষিণী।
পিশাচিনী আরে রান্ডী ভৈলী অনক্ষিণী॥ (২২৭৭-৭৮)

শত্রুঘ্নর হস্তে কুব্জার লাঞ্ছনার দৃশ্যটি বাল্মীকি বলেছেন ৭৮তম সর্গে। লিপ্ত চন্দনা, রাজবস্ত্র পরিধানা, বিবিধ রত্নালংকারে ভূষিতা – 'বধ্বা রজ্জুভিরির বানরী' – অর্থাৎ পোষাক পরা বানরীর মতো কুব্জাকে প্রহরী শত্রুঘ্নর হাতে তুলে দেয়। শত্রুঘ্ন তাকে টেনে নিতে থাকে। সাধারণ ক্রোধের ব্যাপার। কিন্তু কন্দলী কাহিনীটিকে অধিকতর কৌতুকর প্রকাশ করেছেন। সুসজ্জিতা কুব্জার মনের ভাব ও উক্তি ---

বয়সত বর মই ভরতত করি।
কামবশ ভৈলে সিটো দোষক ন ধরি।
বিদিতে কুসাবে যেবে লায়ে কিছু করি
পুত্তরূপে তথাপিতো হৈয়ো পটেশ্বরী॥ (২২৮৭-৮৮)

ভরত রাজা হবে এবং সেটা তার-ই বুদ্ধিতে ও কৌশলে এ গর্ব স্বাভাবিক। সাজসজ্জা অলংকারাদি পরিধান করা - যেটা বাল্মীকি দেখিয়েছেন – সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু ভরতের ধাত্রীমাতার মতো কুব্জার চিন্তায় ও আচরণে বিকৃত কামভাবের প্রকাশও পটেশ্বরী হবার সাধ – ভয়াবহ ও বিকৃত রুচির পরিচয়। কৌতুক রস সৃষ্টির এই স্থূল প্রয়াস পীড়াদায়ক ও সুরুচির বাধক হয়নি কি ?

যাহোক কৌশল্যার সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ, প্রেতকার্য, ভরতের রাজ্য গ্রহণের অস্বীকৃতি এবং রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রার বর্ণনা মূলানুসারী। রামের বনবাস ব্যাপারে ভরত যে কিছুই জানেন না সেটি কৌশল্যার কাছে সপ্রমাণ করতে অনেক পাপের উল্লেখ করে ভরত শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। ৭৫তম সর্গে বাল্মীকি পাপ ও নরকের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। কন্দলী মাত্র দুটি পদে (২০১০-১৪) মাত্র মিথ্যা কথা, ব্রাহ্মণবধ, গোহত্যা, গুরুপত্নীগমন, রাজদ্রোহ এই জাতীয় কয়েকটি পরিচিত পাপের উল্লেখ করে মাত্রা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন

"যোহোয় কপট যেবে সত্য পটুয়াওঁ।
মিছা যবে বোলো ব্রহ্মবধ পাপ পাওঁ ॥
দশ কপিলাক মারো গুরুভার্যা হরো।
রামক পঠাইলো বনে আত্মঘাত করো ।। (২০১২-১৩)

যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য শপথ উচ্চারণ করা, ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি প্রয়োজনে সংযতভাবে শপথ বাক্যের কথা বলেছেন। কিন্ত কন্দলী এ ব্যাপারে সমধিক উদার ছিলেন। যেমন দশরথের আদ্য শ্রাদ্ধের পর অমাত্যগণ ও বশিষ্ঠ ভরতকে রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করায়, ভরত দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে বংশের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রই ন্যায্যত: সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। যদি অনার্যোচিত এই কর্ম ভরত করেন তবে ভূলকাজ রূপে নিন্দার্হ হবেন।

অনার্য জুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি,
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংশন ॥ (৮২।১৪)

কন্দলী এখানে ভরতকে দিয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন —

করোহো শপত গুরু তোমার অগ্রত।
তুমি হেন সহস্র ব্রাহ্মণ করো হত ॥
সহস্র কপিলা মারো গঙ্গার তীরত।
পূর্ব পুণ্য আছে যত নিয়ো হোক হত ।।
গোহত্যা, সুরাপান, অগম্যা গমন।

মহাপাপ ব্রাহ্মণর সুবর্ণ হরণ ॥
ইসব প্রমুখ্যে পাপ করো নিরন্তর ।
যেবে মই দ্রোহ চিন্তি আছো হো রামর ॥ (২০৭০-৭১)

এমন একটি কথা আছে গুহর কাছেও । সৈন্য সামন্ত সহ ভরত শৃঙ্গবের পুরে রাম সুহৃদ গুহর কাছে গেলে গুহ সন্দেহ করেছিলেন যে ভরত রামের ক্ষতি করতে এসেছেন বুঝি । ভরত বলেছিলেন যে রাম তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য তাঁকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি এসেছেন – অন্য কোন মতলব নেই, এটি সত্য কথা ।
"বুদ্ধিরণ্যা ন মে কার্যাঃ গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ।" (অযোধ্যা ৮৫।১০)
কিন্তু এ স্থলেও কন্দলী ভরতের মুখে শপথ বাক্য দিয়েছেন –

পিতৃতুল্য শ্রীরামক আনিবাক যাঁও ।
মিছা যদি বোলো ব্রহ্মবধ পাপ পাওঁ ॥ (২৪১৫)

ভরদ্বাজাশ্রমে সসৈন্য ভরতের প্রতি যে আতিথেয়তার বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি ৯১তম সর্গে, কন্দলী তার যথাযথ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ।

দশরথের পাটরাণীদের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় — কৈকেয়ী সম্বন্ধে ভরতের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য –

ক্রোধনামকৃত প্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানীনাম্ ।
ঐশ্বর্য কামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্য রূপিণীম্ ।
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসং পাপনিশ্চয়াম্ ॥
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ । (৯২।২৬-২৭)

কন্দলীর অনুবাদ –

কলহত প্রিয়া এহো প্রচণ্ড প্রভাও ।
কৈকেয়ী নামত আমি চণ্ডালের মাও ॥
রাম হেন ভাতৃক দিলেক বনবাস ।
ইহানে কারণে ভৈল বাপর বিনাশ ॥
জন্মান্তরে কতেক পাতক মই কৈলো ।
সি কারণে - আন গর্ভে উতপতি ভৈলো ॥ (২৪৮৩-৮৪)

এর পরের দৃশ্যটি চিত্রকূটের যেখানে ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা। সৈন্য কোলাহল শুনে লক্ষ্মণ গাছের মাথায় চেপে অযোধ্যার সৈন্য ও ভরতকে দেখলেন এবং ভরতের কুমতলব সমুখে ক্রোধ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভরতের সদিচ্ছা ও মহৎ চরিত্রের কথা জানালেন রাম। কৃত্তিবাসের অনুবাদ গাম্ভীর্যে কিছুটা কম হলেও যথাযথ। কিন্তু এখানে কন্দলী - রাম সীতার বিহার ও জয়ন্ত কাকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটিও বাল্মীকির-ই উক্তি এবং তা করা হয়েছিল সুন্দরা কাণ্ডে ৩৮তম সর্গে। অশোক বনে সীতা রামকে অভিজ্ঞান দেবার জন্য - এই একান্ত কাহিনীটি হনুমানকে বলেছিলেন। কন্দলী-ও সুন্দর কাণ্ডে এটি উল্লেখ করেছেন সংকেত বচন হিসাবে —

চিত্রকূটে শুইল মোর উরুত সিখানে।
কাকে যোত তনে ঘায় করিলেক টানে ॥ (৪৩৩৫)

মনে হয় কাহিনীর ধারা অব্যাহত রাখতেই কন্দলী - এই নাটকীয় ঘটনাটি পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী ঘটনা ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, পিতার মৃত্যু সংবাদ, শোক, গঙ্গায় তর্পণ, ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ডদান, রাজপদ গ্রহণের জন্য ভরতের প্রার্থনা, রামের বিচার, জাবালির উপদেশে রামের উত্তেজনা, ভরতকে পিতৃআজ্ঞা পালনের নির্দেশ, রামের প্রতিনিধি রূপে ভরতের বনবাস প্রার্থনা শেষে রামের পাদুকা নিয়ে সিংহাসনে রেখে জটাজুট ধরে ভরতের রাজ্য করার কথা এবং পাদুকা নিয়ে ভরদ্বাজ আশ্রম হয়ে নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন। কাহিনীর ক্রম ও ধারা কন্দলী সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন। তবে স্বাভাবিক কারণেই মূলের ভাবগাম্ভীর্য যুক্তির প্রখরতা রক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু যুক্তি, অনুমানাদি ছাড়াও ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে — ভূমিতে কুশ বিছিয়ে যে প্রত্যুপবেশন করেছিলেন অর্থাৎ ধর্না দিয়েছিলেন সেই সুন্দর চিত্রটি কন্দলী বাদ দিয়েছেন কেন কে জানে? অভিমানাহত ভরতের প্রতিবাদ চিত্রটি বাল্মীকির রচনায় অনুপম।

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি ॥ (১১১।১৩-১৪)

যাহোক রামের বিখ্যাত উক্তিটির যথার্থ অনুবাদ দিয়েছেন কন্দলী — বাল্মীকির রাম ভরতকে শেষ কথা বলেন —

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥
কামাদ্বা তাত লোভাদবা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্ ।
ন তন্মনাপি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥ (১১২।১৮-১৯)

কন্দলীর রামের উক্তি —

পূর্ণচন্দ্রমার কান্তি হরয় সকল ।
যেবে শুকাই পরে সাত সাগরর জল ॥
পাতাল পর্যন্তে সাতো পৃথিবী নশয় ।
মেরু মন্দরক আদি পর্বত খসয় ॥
সূর্য আদি গ্রহণ খসি ভূমিত পরিব ।
তথাপিতো আমি পিতৃবাক্যক নেরিব ॥
প্রাণর সংশয় যেবে মিলয় আমার ।
তথাপি তো ন যাইবে মোহোর অঙ্গীকার ॥ (২৫৭৮ - ৭৯)

* * *   * * *   * * *

কৈকেয়ী মারে মন্দ চিন্তিলা আমাক ।
মোর দৈবে আছে কোনে সাধিবেক তাক ॥
তাইক কোপ ন করিবি দেখোহো সঙ্খাত ।
এতিক্ষণে মোহোর মাথাত দেয় হাত ॥ (২৫৮১ - ৮২)

তারপর রামের পাদুকা মাথায় করে ভরতের নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন —

পানৈ থুবি নিয়া   পাটত বৈসায়া
তাওেক রাজা ভরে দিল ।
জয় জয় রাম   বুলি প্রজা সবে
আনন্দ অতি কৰিল ॥   (২৬০৯)

* * *   * * *   * * *

যত শিষ্ট শান্ত জন পালিলন্ত
দুষ্টক দান্ডি সর্বথা ।
এহিস্থানে আবে ভৈলা সমাপতি
অযোধ্যা কান্ডর কথা ॥ (২৬১২)

বাল্মীকি অযোধ্যা কান্ড সমাপ্ত করেছেন ১১৯টি সর্গে । কন্দলীর শ্লোক সংখ্যা ১১২৬ । তার মধ্যে পদ ৯৯৮ আর দুলড়ী ১২৮ ।

অরণ্য কান্ড

বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কান্ডের শেষে চার সর্গে (১১৬-১১৯) রামচন্দ্রের চিত্রকূট ত্যাগ করে অত্রি আশ্রমে প্রবেশ এবং সীতা-অনসূয়া সংবাদ বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কন্দলী এই অংশ দিয়ে অরণ্যকান্ড সুরু করেছেন । প্রথম বিরাধ বধ, তারপর শরভঙ্গ মুনির আশ্রম । মুনি রাম দর্শন করে যজ্ঞাগ্নিতে দেহ নিক্ষেপ করলেন । তাঁর নির্দেশে রাম এলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে । পঞ্চ অপেশ্বরী সরোবর (পঞ্চাপ্সার সরোবর) ও মন্দকর্ণি (মান্ডুকর্ণি) ঋষির আশ্রম । এইসব বনে রাম লক্ষ্মণ সীতা দশ বৎসর কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে ।

দশম বরিষ যেবে ভৈল নিবর্তন ।
পুনরপি সুতীক্ষ্ণ মুনিত্র দরশন ॥ (২৭৫৫)

সুতীক্ষ্ণ ঋষি রামচন্দ্রকে অগস্ত্যাশ্রমে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং ইল্বল ও বাতাপি রাক্ষস যুগলকে অগস্ত্য কী ভাবে বধ করেছিলেন তা শোনালেন । অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম হয়ে অগস্ত্যের আশ্রমে গেলে রামচন্দ্রকে অগস্ত্য দিব্যধনু অক্ষয় তূণ দিলেন । বাল্মীকি বলেছেন বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদন্ড শর, অক্ষয় তূণ যুগল ও সুবর্ণ নির্মিত তরবারি দিয়েছিলেন । কন্দলীর ভাষায় —

এহি ধনু বিষ্ণুরে থাপিয়া দেবরাজ ।
অসুরক দেখিয়া স্বর্গর কৈলা রাজ ॥
ব্রহ্মায়ে সৃজিলা অস্ত্র শত্রু ভেদি যাই ।
যাহাক হানিলে শর ব্যর্থক ন যায় ॥

বিশ্বকর্মা গড়িলেক অনেক যতনে ।
বাসবে দিলন্ত যোক কৌতূহল মনে ।।
ধনুর্বাণ ভরে বসুমতী নোহে স্থির ।
ত্রিভুবন বিজয়ী তুমি মহাবীর ।।
ধনুর্বাণ রামে যেবে শিরত চড়াইল ।
আকাশ নির্মল আরো খড়োক পাইল ।। (২৭৭৮-৮০)

তারপর বাল্মীকি যা বলেন নি — কন্দলী বলেছেন - রামের ধনুক দেখে লক্ষ্মণও মুনির কাছে একখানি চাইলেন ।

হেন কথা শুনি মুনি হাসিয়ালি লন্ত ।
দিব্য ধনুখান আনি তাহাঙ্ক দিলন্ত ।। (২৭৮৪)

তারপর অগস্ত্যের নির্দেশে পঞ্চবটী গেলেন তাঁরা । পঞ্চবটীতে সাক্ষাৎ পেলেন জটায়ুর। শরৎকাল গেল এল হেমন্ত কাল । বাল্মীকি সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কন্দলী ঋতু বর্ণনায় আগ্রহী নন । পরবর্তী শূর্পনখার কাহিনীটি তিনি বর্ণনা করেছেন বাল্মীকির ধারায় । বর্ণনা করেও কিন্তু নিজস্ব কল্পনায় শূর্পনখার মুখে লক্ষ্মণের রূপযৌবনের সুদীর্ঘ মৌলিক বর্ণনা দিয়েছেন ।

শূর্পনখা বোলে শুন লখাই মহাবীর ।
কামদেব যেন শোভে তোমার শরীর ।।

ইত্যাদি ২৮১৭ থেকে ২৮২২ ছয়টি পদে তরুণ পুরুষের কামোদ্রেককারী রূপের বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ । উল্লেখযোগ্য যে বাল্মীকি কেবল একটি শ্লোক দিয়েছিলেন শূর্পনখার মুখে ।

অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী ।
ময়াসহসুখং সর্বান দণ্ডকান বিচরিষ্যসি । (১৮।৭)

কন্দলীর শূর্পনখার উক্তি —

দণ্ডকার বন তিনি ভুবনত সার ।
ইহাত রমণ হোক তোমার আমার ।।

যে হেন নদীর জল নআকস্থ রহি ।
সেইমতে নরর যৌবন যায় বহি ॥ (২৮২২-২৩)

তারপর কাহিনীর অনুরূপ বিন্যাস । সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কান কেটে দিলেন খড়্গ দিয়ে । শূর্পনখা খরদূষণের কাছে ছুটে গেল । ১৪ জন বীর পাঠালো খরদূষণ । রামের হাতে মারা গেল তারা । শূর্পনখা ভর্ৎসনা করে খরদূষণকে পাঠান । পরে দূষণ, ত্রিশিরা ও খর রামের হাতে হত হন ।

বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে রাবণ-খরদূষণ বধ ও সীতার রূপের কথা প্রথম শুনেছিলেন অকম্পন নামে রাক্ষসের মুখে । সীতাহরণের বুদ্ধি অকম্পনই রাবণকে দেয় । কামার্ত রাবণ বনে যান তারকানন্দন মায়াবী মারীচের কাছে । সীতাহরণের প্রস্তাব শুনে মারীচ রাবণকে বারণ করেন এবং ফল খারাপ বলেন । রাবণ ফিরে আসেন লংকায় । কন্দলী অকম্পন অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন ।

শূর্পনখা খরদূষণের মৃত্যু, রামলক্ষ্মণের কথা বিশেষ করে সীতার অনিন্দ্য রূপের কথা জানাল । শূর্পনখা নাক-কান কাটার কারণ কি ? বাল্মীকির শূর্পনখা সম্পূর্ণ মিথ্যা করে বলেছে যে সীতাকে রাবণের জন্য ধরে আনার চেষ্টা করেছিল সে তাই লক্ষ্মণ নাক কান কেটে দেয় —

তান্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরাম্ ।
ভার্যার্থেতু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্ ।
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজঃ ॥ (১৪।২১)

কন্দলীর শূর্পনখার উক্তি —

কোল চাপিলোহো মই ভুঞ্জিবাক মনে ।
ধরিনাক কান মোর কাটিল লক্ষ্মণে ॥ (৩০১০)

রাবণ চললেন মারীচের কাছে । বাল্মীকির মতে দ্বিতীয়বার । মারীচ বুঝান রামের শৌর্যের কথা । এবং এই কার্যের নিন্দার কথা বলেও সীতাহরণে সাবধান করেন রাবণকে —

আসন্ন কালত আহি বিনাশন বুদ্ধি ভৈল
মাথে তোর যমকাল নাচে ।
অগণির শিখাসম সীতাক হরিতে চাস
মরিবার কতকাল আছে । (৩০৩৯)

তারপর কন্দলীর মারীচ বলল সম্পূর্ণ নতুন কথা । ভাই বিভীষণ ও বহিনী ত্রিজটার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে —

তোর হিত লয় ত্রিজটা বহিনী
হিত বিভীষণ ভাই ।
দুই হস্তত পরে লংকার ভিতরে
তোর ইষ্ট কেহো নাই ॥ (৩০৫৩)

লক্ষণীয় যে কন্দলীর মতে মারীচ রাবণের মমাই আর ত্রিজটা বহিনী । যাহোক তারপর মারীচ নিজের অতিচারণ করে বালক রামের বিক্রম ও দন্ডকে যুবক রামকে আর একবার আক্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রাবণকে নিবৃত্ত করতে পারল না । আদেশ না শুনলে মারীচের প্রাণদন্ড হবে তাই —

রামতো মরিবো মরিবোহো রাবণত ।
জীবন নাহিকে হেন গুণিলো মনত ॥
তোহর হাতত কিয় প্রাণক সুজাওঁ ।
রামর হাতত পরি স্বর্গে চলি যাওঁ । (৩০৬৪)

বাল্মীকির মারীচের উক্তি একটু আলাদা । রাম আমায় বধ করবেন আমি কৃতকৃত্য হব, তোমাকেও রেহাই দেবেন না ।

মাংনিহত্যত্ত রামোহ সাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি ।
অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি ম্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ । (৪১।১৭)

যাহোক তারপর মায়ামৃগ দর্শন ও (সীতাকে) ধরবার জন্য সীতার আব্দার এবং লক্ষ্মণকে সীতার পুহরায় রেখে রামের মায়ামৃগানুসরণ।

এখানে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে এই শ্লোকটি —

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে ।
সুবুদ্ধিরপি রামোহয়ং হৈমং হরিণমন্বগাৎ ।। (অরণ্য কাণ্ড)

কিন্তু বাল্মীকিতে নেই ।

তারপর মূল ও অনুবাদের কাহিনী মোটামুটি ঐক্য আছে । মারীচের লক্ষ্মণের নাম ধরে আর্তনাদ, সীতার বিহ্বলতা, লক্ষ্মণের প্রতি অশ্রাব্য কটূক্তি, লক্ষ্মণের রামের নিকট গমন, রাবণের আত্মপ্রকাশ, সীতার সঙ্গে বাদানুবাদ, সীতাহরণ, জটায়ুর বাধা ও পক্ষচ্ছেদ, পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানরের কাছে সীতার বস্ত্রাভরণ নিক্ষেপ ইত্যাদির অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ । রাবণ লংকাতে রাবণকে এনে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করলেন, সীতার দীপ্ত ও কর্কশ উত্তরে ক্রুদ্ধ রাবণ অশোক বনে পরিবেষ্টিত করে সীতাকে রাখলেন । এর আগে আটজন রাক্ষসকে দন্ডকবনে রামলক্ষ্মণের প্রতি নজর রাখতে পাঠিয়েছিলেন রাবণ ।

কৃত্তিবাস একটি নতুন আখ্যান দিয়েছেন । সীতা যদি নিরাহারে প্রাণ দেয় তবে রাবণ বধ হবে না । কাজেই ব্রহ্মা অমৃত পায়স দিয়ে পাঠালেন ইন্দ্রকে । ইন্দ্র বললেন —

ভুঞ্জিয়ো পায়স শোক করা পরিহার ।
শত বরষিতো ক্ষুধা ন লাগিবে আর ।। (৩২১৪)

এ কি রাক্ষসের মায়া ? বললেন - সীতা

তুমি যেবে ইন্দ্র মই জান কেনমত । (৩২১৬)
শুনি ইন্দ্রে ধরিলন্ত আপোন স্বভাব ।
জাজ্বল্য সমান ভূমি - নোচোঁয় পাব ।।
চক্ষুত নিমিষ নাহি দিব্য বস্ত্র গায়ে
হাতে বজ্র ধরি স্থিত অন্তরীক্ষ ভায়ে । (৩২১৭)

তখন সীতা পায়স নিয়ে

রাম লক্ষ্মণক লাগি দুই ভাগ বচাইলা।
এক ভাগ পরমান্ন আপুনিয়ো খাইলা ॥ (৩২১১)

ওদিকে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হল। তখন মারীচের মায়া বুঝেছেন রাম। সীতাকে না দেখে ব্যাকুল হলেন রামচন্দ্র। অরণ্যকাণ্ডের ৫৭ অধ্যায় থেকে ৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত বিরহব্যাকুল রামচন্দ্রের প্রেমোন্মত্ত চরিত্র — গম্ভীর ও করুণ আবেগে অপূর্ব কাব্যরস মণ্ডিত। তার তুলনায় কন্দলীর রামচন্দ্রের বিলাপ একেবারে সাদামাটা। তারপর জটায়ুকে দেখে সীতাহত্যাকারী বলে ক্রোধ পরে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে এই সংবাদ শোনা, জটায়ুর মৃত্যু, অগ্নি সংস্কার ও পিতৃসখার জন্য রামচন্দ্রের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন মূলানুগ।

বাল্মীকি লিখেছেন —

রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশী কৃত্বা মহাযশাঃ।
শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিত শাদ্বলে ॥ (৭৮।৩৩)

কন্দলীর অনুবাদ —

দুই ভাই দিলা পাছে পিণ্ড জলাঞ্জলি।
রোমাছে দিলন্ত চটকর কাকবলি ॥ (৬৩৫৩)

রাম পশ্চিমদিকে চললেন। ক্রৌঞ্চবনে আয়োমুখী রাক্ষসীর কথা বলেছেন বাল্মীকি যে লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে আসে, এবং খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ তার নাসিকাকর্ণ ছেদন করেন। এই কাহিনীটি বাদ দিয়েছেন কন্দলী। তারপর আরও গভীর বনে কবন্ধের সাক্ষাৎ। কবন্ধ আসলে দনু, গন্ধর্ব অভিশপ্ত ছিলেন, রামের হস্তে মৃত্যু বরণ করে শাপমুক্ত দনু দিব্যদেহ পেলেন এবং রামকে পম্পা সরোবরের দিকে যেতে বললেন। সেখানে মতঙ্গ আশ্রমে শবরীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং শবরী দেহত্যাগ করলেন। মূলানুগ কাহিনী। পম্পা, কন্দলীর ভাষায় চম্পা সরোবর হয়েছে। তার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। পম্পা সরোবরের দৃশ্য মনোরম। চম্পা (পম্পা) সরোবরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে কন্দলীতে —

স্থলপদ্ম জলপদ্ম দেখি জাতিস্কার ।
জেয়ালী নেবালী পুষ্প দেখিলা অপার ॥ (৩৩৮২)

তারপর তাঁরা কবন্ধের নির্দেশ মতো ঋষ্যমূক পর্বত দেখতে গেলেন ।

নানা সব মৃগ পক্ষী দেখিলান্ত তথা ।
পাচঃগুটি বানর বসিয়া আছে তথা ॥
এতেকে অরণ্যকান্ড হল সমাপতি ।
মাধবে ভণন্ত মহামানীয়ে শুনন্তি ॥ (৩৩৮৪)

বাল্মীকির অরণ্যকান্ড ৭৫ সর্গে সম্পূর্ণ কন্দলীর শ্লোকসংখ্যা সাকুল্যে ৭৭৩ পদ্য ৬২১, দুলড়ি ৪২, ছবি ১৪, ঝুমুটি - ৪২ ।

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড

কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের প্রথমেই কন্দলী ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব সমাগম বিষয় উল্লেখ করেছেন । বাল্মীকি ধারার সংক্ষেপ অনুসরণ । পর্বতের নিম্নে দুইজন অস্ত্রধারীকে দেখে বালীর চর বলে সন্দেহ হয় সুগ্রীবের । হনুমান ছদ্মবেশে এলেন পরিচয় নিতে ।

বাল্মীকি লিখেছেন – "ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ (৩।২) । কন্দলীর উক্তি –

তেতিক্ষণে হনুমন্তে রাজার আদেশে ॥
রায় লক্ষ্মণত পাচে ব্রাহ্মণর বেশে ॥ (৩৪০০)

লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয়, সীতাহরণের কথা এবং সুগ্রীব রাজার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য কবন্ধের বাক্যে আগমন – এই কথা বললে হনুমান নিজেকে সুগ্রীবের মন্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন এবং কপিরূপ গ্রহণ করে তাঁদেরকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে পরিচয় করালেন । তারপর "অগ্নানিক প্রদক্ষিণ দুয়ো করিনন্ত" (৩৪১৫) । অগ্নি সাক্ষ্য করে মিত্রতা করলেন তাঁরা । সুগ্রীব বললেন –

সত্য করি বুলিনোহো শুনিয়োক মিতা ।
ত্রিভুবন বিচারিয়া আনি দিব সীতা ।। (৩৪১৮)

সীতার পরিত্যক্ত অলংকার দেখালেন সুগ্রীব রামকে । রাম তা হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । তারপর সুগ্রীব নিজের ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধের ইতিহাস শোনালেন । দুন্দুভি বধের পর তার ছেলে মায়াবন্তের (মায়াবীর) সঙ্গে যুদ্ধ । বালী তাকে অনুসরণ করে গুহামধ্যে গেলেন — 'পঞ্চদশ মাস' (বাল্মীকি মতে এক বছর "সংবৎসরো গত:" - ১।১৫) । পরে গুহামুখে রক্ত দেখে এবং বালী প্রত্যাবর্তন না করলে, তাঁকে মৃত বিবেচনা করে গুহামুখে পাথর চাপা দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন সুগ্রীব এবং অমাত্যদের অনুরোধে রাজ্য গ্রহণ করেন । এরপর একদিন বালী ফিরে এসে তাঁর কোন কৈফিয়ৎ না শুনে এক বস্ত্রে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং পত্নীকে-ও হরণ করেছে ।

"তেনাহমপরিত্যক্ত হৃতদারশ্চ রাঘব ।।" (১০।২৭)

আমি স্ত্রীহরণে দু:খিত (ভার্যাহরণ দু:খিত: - ১০।২৮) হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আছি ।

সুগ্রীব-ও যে ভ্রাতৃবধূ তারাকে গ্রহণ করেছিলেন বাল্মীকির সুগ্রীব রামকে প্রথম বিবরণ দেবার সময় এ কথা উল্লেখ করেন নি, তাঁর স্ত্রী রুমাকে বালী হরণ করেছেন, এটাই বলেছেন । রামের স্ত্রী-ও রাবণ কর্তৃক অপহৃতা আর সুগ্রীবের স্ত্রী-ও সবলে বালী কর্তৃক গৃহীতা । এতে স্বভাবতই বালীর প্রতি রামের প্রচন্ড ক্রোধ ও সুগ্রীবের প্রতি সহানুভূতি হবে । মহাকবি বাল্মীকি এইভাবেই মনস্তত্ত্ব সম্মত উপায়ে উপস্থাপিত করেছিলেন । কন্দলী কিন্তু এ তাৎপর্য অনুধাবন করেন নি । তিনি বালীর মুখে অভিযোগ করেছেন —

ভয়ংকর শিলাগোট দুয়ারত দিয়া ।
সুখে রাজ্য করে ভ্রাতৃবধূ সঙ্গরিয়া ।। (৩৪৮৭)

তারপর অবশ্য নিজ ভার্যাহরণের বিবরণ-ও দিয়েছেন —

দেশর ডাকিলে একখানি বস্ত্র দিয়া ।
রাজ্য ভোগ করে মোর ভার্য্যা সম্বরিয়া ।। (৬৪৮৯)

তারপর মতঙ্গের অভিশাপে বালীর ঋষ্যমূক পর্বতে গমনে বাধার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং বালীর বিক্রম জানাবার জন্য দুন্দুভি বধের বিবরণ । রাম কি পারবেন এ হেন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ? রাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুন্দুভির অস্থিসঞ্চরণে আঘাত করলেন "বৃদ্ধ অঙ্গুলিয়ে তাক আচারি পেলাইল" (৩৪৯৬) এবং তা "পরিলেক শত যোজনর গৈয়া পথ" (৩৪৯৭) । দ্বিতীয় পরীক্ষা সপ্ততাল ভেদ । বালী তিনটি ভেদ করত এক শরে — "তিনি গাছ ভেদো দদা এক শর ঘায়ে (৩৪৯৯) । রাম — "এক প্রহারতে ভেদিলেন্ত সাত গাছ ।" (৩৫০৩)

তারপর বালীবধের কাহিনী মোটামুটি মূলানুগত । প্রথমবার সুগ্রীবের শোচনীয় পরাজয়, পরে মাল্য চিহ্নিত সুগ্রীবকে চিনতে পেরে বালীবধ । কয়েকটি জায়গায় ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য আছে । বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্বে উভয়ের দেবপিতৃ যুগলের, ইন্দ্র ও সূর্যের — উত্তেজনার বর্ণনা আছে —

সূর্যের লগত দেব যতক আছয় ।
সুগ্রীব জিনন্ত বুলি করে জয় জয় ।। (৩৫২৮)
বাসবর লগে দেব আছে যত যত ।
বালী জিনন্তোক বুলি বঞ্চয় মনত ।। (৩৫২৯)

দ্বিতীয়বার যখন সুগ্রীব এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন তখন তারা বালীকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেছিল । একটা যুক্তি ছিল সুগ্রীবের পক্ষে রাম আছে । বালী বলেছিলেন - রাম ধর্মজ্ঞ পারিবারিক কলহে কেন পক্ষ নেবেন ? বাল্মীকির তারা কিছু বলেন নি, কিন্তু কন্দলীর তারার জবাব —

তথাপি বালিকে তারা বুঝাই বুলিলন্ত ।
ভকতর পদে রামে অন্যায় করন্ত ।।
ভকত বৎসল গুণ এতেকে রামর ।
সুগ্রীব ভকতি তান্তে করে নিরন্তর ।। (৩৫১৫)

কন্দলীর তারা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, দুর্লক্ষণ দেখেছিলেন –

ডাহিনর চক্ষু মোর সঘনে সঘনে ফুরে
আক হৃদয়েতে ডালে শূনা । (৩৫৮৮)

বাল্মীকির তারা কেবল বিলাপ-ই করেছিলেন বালীর মৃত্যুতে, কিন্তু কন্দলীর তারা বিলাপ ছাড়া-ও রামকে পতিব্রতা শাপে দগ্ধ করেছিলেন –

বাহুর প্রতাপে তুমি সীতাক লভিবা ।
অগণিত পরীক্ষিয়া অযোধ্যাক নিবা । (৩৬৬৬)

*** *** ***

মই যেন মরোঁ হেরা স্বামীর বিয়োগে ।
তোমাক বঞ্চিব সীতা দেবীর সম্ভোগে ॥
বিছোহ লগাইয়া হৃদয়ত দিয়া শাল ।
করিবা কাতর তভো যাইবন্ত পাতাল ॥ (৩৬৬৭)

– একেবারে অমোঘ ভবিষ্যতের ঘোষণা ।

বাল্মীকির অনুপম নিসর্গ কাব্য – প্রস্রবন গিরি, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা – কন্দলীর রচনায় অনুপস্থিত ।

তারপর সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ভর্ৎসনা ও সুগ্রীবের সীতা সন্ধানের তৎপরতা মোটামুটি এক প্রকার । সুগ্রীব যে কোটি কোটি নানা জাতীয় বানর ও ভল্লুক সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, সংখ্যার দিক দিয়ে একটু ইতর-বিশেষ থাকলেও যূথপতির নামের তালিকা – শতবলী, সুষেণ, তার অঙ্গদ, পদ্ম, শঙ্খ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরী, তার, হনুমন্ত, জাম্ববন্ত, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, দধিমুখ আদি বাল্মীকি ও কন্দলীতে এক । তারপর পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চারদিকে সীতা অন্বেষণের জন্য চার দল বানর পাঠিয়ে দিলেন সুগ্রীব । পূর্বের দিকে নেতা বিনোদক (বিনত), পশ্চিমে সুষেণ, উত্তরে সাতবলী আর দক্ষিণে অঙ্গদ তার সঙ্গে হনুমান প্রমুখ ৭।৮ জন । কিছু অমিল থাকলেও মোটামুটি মিল আছে । রামের হাতের

অঙ্গুরী-নিদর্শন হনুমানকে দিলেন রাম । প্রতি দিকের পথের বিস্তৃত পরিচয় ও ভৌগোলিক সংস্থান বিবৃত । অঙ্গদ এক অসুর বিনাশ স্বয়ং প্রভাব গুহার কাহিনী, সম্পতির সাক্ষাৎ । পরে সুপার্শ্বের নিকট রাবণের কথা শ্রবণ । সমুদ্রতীরে সাগর লংঘনের পরামর্শ ।

বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড ৬৭ সর্গে বর্ণিত । এবং কন্দলী বর্ণনা করেছেন ৫০৮ পদ, ৪২ দুলড়ি, ৩৮টি ছবি, ১৫ ঝুমুরী সাকুল্যে ৬০৩টি শ্লোকে ।

সুন্দরা কান্ড

কে সমুদ্র লংঘন করে লংকায় যেতে সক্ষম তার পরামর্শ হল । সকলের সামর্থ্য বর্ণনা ও বিচার । শেষে জাম্বুমান হনুমানের নাম বল্লেন এই প্রসঙ্গে । তার জন্ম ও বাল্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন । কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে পবন দেবতার তেজে হনুমানের জন্ম/লাভ করেই রাঙা প্রভাত সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার জন্য লম্ফ দিয়ে সূর্যের প্রচন্ড তাপে পর্বত শিখরে পড়ে গেল শিশু হনুমান –

শিখরে পরিয়া ভাগি গৈল হনুবায় ।
সিকারণে ভৈল হনুমন্ত হেন নাম ।। (৪৩২৭)

এই কাহিনীটি বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের ৬৬ সর্গে । সেখানে আছে সূর্যতেজেও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল শিশু বানরটি, বাম হনু ভেঙে গিয়েছিল । পুত্রের এই অবস্থা দেখে বায়ু ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা বর দিলেন যে হনুমান অস্ত্রদ্বারা অবধ্য হবে, আর ইন্দ্র বর দিলেন – হনুমানের হবে ইচ্ছা মৃত্যু । এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কন্দলী উল্লেখ করেন নি । পক্ষান্তরে হনুমানের মুখে তাঁর পিতা কেশরীর বীরত্বের নতুন কাহিনী দিয়েছেন । কীভাবে তার পিতা কেশরী প্রভাসতীর্থে শঙ্খ ধবল নামে দিগ্‌গজকে বধ করে ভরদ্বাজাদি ঋষির স্নানকার্য অবাধ করেছিলেন, ফলে বর লাভ করেছিল যে তার পুত্র হবে গরুড়ের মত শক্তিশালী ও বায়ুর মত বেগবান ।

সবে ঋষি মিলিয়া বাপক দিলা বর ।
পুত্রেক হৈবেক গরুড়র সমসর ।।
বীরগণিতাত গণিবেক সাতো আগে ।
গরুড়র বায়ুর সদৃশ হৈব বেগে ।। (৪০৩৫-৩৬)

অত:পর মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় উঠে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে রামলক্ষ্মণ সুগ্রীবকে স্মরণ করে — বিরাট শরীর প্রকাশ করে লাফ দিল হনুমান । হনুমানের শক্তি-বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য "নাগর মাতা" সুরসাকে নির্দেশ দিলেন দেবগণ । সুরসা ক্রমে হনুমানের দেহবৃদ্ধির অনুপাতে শতযোজন পর্যন্ত মুখব্যাদন করল এবং হনুমন্ত মুহূর্ত কালের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেহ ধারণ করে মুখের মধ্যে ঢুকেই বাহির হয়ে গেলেন । সুরসা খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন —

অব্যাহত হয়ে সীতার বার্তাক
রামত আসি জনায়ো ।। (৪০৫৮)

তারপর সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে মৈনাক পর্বত-ও নিজের শৃঙ্গে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে যেতে অনুরোধ করল । মিত্রতা হল দুজনের । কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায় ? বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ মাত্র করে ছুটলেন হনুমান ।

হনুমন্তে পরশিল বৃদ্ধ যে অঙ্গুষ্ঠে ।।
হনুমন্তে রাম কার্যে আকুলিত হুয়া ।
ছুটিল নরাচ যেন নিকলিল গৈয়া ।। (৪০৬১)

বাল্মীকি কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ নয় হস্তদ্বারা স্পর্শের কথা বলেছিলেন (ইত্যুক্তা পাণিনা শৈল-মালভ্য হরি পুঙ্গব — ১।১২৭) কন্দলীর মন মূলত: ভক্তি-রসাপ্লুত — তাই হস্তের স্থলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হয়েছে । বর্ণনায় ক্রম বিপর্যয় আছে । বাল্মীকি আগে মৈনাক পরে সুরসা বর্ণনা করেছেন । তারপর সিংহিকার কথা । কন্দলী নামোল্লেখ করেন নি — 'ছায়াগ্রাহী নিশাচরী' বলেছেন । বর্ণনা মূলানুসারী । হনুমান —

গর্ভত পশিয়া বারে করি মহা কোপ ।
নাড়ীচন ছিরিয়া গলত দিলা সোপ ।। (৪০৭৬)

লংকা দর্শন করলেন হনুমান বহু প্রাসাদ পুকুর পাদবাদি শোভিত । বাল্মীকি "সরলায় কর্ণিকারংশ্চ" (২।১) ইত্যাদি এবং 'উদ্যানানি চ রম্যানি দদর্শ কপিকুঞ্জর:" (২।১৩) পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে লংকার শোভা বর্ণনা করেছেন । কর্ণিকার খর্জুর, প্রিয়াল, জম্বীর কুটক, কেতক, প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তপর্ণ, আসন, কোবিদার, করবীর — এই নামগুলি দিয়েছেন বাল্মীকি । কৃত্তিবাসের বর্ণনা —

সরল পিয়াল খর নিখর খর্জুর ।
শাল, তাল, তমাল গয়ারি বীজপুর ॥
অশ্বত্থ কপিত্থ, বট, নারঙ্গ, বদর ।
তেঁতুলি কণ্টাদি আম জাম নাগেশ্বর ॥
খাজুরি হারিদ্রা আম লম্বি ডহা ফল ।
চতিয়াল গুয়া নারিকেল যে শ্রীফল ॥
সলঙ্কা মহরি আর কমলা টেঙ্গয়া ।
করঁদে পিচুমর্দক যে মোলঙ্কা অঙ্কুরা ॥
কদম্ব গুলাল পারিজাতক অবশেষ
সেবতী মালতী পুটিমালী যে বিশেষ ॥ (৪০৮৭-৮৯)

লংকা প্রবেশের মুখে বাল্মীকির বর্ণনায় লংকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে হনুমানের মোকাবিলা হয়েছিল কিন্তু কৃত্তিবাস এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন । বাল্মীকি লংকা নগরী রাবণাদির বাসগৃহ উপবন, সৈন্য, নাগরিক, নগরী, শয্যাগার, পুষ্পক বিমানাদি — সবকিছুর বিস্ময়কর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন ষষ্ঠ থেকে একাদশ সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে । রাবণের ঐশ্বর্য, শক্তি প্রভাব, রুচিবোধ সম্বন্ধে কাব্যপূর্ণ বর্ণনা । কৃত্তিবাস ৩৪টি পদ, ১৩টি ছবি, মোট ৪৭টি শ্লোকে লংকার সৌন্দর্য সাধারণভাবে বলেছেন । রাবণের প্রভাব কত — তা দেখাতে তিনি বলেছেন —

একেখানে আছে সাপে নেউলে ছাগে বাঘে ।
মূষকে চাচরি করে বিড়ালের আগে ॥
ঘোটকে মহিষে সিংহে গজে এক ঠায়ে ।
কাকো কেহ না মানয় রাবণ প্রভাবে ॥ (৪১২০)

সত্ত্বগুণাশ্রিত তপোবনের প্রভাব গুণটি যে বেমানান রজস্তমগুণের আধার রাবণের লংকায় – এই দিকটি খেয়াল করেন নি । রাবণের শয্যায় মন্দোদরীকে দেখে সীতা মনে করে বিস্মিত হয়েছিলেন পরে বুঝেছিলেন –

ঘামবর বল্লভা জান-ত ধর্মাধর্ম ।
প্রাণ যাইতেও ন করিআছেন কর্ম ॥
শুনিয়াছো রাজার প্রিয়া পটেশ্বরী ।
ময়দানবর জীউ এহি মন্দোদরী ॥ (১৪৫০-৫১)

তারপর অশোকবনে সীতার দর্শন পেলেন হনুমান । প্রভাতে রাবণের সঙ্গে সীতার সংলাপ, রাবণের প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন এবং সীতার তিরস্কার ও তেজের বর্ণনা মূলানুগ । দুই মাসের সময় দিলেন রাবণ সীতাকে – "দ্বৌমাসৌ রক্ষিতব্যৌ" (২২।৮) "মাসা দুইক লাগি দিলো মই দিনঅবধি" (৪২১৬) । চেরীদের অত্যাচার ত্রিজটার স্বপ্ন, হনুমান সীতা সংবাদ, রামের অঙ্গুরী ইত্যাদি কাহিনীর ধারা প্রায় একই রকম । বাল্মীকি বলেছেন রাবণের সঙ্গে যে সব রাণীরা এসেছিলেন ধান্যমালিনী রাবণকে ফিরিয়ে নেন । কন্দলী মন্দোদরীর কথা ও নলকুবেরের অভিশাপের কথা বলেছেন । ত্রিজটার স্বপ্ন ।

সীতা-হনুমান সংবাদ মূলানুগ বর্ণনা । হনুমান সীতাকে অশোকবন থেকে নিয়ে চলে যেতে চাইলে সীতা অস্বীকার করে বলেছিলেন –

ইঠায়র পরা কি কার্যক নিবে মোকে ।
রাঘবর বল বীর্য হাসিবেক লোকে ॥
সর্বজনে বুলিবে বাসবে মুজ হারি ।
জিনি নিবে নোয়ারিল আপোনার নারী ॥ (৪৩২৪)

সীতার মণি প্রদান ইত্যাদি ।

অশোক বণভঙ্গ, সেনাপতি সহ জম্বুমালী, অক্ষকুমার বধ ইত্যাদি ঘটনার পর ইন্দ্রজিত কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে হনুমানের বন্ধন । ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন সম্বন্ধে কন্দলী নতুন কথা বলেছেন । ইন্দ্রজিত নাগপাশে দিয়ে হনুমানকে বন্দী করতে না পারায় অভিমানে চলে যান ব্রহ্মার

কাছে । ব্রহ্মা বলেন যে গুরু স্মরণ না করে বানমোচন ব্যর্থ হয় ।

গুরু সে পরম বন্ধু গুরু আদি দেব ।
গুরু বিনে ত্রিজগতে আন নাহি কেব ॥
গুরুক স্মরি যেবে করন সন্ধান ।
হানিবয় তেবেসে ব্রহ্মার নাগবাণ ॥ (৪৪৫২-৫৩)

বন্দী হনুমানকে দেখে বিস্মিত রাবণ তার পরিচয় জানতে চাইলেন - হনুমান নিজের নাম ও সত্য পরিচয় দিয়ে রাবণকে পরামর্শ দিলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিতে –

অবধ্য দুর্জেয় বীর রাম হেন জানি ।
মাথে তুনি সীতাদেবী সমর্পিয়ো আনি ॥
আমার বচনে শীঘ্র করিও প্রবন্ধ ।
তেবেসে জানিবা নিশ্চে রক্ষা পরে কন্ধ । (৪৪৮০)

ক্রুদ্ধ রাবণ প্রাণদন্ডের আদেশ দিলেন । কিন্তু বিভীষণ বললেন দূত অবধ্য । কাজেই লেজে কাপড় জড়িয়ে আগুন দেওয়া হোক হুকুম হল । লেজে কাপড় জড়ানো নিয়ে কন্দলী মৌলিকতা দেখিয়েছেন । রাক্ষসরা যত কাপড় জড়ায় - তত বড় হয় হনুমানের লেজ । ভান্ডারী রাবণকে বলল – আর বস্ত্র নেই । তখন —

রাজা বোলে ভন্ডারী বানর বলীয়ায় ।
বস্ত্র কাটি আন গৈয়া জানকী সীতার ॥ (৪৫০৫)

এই কথা শুনে হনুমান লেজ সংকোচন করলো । তারপর আগুন লাগানো হল । চেরীরা গিয়ে এ খবর দিল সীতাকে । সীতা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানালেন – হে অগ্নিদেব আমি যদি পতিব্রতা হই তবে তোমার তাপ যেন হনুমানের অঙ্গে শীতল হয় । কন্দলী লিখেছেন, সীতা সরযার মুখে এই খবর শুনে সীতা প্রার্থনা জানালেন –

প্রণামো অগনিদেব বায়ু তুম্ম সখা ।
হনুমন্ত পুত্র মোর পুত্রবতে রাখা ॥
যেবে সই লঙ্কানোহো শ্রীরামত পরে ।
শীতল হুয়োক হনুমন্তর শরীরে ॥ (৪৫১৪)

মনের আনন্দে লংকা দগ্ধ করলেন হনুমান । তারপর সমুদ্রের জলে অগ্নি নির্বাপণ করলেন । কিন্তু কন্দলী বলেছেন অন্য কথা –

আকাশের বাণী বীরে শুনিলা তহিত ।
মুখে চুম্বি অগণিক পেলায়ো ত্বরিত ।। (৪৫৩৪)

লংকাদহনে আনন্দিত মারুতি হঠাৎ উদ্বিগ্ন হলেন সীতামাতা-ও ভস্মীভূত হন নি তো ? অশোকবনে ছুটে গেলেন হনুমান । সীতা তাকে একরাত্র বিশ্রাম করে যেতে বললেন । হনুমান রাজী হলেন না । তখন –

সীতাদেবী যাত্রা দিল সর্ব সু কুশল ।
রক্ষা বান্ধি বুলি লন্ত অব্যাহত চল ।।
দেবীর নয়নে জল পরিবার দেখি ।
মারুতির ক্রন্দন লরিল হকহাকি ।। (৪৫৪৬)

তারপর হনুমানের প্রত্যাবর্তন । সংবাদ শুনে আনন্দিত বানরবাহিনী কিষ্কিন্ধ্যা গিয়ে দধিমুখ সুরক্ষিত মধুবন লন্ডভন্ড করল । নালিশ জানাতে গেল দধিমুখ । হনুমান সব বৃত্তান্ত দিলেন । সীতার মণি অভিজ্ঞান পেয়ে আনন্দে অস্থির হলেন রাম । বার বার সীতার কথা জানতে চাইলেন । হনুমান সীতার বাক্য জানালেন –

প্রভুর আগত কহিবি সকলে ।
যেন দুখ আছো বৃক্ষ শিংশপা তলে ।
রাক্ষসিনী লোকে মোক পরাভব করে ।
আমাক দন্তিবে এহি মাসেক অন্তরে ।। (৪৬৬৮)

*** *** ***

নাসন্তে যে যেন্তে তথাপি তো নিজ স্বামী ।
আত্মঘাত করিতেবে মরিবাহো আমি ।। (৪৬৬৯)

বাল্মীকি এইখানে সুন্দরা কাণ্ড শেষ করেছেন কিন্তু কন্দলী আরো খানিকটা – রামচন্দ্রের সমুদ্রতীরে গমন বিভীষণের আগমন পর্যন্ত – অর্থাৎ যুদ্ধকাণ্ডে উনিশ সর্গের ঘটনাবলী সুন্দরকাণ্ডে বিবৃত করেছেন ।

রাম সসৈন্যে যাত্রা করলেন । রাম বললেন – আজ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র কাল হস্তা নক্ষত্রে চন্দ্রের যোগ হবে – এটি শুভ মুহূর্ত, কন্দলীর অনুবাদ এই প্রকার –

কালি যে উত্তর   ফালগুনী নক্ষত্রে
আজি হুয়া আছে হস্তা ।
দুয়ো যে নক্ষত্রে   সুমঙ্গল কহে
তারা দুই সুপ্রহস্তা ।।   (৪৬৮৬)

সমুদ্রের তীরে গেলেন তাঁরা ।

লংকায়-ও রাবণের মন্ত্রণা সভা বসেছে, কন্দলীতে অতিরিক্ত আছে রাবণ-জননী নৈকষীর কথা । পুত্র বিভীষণের কাছে দুঃখ করলেন রাবণ সম্বন্ধে নৈকষী –

অধর্মত রাতি ভৈল সিটো দুরাচার ।
পতিব্রতা কন্যা হরিলেক পরদার ।।
ব্রাহ্মণ কুলর বেটা ভৈলে অধোগামী ।
পেটত পরিল দুষ্ট পুরি মারো আমি ।।   (৪৭১০)

***   ***   ***

তুমিসি আছা হা বাপকুল নিস্তারণ
রাবণে রামত যেন পশয় শরণ ।।
সীতা সমর্পিবাক বুলিবা রাজনয় ।
মোর বচনক বেটা কাণে নুশুনয় ।।   (৪৭১৯)

মায়ের কথা শুনে বিভীষণ রাবণকে বলেছিলেন সীতা প্রত্যর্পণ করতে । কন্দলীর রাবণের উক্তি প্রচ্ছন্ন বৈরী ভক্তের মতো –

জানো মই সীতা লক্ষ্মী জনক কুমারী ।
আর জানো রাম মধুসূদন মুরারি ॥
রামর হাতত জানো মোর যাইব জীব ।
তথাপি নি দিবো সীতা জনকর জীব ॥ (৪৭২৪)

মূল রামায়ণে রাবণের পরামর্শ সভায় প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র, মহাপার্শ্ব প্রমুখ সেনাপতিরা রাবণের সীতাহরণ ও সমর্থন করে যুদ্ধের উৎসাহ দিয়েছিল । কুম্ভকর্ণ রাবণকে নিন্দা করেছিলেন । কিন্তু পক্ষে যুদ্ধ করবার কথা-ও দিয়েছিলেন । সভা হয়েছিল দুদিন । প্রথম দিনে বিভীষণ যুক্তিসহ সাম্যনীতি অর্থাৎ সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধির কথা বলে উপহাসিত হয়েছিলেন । দ্বিতীয় দিনে আবার সীতা প্রত্যর্পণের কথা বলায় রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে বিতাড়িত করেন ।

কিন্তু কন্দলী পদাঘাতের কথা বলেছেন —

রাবণ রাজারে পাচে লবর দিলেক ডিরি
যেন ক্রোধে ময়মত্ত হাতী ।
বিভীষণ বীরর যে হৃদয় সাজত গৈয়া
ক্রোধে মারিলেক এক লাথি ॥ (৪৭৬৭)

বিভীষণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । পরে গেলেন মা নৈকষীর কাছে এবং তাঁর পরামর্শে কুবের দাদার কাছে গেলেন । একটু নতুন কাহিনী । বিভীষণ গেলেন কৈলাসে । শিব আর কুবের পাশা খেলছিলেন । দুজনকে প্রণাম করে সব কথা জানালেন বিভীষণ । শিব বললেন — 'লংকাপুরি আইলা রাঘব শ্রীহরি'। (৪৭৮৫) কাজেই চারজন অসুরকে নিয়ে বিভীষণ রামের কাছে গেলেন, ভগবানের শরণ নিলেন ।

বাল্মীকির ধারায়-ই পরবর্তী ঘটনাসমূহ বলেছেন কন্দলী । বিভীষণকে আশ্রয় ও বিশ্বাস করা নিয়ে রাম শিবিরে মতানৈক্য । শেষে হনুমানের পরামর্শে রাম বিভীষণকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন — এবং লংকার সিংহাসনে তখনই — 'করো বিভীষণক লংকাত অভিষেক ।' (৪৮০৮)

তারপর সমুদ্র পার হবার যন্ত্রণা । বিভীষণ সাগরের উপাসনার কথা বললেন এবং সেই মতো রাম কুশাসনে তিনদিন প্রার্থনা করলেন । কাজ হল না । তখন সমুদ্র শাসন করবার জন্য ধনুর্বাণ তুলতেই সমুদ্রদেব নলকে দিয়ে সমুদ্র বন্ধনের পরামর্শ দিলেন । সমুদ্র বন্ধন হল ।

বাল্মীকি এসব কথা যুদ্ধকাণ্ডে ২২তম সর্গে বলেছেন । কন্দলী কিন্তু এ কাহিনী দিয়ে সুন্দরাকাণ্ডে শেষ করেছেন –

মাধব কন্দলি ভণে কৌতুকে সুন্দরাকাণ্ড
সমাপতি ভৈলা এহিখানে ।। (৪৮৪৭)

বাল্মীকি ৬৮টি সর্গে সম্পূর্ণ করেছেন সুন্দরাকাণ্ড আর কন্দলী করেছেন ৮৫৪ শ্লোকে যার মধ্যে দুলড়ি ৬০, ছবি ৩৭, ঝুমরি ৩ এবং পদ ২৫৪ টি ।

লংকাকাণ্ড

সসৈন্যে লংকা অবরোধ করেছেন রামচন্দ্র । শুক সারণকে রাবণ আদেশ দিলেন গোপনে রামের শিবিরে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে । বিভীষণের চোখে রাক্ষসের মায়া ধরা পড়ে গেল । বন্দী শুক সারণকে নিয়ে আসা হল রামের কাছে । তিনি তাঁদের যুক্তি দিয়ে, রাবণকে এই বার্তা দিলেন –

আমার ঘরিণী হরি নিল নিশাচরে ।
দশ শির ছেদিবো দুর্ঘোর দশ শরে ।।' (৪৮৬৬)

রাবণ খবর শুনে পর্বতে চড়ে রামের প্রধান সেনাপতি দেরকে দেখাতে বললেন শুক সারণকে । তার সাহায্যে নীল, অঙ্গদ, কুমুদ, জাম্ববন্ত, সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি ও রাম লক্ষ্মণকে দেখলেন রাবণ । পরে শার্দুল নামক গুপ্তচরকে আবার পাঠালেন রামের শিবিরে । এবার-ও বিভীষণ ধরে ফেললেন শার্দুলকে এবং রামের দয়ায় ফিরে এসে রাবণকে জানালো যে শুক সারণের বিবরণ ঠিক ।

এবার সীতাকে করায়ত্ত করতে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যুৎজিহবকে নির্দেশ দিলেন রাবণ –

মায়া রূপে সৃজিয়ো রামর ধনুঃশর ।।
সীতার পাশেক যাইব দগধ শরীর ।
রেখ রূপে সৃজি আন রাঘবর শির ।। (৪১১৩)

রামের ছিন্ন শির ও ধনুর্বাণ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন সীতা । এমন সময়ে পাত্র এসে খবর দিল সেনাপতি প্রহস্তের জরুরী দরকার । রাবণ চলে গেলেন ।

যেতিক্ষণে রাবণ সিথান ছারি গৈলা ।
তেতিক্ষণে মায়া শির অন্তর্ধান হৈলা ।। (৪১৪৪)

তখন সরমা এসে সীতাকে রাক্ষসের মায়ার কথা বুঝালো এবং সীতাকে সান্ত্বনা দিল ।

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্ ।
সরমাহলাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা ।। (৩৪।১)

কন্দলীর অনুবাদ আক্ষরিক ও সুন্দর –

সরমার বোলে শোক গুচিল সকলে ।
খরলাগা ধান যেন বরিষণ জলে ।। (৪১৫৫)

সরমা সীতাকে বলল যে সে অদৃশ্য ভাবে সবকিছু জানতে পারে । রামের খবর-ও আনতে পারে । সীতা রাবণের খবর জানতে চাইলেন । সরমা চলে গেল । কন্দলী লিখেছেন –

সরমায়ে সীতাক আশ্বাস অতি করি ।
অন্তরীক্ষে চলিলা চিলনী বেশ ধরি ।। (৪১৫৯)

এই চিলনীর কথা বাল্মীকি বলেন নি, কন্দলীর নিজস্ব । সরমা জানাল যে রাবণের মা সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন । মাতামহ মাল্যবন্ত একই উপদেশ দিয়েছেন । মাল্যবন্ত লংকায় নানা দুর্নিমিত্তের, অমঙ্গলের নিদর্শন দেখছেন । বাল্মীকির যুদ্ধকান্ড ৩৫ সর্গের ২৪ থেকে "উৎপাতান বিবিধান্"– ইত্যাদি এবং ৩৪ শ্লোক

এতান্যন্যানি দৃষ্টানি – ইত্যাদি ১১টি শ্লোক বর্ণনা করেছেন । নমুনা –

খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলেষু চ ।।
মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্দ্ধং শূকরা শুনকৈ সহ ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্মানুষৈঃ সহ ।। (৩৫।২১-৩০)

কৃত্তিবাস-ও দুর্লক্ষণের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন –

পথে পথে শৃগালে আরবে করে ঘনে ।।
শূকর কুকুর সব ফুরে পালে পাল ।
রাক্ষস কুলের ভেলা প্রলয়ের কাল ।।
গো সবে প্রসবা গর্দভের ছায় ।
নেউলের গর্ভত ইন্দুরের উদ্ভায় ।
কুকুরে বানর হোবে বিরালত বাঘ ।
হস্তি কত উট হোবে মহিষত ছাগ । (৪১৭৫-৭৬)

ঠিক বাল্মীকি ধারা অনুসরণ করেই রাক্ষসদের সৈন্যসজ্জার কথা লিখেছেন কৃত্তিবাস – পূর্বদ্বারে প্রহস্ত, দক্ষিণে মহোদর-মহাপার্শ্ব, পশ্চিমে ইন্দ্রজিত, ও শুক্যারণ উত্তরে, আর মধ্যে বিরূপাক্ষ । রাবণের সৈন্য সজ্জা জানবার জন্য পক্ষীরূপে বিভীষণের চার সহচর সব দেখে গেল ।

অনল সুনল বীর সম্পাতি প্রঘস ।
পক্ষীরূপ ধরি আইলা চারিয়ো রাক্ষস । (৪১১৩)

বাল্মীকির মতে বিভীষণের অমাত্যদের নাম অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি । শ্রীরাম-ও সৈন্য সংস্থানের নির্দেশ দিলেন – পূর্বদ্বারে নীল, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, হনুমান পশ্চিম দ্বারে, উত্তর দ্বারে রাম নিজে, সুগ্রীবাদি মধ্যস্থানে । মূল ও অনুবাদে এমন বৈষম্য নেই । তবে বাল্মীকির রামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির অনুল্লেখ আছে কৃত্তিবাসের রচনায় ।। রাম বলেছিলেন – বানরগণ - "মনুষ্য রূপ ধারণ করবে না । রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণ ও তাঁর চার অনুচর কেবল মানবরূপে যুদ্ধ করবেন । যুদ্ধ হল ।

বাল্মীকি বলেছেন যে, এরমধ্যে সুগ্রীব রাবণকে পর্যুদস্ত করে তাঁর মুকুট হরণ করলো। রামের নির্দেশে অঙ্গদ লংকায় রাবণের সভায় গিয়ে তাকে অপমান করে ফিরে এল। অঙ্গদ অভিযানটি –

রামক প্রণাম   করিয়া অঙ্গদ
আকাশ বহিয়া যান্ত।
পাত্র সমন্বিতে   ওস্বারি কোলত
রাবণক দেখিলন্ত ॥   (৫১১৭)

ইত্যাদি ১৭টি দুলড়িতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কন্দলী। তারপর ইন্দ্রজিতের নিশাযুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্দী হলেন। রাবণ এই সুযোগে পুষ্পক বিমানে করে সীতাকে দেখালেন দুজনের মৃতাবস্থা। সঙ্গে ছিল ত্রিজটা। সীতা বিলাপ করতে থাকলে ত্রিজটা বুঝালেন যে রাম-লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়েছেন, মরেন নি।

কন্দলীর ত্রিজটা-ও বাল্মীকির ত্রিজটার মতো – তিনটি প্রমাণ দিয়ে সীতাকে আশ্বস্ত করেছিল। এক, রামলক্ষ্মণের দেহের উজ্জ্বলতা, দুই সীতার দেহের অবৈধব্য লক্ষণ, আর তিন - পুষ্পক বিমান বিধবা নারীকে বহন করে না।

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ ॥   (৪৮।২৫)

পুষ্পক বিমানে ইটো কল্যাণক কহে।
বিধবা নারীক ইটো খানিক ন বহে ॥   (৫১৬৫)

তবে দ্বিতীয় প্রমাণ অর্থাৎ সীতার অবিধবা লক্ষণের কথাটা বাল্মীকি বলিয়েছেন সীতার নিজের মুখে আর কন্দলী তার অনুবাদ বসিয়েছেন ত্রিজটার মুখে। গরুড় এসে রামলক্ষ্মণের নাগপাশ মোচন করলেন। কার কাছে শুনে গরুড় এলেন বাল্মীকি বলেন নি, কিন্তু কন্দলী বলেছেন বায়ুদেব এসে রাঘবকে চৈতন্য করিয়ে গরুড়কে স্মরণ করতে বলেছিলেন –

বায়ুর বচনে রামে   চেতন লভিয়া মনে
পক্ষীর রাজাক সুমরিল ॥   (৫২০২)

পরের যুদ্ধবর্ণনায় বাল্মীকির সঙ্গে একটি স্থল ছাড়া কন্দলীর কোন বিশেষ অমিল দেখা যায় না। ধূম্রাক্ষ ও অকম্পন হত হয়েছিল হনুমানের হাতে আর প্রহস্তকে বধ করেছিল নীল। বজ্রদংষ্ট্রা - বাল্মীকির মতে নিহত হয়েছিল অঙ্গদের হস্তে, কন্দলী বলেন সুগ্রীবের আঘাতে। তারপর রাবণ এলেন যুদ্ধে। ঘোরতর যুদ্ধ হল, কিন্তু রামের হাতে পরাজিত হয়ে লংকায় ফিরে গেলেন রাবণ।

তারপর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, সীতাহরণের জন্য রাবণের প্রতি আবার কুম্ভকর্ণের তিরস্কার, যুদ্ধ গমন ও মৃত্যুবরণ — এই বর্ণনার মধ্যে অনুবাদের দ্বারা মূল ভাব ও কথা ক্ষুন্ন হয় নি। সুগ্রীবকে বন্দী করে নিয়ে যাবার চেষ্টা, পরে রামচন্দ্র কর্তৃক কুম্ভকর্ণের প্রথম দু হাত, পরে দুই পা, ছেদন এবং শেষে মুণ্ড-চ্ছেদ যথাযথ বর্ণিত।

নিকৃত্ত বাহুর্বিনিকৃত্ত পাদো বিদার্যবক্ত্রং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্ রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরীক্ষে॥ (৬৭।১৬২)

দুই অর্দ্ধচন্দ্র রামে গুণত চড়াইলা।
দুই সনে পাও তার কাটিয়া পেলাইলা॥
চন্দ্রক গ্রাসিতে যেন রাহু মুখ বায়া।
চৌরাঙ্গি শরীরে রাঘবয় যায় ধায়া। (৫৫৭১-৭২)

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে বিকল হলেন রাবণ। তারপর রাবণকে প্রবোধ দিয়ে যুদ্ধে গেল নরান্তক, দেবান্তক, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায় তারা যথাক্রমে নিহত হন অঙ্গদ, হনুমান, হনুমান, নীল ও লক্ষ্মণের হাতে। লক্ষ্মণকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে অতিকায়কে বধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বায়ুদেবতা। কন্দলীর অনুবাদ যথাযথ।

তারপর দ্বিতীয়বার যুদ্ধে এলেন ইন্দ্রজিত যথাবিধি যজ্ঞ করে।

স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ॥ (৭৩।২১)
রণভূমি মাজে নিয়া অগনি থাপিল।
কাল্মিয়া ছাগল আনি টৈটু ভসাইল॥ (৫১৭৪)

তারপর অগ্নিদেব্যার আশীর্বাদ নিয়ে অন্তরীক্ষ থেকে অস্ত্রাঘাত করে রামলক্ষ্মণ সহ সকল বানরসৈন্যকে আচ্ছন্ন ও অচেতন করে লংকায় চলে গেল মেঘনাদ । তারপর জাম্বুমানের নির্দেশে হনুমান হিমালয় ওষধি পর্বতে গেলেন –

মৃতসঞ্জীবণীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি ।
সুবর্ণ করণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধিম্ ।। (৭৪।৩৩)

চারিয়ো ওষধ জ্বলে দশ দিশে ছানি ।
এক নাম আছে তার মৃত্যুসঞ্জীবনী ।।
বিশল্যকরণী আর সন্ধান যে করি ।
সুরূপ-করণী নামে ওষধ যে চারি ।। (৫৬১৮)

হনুমান গিয়ে ওষুধ না চিনতে পেরে পর্বতখন্ডটি নিয়ে এলেন । ওষুধের গন্ধেই চেতনা লাভ করেন রাম লক্ষ্মণ আর বানরগণ । তারপর –

রামর আদেশ বীরে শিরে তুলি লৈলা ।
পূর্বত স্থানত নিয়া পর্বতক থৈলা ।। (৫৭১৭)

চেতনা লাভ করে বানর সৈন্য লংকা আক্রমণ করল । এবার রাক্ষসদের পক্ষে যুদ্ধে এল কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয় কুম্ভ ও নিকুম্ভ, যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজংঘ, ও খরের পুত্র মকরাক্ষ – তারা সবাই নিহত হল যথাক্রমে সুগ্রীব, হনুমান, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ ও শ্রীরামচন্দ্রের হাতে । মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে । বাল্মীকি বলেছেন কম্পন রাক্ষসকে বধ করেছিল অঙ্গদ, কন্দলী নাম করেন নি বলেছেন বজ্রকণ্ঠ অঙ্গদের হস্তে নিহত হয় ।

অতঃপর তৃতীয়বার যুদ্ধে এলেন ইন্দ্রজিত । প্রথমেই নূতন কৌশল নিলেন । মায়াসীতা বধ করা হল । মায়া সীতাকে ইন্দ্রজিতের রথে দেখে হনুমান বাধা দিতে গেলেন – স্ত্রী হত্যা মহাপাপ বলে সাবধান করলেন ইন্দ্রজিতকে ।

ইন্দ্রজিতে বোলন্ত বানর মহাপাপ ।
এইয় কারণে বহু লোকর সন্তাপ ।।
একজনী মারিলে অনেক লোক জীয়ে ।

হেনর বিনাশে বর ধর্ম কেসে দিয়ে ॥
মিছাতে নিন্দস কপি সময় না জানি ।
হেন বুলি সীতাক কাটিলা খান্ডা হানি ॥
হা রাম লক্ষ্মণ মোহোর প্রাণনাথ ।
হেন বুলি ভূমিতে পরিল মৈয়া মাথ ॥ (৫৮৩১-৩২)

রাম শিবিরে কান্নার রোল উঠল । রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়ে পড়লেন । বানর সৈন্য যুদ্ধ বন্ধ করে দিল । এমন সময় বিভীষণ এসে বললেন যে ইন্দ্রজিত মায়া সীতা বধ করে সকলকে বিভ্রান্ত করছেন । রাবণ কিছুতেই সীতাকে বধ করতে দেবেন না। ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যাতে নির্বিবাদে করতে পারেন, তার জন্য এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি – যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে পারলে মেঘনাদ অজেয় হবেন ।

ব্রহ্মা বরদানে যজ্ঞ করয় নিশ্চয় ।
যজ্ঞ সমাপিলে হইব ত্রৈলোক্য বিজয় ॥
ব্রহ্মা অস্ত্র আপুনি হৈবেক উপস্থিত ।
রথ যান পাইবে তপতে অবিদিত ॥
এইমতে পুণি ইন্দ্রজিত বীরবরে ।
মায়া সীতা মাজি সিটো আনিলা সত্বরে ॥ (৫৮৫৬-৫৭)

লক্ষ্মণকে বললেন বিভীষণ –

যজ্ঞ সমাপতি করিবাক না পারোক ।
শীঘ্রে নিকুম্ভিলা বটমূলক যায়োক ॥ (৫৮৭১)

তারপর বানরসৈন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বাধা দিতে ছুটে গেল – বিভীষণ লক্ষ্মণ ও হনুমানের নেতৃত্বে । বাল্মীকি ৮৫ থেকে ৯০ ছয়টি সর্গে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কন্দলীর বিবরণ, বিশেষত: বিভীষণ-মেঘনাদ সলাপ এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ভাবের দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সার্থক হলেও মূলের তুলনায় বিশেষত বিভীষণের উক্তি নিষ্প্রভ । যেমন ইন্দ্রজিত উক্তি –

গুণবান বা পরজন: সুজননির্গুণোঽপি বা ।
নির্গুণ: স্বজন: শ্রেয়ান্ য: পর: পর এব স ॥ (৮৮।১৫)

যদি মোর পিতৃ তোর নোহে গুণবন্ত ।
অপর যতেক জনে গুণ-বখানন্ত ॥
তথাপি তোমাক হিত বোলো খুরা শুন ।
যিটো পর পর সিটো নো হয় আপুন ॥ (৫৮৯৬-৯৭)

বাল্মীকির বিভীষণ বারটি শ্লোকে (৮৮।১১-৩০) যে গম্ভীর যুক্তিপূর্ণ জোরালো উত্তর দিয়েছিলেন ইন্দ্রজিতকে কন্দলীতে তা দেখা যায় না । আভাস মাত্র আছে —

রাক্ষস কুলত আম্মি   উতপতি লভিলোহো
ধর্ম ছারি ভজিলো আন ।
আপোনার কথা নিয়া   আনত লগায় আনি
বোলা মোক পাপেসে প্রধান । (৫৯০৬)

কিন্তু যুদ্ধ বর্ণনায় কন্দলী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন নতুন কথা --

পাঞ্চদিন পাঞ্চরাতি ভৈলা ঘোর রণ ।
আকাশত হরিষে নাচন্ত দেবগণ ॥ (৫৯৮০)

লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে মেঘনাদকে বধ করেন । এবং অস্ত্র প্রয়োগের সময় একটি সত্য-শপথ মন্ত্রও উচ্চারণ করেছিলেন তিনি —

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥ (৯০।৬৯)

কন্দলীর অনুবাদ —

রামদেব হন্ত যেবে ধর্মত প্রধান ।
দেব দ্বিজ গুরু ছারি ন জানন্ত আন ॥
ভকত বৎসল সদকর্মে সদা রত ।
ভকতি করন্ত সদা হরিশংকরত ॥
তাহাক কিঙ্কর মই রাখে মোর নাম ।
এহি শরে রাবণির সংহারোক যাম ॥ (৫৯৮৭-৮৮)

ইন্দ্রজিত বধ হল। রাম শিবিরে উল্লাস। রামচন্দ্র –

লক্ষ্মণক কোলে ধরি মাথাত চুম্বন করি
নানাবিধ উৎসবক পাইল ॥ (৬০০১)

রাবণ শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে বধ করবার জন্য ছুটলেন অশোক কাননের দিকে –

মায়া সীতা কাটিলেক পুত্র বীরবরে।
স্বরূপ সীতাক কাটি পেলোঁ যমঘরে ॥ (৬০২২)

স্ত্রীবধে বাধা দিল অরবিন্দ নামে অমাত্য। বাল্মীকি এই অমাত্যের নাম বলেন – সুপার্শ্ব। রাবণ নিবৃত্ত হয়ে যুদ্ধে গেলেন। ঘোরতর যুদ্ধে লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করলেন। তখন রাম এগিয়ে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন রাবণ। শোকে আকুল শ্রীরামকে সান্ত্বনা দিলেন বৈদ্য সুষেণ। হনুমান গিয়ে বিশল্যকরণাদি ওষুধ পর্বত সহ নিয়ে এলেন এবং লক্ষ্মণ সুষেণের চিকিৎসাতে ভাল হয়ে গেলেন। বাল্মীকি বলেন নি, কিন্তু কন্দলী হনুমানের ওষুধ আনার পথে কালনেমি ও গন্ধকালী রূপ কুম্ভীরের কাহিনী যোজনা করেছেন। শাপমুক্ত অপ্সরী গন্ধকালী তপস্বীবেশী কালনেমিকে চিনিয়ে দিল এবং কালনেমি বধ হল হনুমানের হাতে। পর্বতটি তুলে এনেছিলেন হনুমান। পরে আবার যথাস্থানে রেখে এসেছিলেন।

তারপর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল রামচন্দ্রের। মাতলি ইন্দ্রের রথ আনলেন রামের জন্য। বাল্মীকির মতন্ই কন্দলী বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন। মাতলির পরামর্শে ব্রহ্মাস্ত্র – কন্দলীর ভাষায় ব্রহ্মদত্ত শর – নিক্ষেপ করে রাবণ বধ করলেন রাম। ব্রহ্মাস্ত্র সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।

রাবণ বধের পর বিভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মন্দোদরী ও অন্যান্য রাবণ পত্নীদের সুদীর্ঘ বিলাপ – দুই কবিন্ই দিয়েছেন। অধার্মিক রাবণের অন্ত্যেষ্টির ঔচিত্য সম্বন্ধে উভয় কবির বিভীষণন্ই প্রশ্ন তুলেছিলেন –

রামে বিভীষণক দিলন্ত সম্বিধান।
মৃতক অনক ন করিবা হেন জ্ঞান।

সংস্কার করিবা মিত্র তার কার্য সাধ ।
প্রাণান্তিক ভৈলে আর কিবা অপরাধ ॥ (৬৪১৮)

বিভীষণের অভিষেক হল । হনুমান গেলেন সীতার কাছে । যে রাক্ষসীরা সীতাকে যন্ত্রণা দিত, হনুমান তাদের শাস্তি দিতে চাইলে সীতা নিষেধ করলেন ।

ন পর: পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম ।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্র ভূষণা ॥ (১১৩।৪২)

গোসানী বোলন্ত বাপু হনুমন্ত
ইহাক দিক টঙ্কোমি ।
রাক্ষসিনী লোক স্বতন্ত্রী নোহে
সবে রাবণর দাসী ।
তাহার বচন হেলা করে যদি
ন তু চক্ষুয়ায় মোক ।
তেতিক্ষণে মোক কাটিতে পারয়
ত্রৈলোক্যে নাহিকে রাম ॥ (৬৪৬৪)

তার সীতাকে আনা হল রামের কাছে । রাম কঠোর বাক্যবাণে সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন ।

বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে সোঽয়ং রণ পরিশ্রম: ।
সুতীর্ণং সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃত: (১১৫।১৫)

ইত্যাদি রামের সুদীর্ঘ ও কর্কশ কথাগুলির যথাযথ অনুবাদ করেছেন কন্দলী –

রাবণক মারিয়া এরাইলো লোকবাদ ।
তোমাক আনিলো রাখি বংশর মর্যাদ ॥ (৬৪৯৮)

ইত্যাদি শ্লোকে । তারপর অগ্নি পরীক্ষা, সীতাসহ অগ্নির আবির্ভাব ও প্রত্যর্পণ । দশরথের আবির্ভাব, ইন্দ্রের অমৃত সিঞ্চনে মৃত বানর ভল্লুকের জীবন লাভ ।

অমৃতর বৃষ্টি করিলেক দেবরাজ ।
শ্রীরামর হিত চিন্তি সংগ্রামর মাজ ॥

দারুণ সমর মাজে যতেক মরিল ।
নিদ্রায় জাগিয়া যেন উঠিয়া বসিল ॥ (৬৫৪৬)

তারপর পুষ্পকে আকাশ মার্গে প্রত্যাবর্তনের পথে রামচন্দ্র সীতাকে বিভিন্ন স্থান ও ঘটনার কথা বললেন এক এক করে। বাল্মীকি বলেছেন যে কিষ্কিন্ধ্যাতে সীতা অবতরণ করে বানর বধূদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। কন্দলী তার উল্লেখ করেন নি। তবে ভরদ্বাজ আশ্রমের কথা আছে। অতঃপর ভরতমিলন, রামের রাজ্যাভিষেক, বানর রাক্ষসদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ কন্দলীতে সংক্ষিপ্ত হলেও মূলানুগত। বাল্মীকি লংকাকাণ্ডের শেষ শ্লোকে বলেছেন –

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি
রাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈঃ ॥ (১১৩।১২২)

কন্দলীর অন্ত্য উক্তি –

এতেক জানিয়া রামত ভজিয়ো
তেজিয়া সমস্ত কাম।
সংসার সাগর সুখে হোৱা পার
ডাকি বোলা রাম রাম। (৬৭১৮)

কন্দলীর লংকাকাণ্ডে দুলাড়ী ২৭৬টি, ছবি ১০৫টি, এবং পদ ১৪৮৯। সাকুল্যে ১৮৭০ শ্লোক আছে।

মাধব কন্দলীর চরিত্র চিত্রণ –

কন্দলী রামায়ণ অনুবাদ করার সময় প্রধানতঃ বাল্মীকির রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাতে বাল্মীকির অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় কল্পনাকেও আশ্রয় করেছেন। চরিত্রগুলি নিজের কল্পনা অনুযায়ী খানিকটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছেন। এখানে সেই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নিয়েই

আলোচনা - মূল রামায়ণে ধৃত পরিচিত চরিত্রসমূহকে মুখ্য করে নয়।

বাল্মীকির রাম রসশাস্ত্রের ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়ক। কিন্তু কন্দলীর রাম বিষ্ণুর অবতার হলেও মাঝে মাঝেই সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেছেন। স্মরণীয় যে আদি কবি সীতার বিরহে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকে মানুষের মতো ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কন্দলীর ক্ষেত্রে স্বাদ আলাদা। এইসব ক্ষেত্রে কোনো কোনো অংশে চরিত্রের দৈবী মহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও পাঠক সমাজকে পর্যাপ্ত তৃপ্তি দান করেছে। কন্দলী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় গুণ পাঠকচিত্তের আকর্ষণকে কোনভাবেই ব্যাহত না হতে দেওয়া। সমালোচকের মতে তাঁর কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ কোন কোন স্থানে প্রত্যক্ষ হলেও তা তার কাব্যপ্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করেনি - বরঞ্চ সরস ও সবল করেছে।

রামের জীবনের সবচাইতে কঠিনতম সময় বনবাসের পূর্বে পিতার হতাশার কারণ জানতে চাওয়ার সময় বাল্মীকির রাম মূলতঃ নম্র, শান্ত ও ভক্তি ব্যাকুল। কিন্তু কন্দলীর রামের আত্মশ্লাঘামূলক আস্ফালনের মাত্রাধিক্য রামের বীরত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু তৎকালীন সমাজের এই বয়স্ক একটি তরুণের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই উক্তিতে পিতার প্রতি ভক্তি হ্রাস না হলেও নিজের বীরত্ব উচ্চারিত হয়েছে। যেমন –

'ক্ষত্র বীর যতেক আছয় রবিতলে।
কেহো নোহে শকত মোহোক বাহুবলে॥ (১৬৭৫ অ-কা-)

মোহোর আগত কিছু নোহে দেবাসুর।
মুঠির প্রহারে পর্ব্বতক করো চুর॥ (১৬৮২ অ-কা-)

তিনিয়ো ভুবনে মোক নাহি সমসর।
বাপক করিবো তিনি ভুবন ঈশ্বর॥ (১৬৮৬ অ-কা-)

এইভাবে রামের আত্মশ্লাঘা পূর্ণ উক্তিসমূহে কন্দলীর নিজস্ব মাত্রা দিয়ে সরস করেছেন। বনবাসের সংবাদে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে শান্ত করার সময় কৈকেয়ীর

গুণ ব্যাখ্যা করে তাঁর এই ব্যবহারে –

দৈবে সমে যুজে কোনে কহত কাহিনী।
কৈকেয়ীক দোষ কেন দিয়স ন জানি ॥   (১৭৫২)

ইত্যাদি বললেও সীতার কাছে বনবাসের কথা বলার সময় শেষ পর্যন্ত রামের ক্ষোভ লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। যেমন –

পাপক সঙ্কিংলে   শরীর দুঃখিলে,
কৈকেয়ীয়ে কাল সর্প।
মিলিল বিঘাত,   বাক্য বিষে ছলি
হরি লৈল বলদর্প ॥   (১৮২১ অ.কা.)

বনবাসের প্রথম রাত্রিতে বাল্মীকির রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকায় তাঁর ভালই হয়েছে নয়তো বৈদেহীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁকে অন্য কারো সাহায্য নিতে হ'ত। প্রশান্ত ধীর রামচন্দ্র। কিন্তু এই ধৈর্য বিচলিত হয়েছিল – ভরদ্বাজাশ্রমের কাছে, জনপদের বাহিরে প্রথম রাত্রি বাসের কালে। ব্যসনের ফল, কাম ও অর্থের প্রভাব, পিতার অবিচার, কৌশল্যার জন্য উদ্বেগ, ভরতের সমৃদ্ধি ও ভাগ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা খেদ ও আক্ষেপ করেছিলেন বাল্মীকির রাম। কন্দলীর রামের আবেগ তীব্রতর। অভিমানের সুর স্পষ্টতর হয়েছে –

'ভরত নৃপতি ভৈলে লখাই বুজিউলি।
মারিবে কৈকেয়া মোর মাও বাপ পুলি ॥
এভো তই লখাই দেশক চলি যাহা।
অনাথিতি মাওক বাপক ভালে চাহা ॥   (২০৫৪ অ.কা.)

ভরতের সৌভাগ্য সম্বন্ধে এই ঈর্ষার আভাস রামচরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রের কাছাকাছি এনেছে – এবং বাবা-মা'র নিরাপত্তার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাবার প্রস্তাব আশংকাতুর হৃদয়ের প্রতিফলন। সন্দেহ কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের প্রতি নয়।

রামায়ণে কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্র। তাঁকে ঘিরেই কাহিনী ও অন্যান্য চরিত্রের বিকাশ। ঈশ্বর অবতার রূপে গৃহীত হলেও মানুষের জীবনধারা — শোক-দুঃখ, বেদনা-আনন্দ, যাবতীয় দোষ গুণ - তাঁর চরিত্রে আভাসিত ও সমন্বিত। কৈকেয়ীর লোভ ও নিষ্ঠুরতার জন্যই তিনি রাজ্যচ্যুত, পিতার মৃত্যু ও অযোধ্যার রাজপরিবারের বিপর্যয় — এই কথা রাম ভুলতে পারেন নি। নির্বাসনের প্রাক্‌কালে 'দৈব' বলে লক্ষ্মণকে বুঝাতে, হয়ত নিজের মনকেও শান্ত করতে, যে কথা বলেছেন — তা যে তাঁর অন্তরের একমাত্র কথা ছিল না — তা বুঝা যায় অযোধ্যার বাহিরে প্রথম রাত্রে লক্ষ্মণের কাছে মর্মবেদনা প্রকাশে। আবার বিরাধের হাতে পুতুলের মতো অসহায় সীতাকে দেখেও তাঁর মনে পড়েছে — কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতার কথা —

প্রাণ তেজোঁ কৈকেয়ী পুরোক মনোরথ।
আবে অবিকলে রাজ্য করোক ভরত ॥
কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
দুই হন্তো কৈকয়ীত করিলো ভকতি ॥
তথাপি তো নৃপুরিন পাপিষ্ঠার মন।
মাতিব্রাক লাগি মোক পাঠাইলেক বন ॥ (২৭০০)

এই জাতীয় ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা — বার বার বলেছেন রাম যখন-ই কোন গভীর ক্ষোভের কারণ হয়েছে, যেমন মায়াসীতা বধে, লক্ষ্মণ [illegible] ইত্যাদিতে। কিন্তু এ থেকে বিমাতার প্রতি এই মর্মের গভীরে বিরূপতা ও ঘৃণা থেকে মনকে পরিষ্কারের চেষ্টাও করেছেন। তার চরম অবস্থাটি দেখা যায় লঙ্কা-কান্ডে। দশরথ কোনদিন কৈকেয়ীকে ক্ষমা করতে পারেন নি - আর পিতার এই গভীর মর্মবেদনা রামের অন্তরের গভীরে প্রোথিত। তাই সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর যখন দশরথ আবির্ভূত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করলেন, তখন শ্রীরাম শেষ প্রার্থনাটি করে-ছিলেন পিতার কাছে, দশরথ যেন কৈকেয়ীর অপরাধ মার্জনা করেন —

রাঘবে বোলন্ত বাপ বচন ন বাধো।
এমানি গোচর তয়ু চরণত সাধো ॥

বুলিনা পাপিষ্ঠা আর ন চাহিবো তোক ।
কৈকেয়ী মায়র দোষ সব দিয়া মোক ॥
তোমার মনত যদি হেনয় সন্তোষ ।
সমস্ত এরিলো কৈকেয়ীর যত দোষ ॥ (৬৫৪১-৪২)

রামচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বাল্মীকিও উল্লেখ করেছেন তবে কন্দলীর ক্ষেত্রে আরো আবেগপূর্ণ ।

কন্দলীর কলমে রামচরিত্রের আর একটি মৌলিক দিক চিত্রিত হয়েছে — বনবাসাজ্ঞা প্রাপ্ত রামচন্দ্রের সীতা-সম্ভাষণের প্রাক্-মুহূর্তে । রূপমুগ্ধ, কাম-চঞ্চল তরুণের মনে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যাবার আশঙ্কা বেদনায় যে ভাব-ভাবনা জাগে — তেমনি ভেবেছেন রাম । সর্বাঙ্গ সুন্দরী সীতার বর্ণনা —

মুখচন্দ্র অরি অমৃতর অভিলাষে ।
গ্রাসিবাক লাগি রাহু আসিভেলা পাশে ॥ (১৮২৮)

ইত্যাদি আটটি পদে দীর্ঘ বর্ণনা অত্যন্ত বেমানান । বাল্মীকি বলেন নি । এই অতি স্থূল নাগর-মানসিকতা রামচরিত্র মহিমা ক্ষুণ্ণ করেছে । পক্ষান্তরে সীতাবিরহী - রামের যে প্রেমোদ্দীপ্ত অরণ্য-কিষ্কিন্ধ্যা-সুন্দরা কান্ডে বাল্মীকি রচনা করেছেন এবং কন্দলী সার্থক অনুরণন করেছেন তা স্থূল যৌনতা মুক্ত প্রেমরস । সুগ্রীবের কাছে সীতার পরিত্যক্ত অলঙ্কার পেয়ে —

হা প্রাণেশ্বরী বলি কান্দি মূর্ছা গৈলা ।
ভূমিত পরিয়া প্রভু অচেতন ভৈলা ॥ (৩৪২৮)

একান্ত মানবিক উত্তেজনায় ভরা । আর একটি চিত্র - হনুমান সীতার অভিজ্ঞান মণিরত্ন দিয়েছেন রামকে । রামের অবস্থা ও আস্বাদন —

আজিসে মরিলো শোকে হৃদয় নধরে ।
তপত খোলাত দিলে যেন মৎস্য মরে ॥
মালিক দেখিয়া আগে হরিষ মিলিল ।
সীতাক সুমরি আরে অগনি জ্বলিল ॥ (৪৬৬৩)

একান্ত মানবিক। ততোধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও প্রেমরসে সমৃদ্ধ - রামচন্দ্রের হৃদয়ের গভীর আকুতি ও ব্যাকুলতা কন্দলীর ভাষায় অনবদ্য রূপ পেয়েছে।

হনুমন্ত মোহোক পিঠিত করি লোয়া।
সীতার পাশত নিয়া এতিক্ষণে থোৱা॥
চন্দ্রবদনী দেখো চক্ষু মোর ভরি।
অনিন্দ্রিয়া থাকোহো লাজক পরিহরি॥ (৪৬৬৪)

রামচরিত্রের বিচিত্র ও বহুমুখিতার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ — বালীবধ, ভরত সম্বন্ধে ধারণা ও সীতার প্রতি আচরণ। বাল্মীকি যেভাবে এই বিতর্কিত বিষয় ও ব্যবহারসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন — কন্দলীও তার অনুসরণ করেছেন বিশৃঙ্খল ভাবে। কিন্তু বাল্মীকির রচনাতে রামের লোক-অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে গাম্ভীর্য আছে, কন্দলীতে তা পাওয়া যায় না। প্রত্যাবর্তনের পথে ভরদ্বাজাশ্রমে রাম হনুমানকে পাঠিয়ে দিলেন ভরতের কাছে। বলেছিলেন রামের প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে ভরতের মনের ভাব কি, মুখে তার প্রকাশ কেমন - তা যেন হনুমান লক্ষ্য করেন। কারণ মানুষ কোন বিশেষ অধিকার ভোগ করলে তার চিত্তবিকার হতে পারে। এই সূক্ষ্ম নির্দেশ কন্দলীর রাম দেন নি হনুমানকে — কেবল বলেছেন —

পাছে তুমি নন্দিগ্রাম নগরীক যাইয়া।
ভরতর আগে সব কুশল জানাইবা॥ (৬৫৮১)

দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, লক্ষ্মণ ভরতাদির চরিত্র মোটামুটি বাল্মীকির আদলে রচিত। কৈকেয়ীর রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ দশরথের সত্য-শৃঙ্খলে বন্ধন ও তারজন্য আমরণ গ্লানি ও অপরাধ বোধ, কৌশল্যার ধৈর্য, কৈকেয়ীর সপত্নী ঈর্ষা, লোভ ও নিষ্ঠুরতা; সীতার রামৈকপ্রাণতা, রামের প্রাণ-ঈশ্বর লক্ষ্মণের জীবনের "অনু-ব্যঞ্জনের মত" অপরিহার্য ভ্রাতৃভক্তির বিগ্রহ ও অপরাজেয় পৌরুষের আধার লক্ষ্মণের ধর্মের দিকে রামচন্দ্রের থেকেও মহত্তর। ("রামাদপি হিতং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্") ভ্রাতৃভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ — স্বাদুতম 'পলান্নের মত '' ভরতের এবং হনুমান বালী, সুগ্রীব, রাবণ-বিভীষণাদির চরিত্রের যে রূপরেখা বাল্মীকি রচনা করেছেন,

কন্দলী তারই অনুসরণ করেছেন। তবে রাবণচরিত্র সমকালের ভক্তিভাবের আলোকে প্রচ্ছন্ন ভক্তের আভাসে কখনো বা নতুন রঙের ছটায় আলোকিত।

তবে কিছু কিছু ছোট চরিত্রে কন্দলী নতুন রং দিয়েছেন। যেমন মন্থরা বা কুজার চরিত্র। কুজা যে রামের অভিষেকের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীকে বুদ্ধি দিয়েছিল, ভরতকে রাজা করতে চেয়েছিল — সেটা তার বুদ্ধি মতো কৈকেয়ীর — তার স্বামিনীর মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু কন্দলী তাতে একটি এমন মাত্রা দিয়েছেন, যাতে কৌতুক রস এবং তার সঙ্গে খানিকটা ভ্রষ্টাচার ও কুরুচির আভাস আছে। ভরত ফিরছেন শুনে কুজা নানা অলংকার ভূষণে সজ্জিত হয়ে চলল কৈকেয়ীর ঘরে —

মই বান্ধো রূপবর হেনয় সো হয়।
মোহের স্বরূপে দেখো আমানো জ্বলয়।
বয়সত বর মই ভরতত করি।
কামবশ ভৈলো মিটো দোষক ন ধরি।।
বিদিতে কুমারে যেবে নাজে কিছু করি।
গুপ্ত রূপে তথাপি তো হৈবো পাটেশ্বরী।। (২২৮৭-৮৮)

কন্দলী রামায়ণে সমকালীন সমাজ :

মানুষ সামাজিক জীব। সমকালের ভাব-ভাবনা, ব্যবস্থা-আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সংস্কার সবকিছুই মানুষের অন্তরে অবচেতনে অবস্থিত। কবিরাও এই চেতনার অধীন। অনুবাদ করবার কালেও কাহিনীর উপস্থানে, বর্ণনায় চরিত্র চিত্রণে উপজীব্য গ্রন্থের বাহিরে এসে অনুবাদক কবি সমকালের ভাবনার রসে লেখনী অভিসিঞ্চিত করে নেন। ফলে তাঁর রচনার খুঁটিনাটি দেখে বিশ্লেষণ করে কবির স্থান কাল সম্বন্ধে বিপরীত ক্রমে অবহিত হওয়া যায়।

কন্দলীর রামায়ণেও তার স্বাক্ষর পরিষ্কার। রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃতি কিছুটা অস্ফুট হলেও বাল্মীকি স্থানে স্থানে দিয়েছেন। কন্দলীতে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট। বিষ্ণুপূজার কথা বাল্মীকিতে আছে। কন্দলীতে তার

সঙ্গে মিশেছে শিবার্চনার রং। বৈকুন্ঠের সঙ্গে কৈলাসের কথাও এসেছে। সমকালে শৈবশাক্ত ধর্মের প্রভাব আসামে পর্যাপ্ত ছিল। নানাদিক থেকে এই ভাবকল্পনা ক্রিয়াশীল।

রামের প্রাসাদকে বাল্মীকি বলেছেন ইন্দ্রাবাস সদৃশ। কন্দলীর ভাষায় —

রামের প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান।
বিদ্যুতর কান্তি যেন জ্বলে থানে থান ॥ (১৬৪১)

প্রাসাদের স্থাপত্য ও অলঙ্করণে - শিবপার্বতীর চিত্র, কার্তিক গণেশের চিত্রাদিও আছে —

শঙ্করক লেখিল আছন্ত বৃষস্থানে।
পার্বতীক লেখি আছে সিংহর বাহনে ॥ (১৬৪৬)

সমকালে নাথ যোগীদের প্রভাবও ছিল পূর্বাঞ্চলে। কন্দলী তারও চিত্র দিয়েছেন রামের বনগমন কালে অনুসরণকারীদের মধ্যে

যোগীর কান্ধত কালিজুলি যত
হাতে দোয়াদশ কাঠি।
নয়রান্তে নয়রান্তে পাচে চান্তে
হিয়া মানে গৈল ফাটি ॥ (১১৬০)

হর-পার্বতীর দাম্পত্য আদর্শ সর্বকালে স্বীকৃত হলে, স্থান কাল বিশেষ তার উল্লেখাধিক্য বিশেষ সময়ের নির্দেশক :

তুমি সমে চিত্রকূটে হৈয়ো আমি খিত।
গৌরী মহাদেবে যেন কৈলাস গিরিত ॥ (২০৬৮)

শাক্ত আচারের নিদর্শন —

আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।

মনসা বা গারুড়ী বিদ্যার কথাও আছে। রামের কথায় লক্ষ্মণ কিরকম শান্ত হলেন

যেহেন সর্পর বিষ শিখাগ্রহ গৈল।
লক্ষ্মাই আনি গারুড়ী নিস্প্রভ বপর কৈল ॥ (১৭৬৬)

রামায়ণ-কাহিনীর বর্ণনাভূমি ও পরিবেশ বন-নদী-পর্বতাদি প্রধান। কেবল অযোধ্যা কাণ্ডে ও লঙ্কাকাণ্ডে দশরথের ও রাবণের পুর ছাড়া নাগরিক জীবনের বর্ণনা নাই। কন্দলীর রামায়ণে সামাজিক নানা বর্ণনা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পর আসামে জাতিভেদ প্রায় নাই বললেই হয়। গোত্র ও বৃত্তিগত জাতিভেদ আসামে নেই। তবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মাধব কন্দলীর রামায়ণে বৃত্তিগত জাতির বর্ণনা রয়েছে।

ক্ষত্রী বৈশ্যগণ, কায়স্থ সজ্জন
নট ভাট তেলী তান্তী।
ঠঠারি সোনারি কঁহার সেখোরী
ভরতর লগে যান্তী॥
বনিয়া চামার কমার সুতার
ধোবা আরু কুম্ভকার॥ (২০৮২)

এই কাহিনী ভরতের সঙ্গে রামকে বন থেকে ফিরিয়ে নেবার আয়োজনে ছিল। আবার রাম বনবাস গমনকালে তার সঙ্গে যাওয়া লোকীর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়াও-

পুস্তক কান্ধত ধরিয়া পাচত,
চলিলা ব্রাহ্মণ যানে।
নট ভাট আদি কিঙ্কর নফিল,
আছিল যতেক মানে। (১১৬৩)

আসামের কয়েকটি শিল্প ভারতবিখ্যাত বস্ত্র, বেত, বাঁশ ও কাঁসা। এই সমাজের বর্ণনা থেকে আসামের কাঁসা শিল্পের প্রাচীনত্ব ও নিরূপিত হয়। আসামের কাঁসা শিল্পের একটি সর্বভারতীয় মূল্য আছে। আর রামায়ণে 'কঁহার' শব্দ তৎকালীন সমাজে এ শিল্পের প্রচলনের ইঙ্গিত করে। তেমনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কন্দলী তান্তী কথাটি মাত্র উল্লেখ করেছেন।

রাম বন গমন কালে অনুসরণকারী প্রজাগণ রামের কৌশলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু রামের বিরহে সবাই নিজ কর্ম ত্যাগ করে। সেই বর্ণনায় বর্ণগত কর্মের পরিচয় আছে,

দেবরীয়ে দেব পূজা করিলে বিচ্ছেদ।
ব্রাহ্মণ সকলে নপঢ়য় আরো বেদ ।।
ক্ষত্রে এরিলেক অস্ত্র শস্ত্র কর্ম্ম।
বৈশ্যে এরিলেক কৃষি বাণিজ্যর কর্ম্ম ।।
শূদ্রে এরিলেক সেবা বিষাদিত লোক।
পুত্রে, মাতৃ এরিলে তেজিলে প্রাণে শোক ।।
সকলে প্রজাক ভৈল অসুখ আকৃতি।
ছত্রিশ জাতিয়ে তেজিলেক নিজ বৃত্তি ।। (২০০৫-৭)

উপমামূলক প্রবাদ বাক্যের মধ্যেও বৃত্তি বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমাজ পরিচয় সূত্র পাওয়া যায় —

বিপ্রর কপিলা যেন চণ্ডালের ঠায়ে। (৪১২০)

হাড়ী জাতি হয়া পরিবাক চাসে বেদ। (৩১৭৬)

এই বৃত্তিগত সমাজ পরিচয় ছাড়াও উপমা অলঙ্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে সমাজের আভাস আমরা পাই তা প্রধানত: কৃষিভিত্তিক। বিভিন্ন চিত্রকল্প এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

১. হিয়া মাটি পাইল যেন কুর নাঙ্গলর।
২. বোঝার উপর যেন শাক পর্বতর।
৩. ধান্যক পীড়িয়া বিনে বনে থাকে জুরি।
৪. খর লাগা ধান যেন বরিষণ জলে।
৫. মুখে দিলে ধান আথে যেহ্নে যেন হেমনি বন্ধে নিশ্বাস।
৬. কোন বংশে হোবস্ পতান যেন তুষ।
৭. বিচি ধান রুইলো যেন উখরা ভূমিত।
৮. মাণ্ডে ধান খাইলে তাতির কাটে বাটি।

৯.   নির্গত প্রাণীর নাহি কৈত ভাত কণ্ঠ ।

১০.   মেরুর সমান চরায় করিল খরিকা জহার পিঠা ।

কৃষি প্রধান দেশ আসামের কথার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রধান শত্রু পঙ্গপালের উল্লেখও কন্দলীর রামায়ণে পাওয়া যায় । এই পঙ্গপালের কথায় মনে হয় কন্দলীর সময়ে অথবা অদূর অতীতে আসামে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল । সুগ্রীবের আদেশে বানর সৈন্য সমাবেশের বর্ণনায় আছে —

১.   'আসিলেক সৈন্যগণ দশো দিশ ছানি ।।'
     আকাশ ছানিয়া যেন ফরিঙ্গ উজান্ত ।   (৩৭৫৬)

২.   যেহেন ফরিঙ্গ উড়ে বানর আকাশে ।   (৩৭৮১)

কন্দলীর রামায়ণে 'নট' শব্দের ব্যবহারে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতজীবী সম্প্রদায়ের স্থিতির সূচনা করে । তবে এরা সমাজে অন্ত্যজ ছিল তার আভাস পাওয়া যায় সীতার উক্তিতে —

'আমাক ইতরনারী সম দেখিলাহা ।
নটর নটিনী যেন আনক বিলাহা ।।'   (৬৫০৮)

এই ইতর শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় নটিনী বহুভোগ্যা ছিল ।

নটের উপস্থিতিতে নৃত্যগীতাদির প্রচলন আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখে এই বিদ্যার সমাদর বোঝা যায় ।

বীরঢাক ঢোল বাজে   তবল ডগরা দস্তি
শব্দ শুনিয় কোলাহল ।
ভেমচ ফেমচ চয়,   ঝাঝর রেমচি বাজে
রাম তাল আরু করতাল ।।
টোকারি বেন্দরা রুদ্র   বিপঞ্চি দোতরা বাজে
বীণা বাঁশি দোশরী মোহরী ।
ডিডির কাহালি শিঙ্গা   ভেরী ডাকে নিরন্তর
মুর্ন ভুবনকো শৈনা পুরি ।।   (৩৬১৪)

এর মধ্যে কিছু বাদ্যযন্ত্র আজও বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ।

নৃত্য গীত বাদ্যের সঙ্গে অন্য একটি জনপ্রিয় বিষয় খেলা । প্রাচীন কাল থেকেই মনোরঞ্জনের এক পন্থা খেলা । কন্দলী সেই খেলাকেও অবহেলা করেন নি । তাঁর কাব্যে খেলার পরিবেশ না থাকলেও তিনি এর বর্ণনার অবকাশ খুঁজে পেয়েছেন সুন্দরা কান্ডে ; যখন হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কাপুরী ভ্রমণ করছে সেই সময়ে । লঙ্কার বর্ণনার সঙ্গে রাক্ষসদের বিভিন্ন খেলার যে বর্ণনা তা একান্তই মাধব কন্দলীর নিজস্ব ।

'কৌতুহলে খেলাবয় সুবর্ণর ঘিলা ॥
ভন্টা খেড়ি খেলাবয় কতো খৈলে ঝুন্টি ।
ঠায়ে ঠায়ে ক্রীড়া করে আকুটি ভ্রূকুটি ॥
ছয়াল মেলেক্ক সবে করে হাতাহাতি ।
মাল বান্ধে যুজয় দেখিতে ভাল আতি ॥
ঢোপ খেড়ি খেলাবয় কতো নুনি নুনি ।
গুবাল গুয়ালা খেলে আনন্দিত শুনি ॥
ফল ফুল টোকরা আরর জুয়া পাশ ।
দলি যুজে খেলে কতো নব্রি হতাশ ॥ (৪০০৬ - [illegible])

সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও কন্দলী বর্ণনা করেছেন । বিবাহের পর রামাদির প্রত্যাবর্তনে তাঁদের বরণের উল্লেখ অযোধ্যা কান্ডে পাওয়া যায় । স্ত্রী আচারের মাধ্যমে অশুভ নাশ হওয়ার উল্লেখ আছে । অধিবাসের পর যজ্ঞের প্রথাও ছিল, তা ছাড়া যাত্রা কালে মঙ্গলামঙ্গল, অঙ্গকম্পন, কাক চরিত্র, কথন ও স্বপ্ন ফল ইত্যাদির প্রভাব ও সংস্কার সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল ।

১. থাপিলন্ত গৃহত সুবর্ণময় ঘট ।
কন্যাসবে পারিল বাটত নেত পট ॥
আপোনার আচার করিল নারীগণে ।

২. আশীর্ব্বাদ দিয়োক মায়্ করিয়া আঘ্রাণ ।
সীতা সমন্বিতে মোর আজি অধিবাস ।।
মাঙ্গল্য দিয়োক মায়্ স্ত্রীর আচার ।
বিঘিনি বিনাশ হৌক সীতার আমার ।। (১৫৫৫-৫১)

৩. শুক্লা চামর ফল পুষ্প দধি ক্ষীর ।
সুবর্ণর ঘটত সাত সাগরের নীর ।।
গঙ্গা যমুনাক আদি যত তীর্থজল ।
শ্বেত ছত্র জ্বলে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ।।
সুবর্ণ কুম্ভত সুগন্ধিত ভরি জল ।
সুবর্ণ পতাকাধ্বজ রচিল চিত্রল ।। (১৬০১-০২)

৪. বেদমন্ত্রে অগণিত আহুতি করিল ।।
আহুতির শেষে রাম আনন্দিত মনে ।
দেব্ ঘরে থাকিলন্ত কুশর শয়নে ।।

গ্রহ নক্ষত্রের শুভাশুভ প্রভাব, স্বপ্ন দর্শনের মঙ্গলামঙ্গল আর যাত্রাপথের শুভাশুভ দর্শনের বিশ্বাস বাল্মীকির কাল হতে আজ পর্যন্ত মাত্রাভেদে প্রচলিত । রামকে যুবরাজ করার সময় দশরথ দুঃস্বপ্নের উল্লেখ করেছেন যার ফল গ্রহণ দুর্বিপাক এবং মৃত্যু ।

১. স্বপ্নেক দেখিয়া বিচলিত মোর চিত ।
ভূমিকম্পে নির্ঘাত পরিল পৃথিবীত ।।
দুই গ্রহ মন্দ মোর রাহুয়ে মঙ্গলে ।
দৈবজ্ঞে গণিয়া মোত কহিল সকলে ।। (১৫৪৭)

ভরত মাতুলগৃহে দুঃস্বপ্ন দেখে পিতা দশরথের অমঙ্গল আশঙ্কা করেছেন ।

পিঙ্গল বরণী নারী একজনী
আলিঙ্গি আসি ধরিল ।
ইসব স্বপ্নের ফলে নিরন্তর
কহয় বাপর কাল ।। (২২২৪)

আবার বালী যুদ্ধ যাত্রা করার সময় তারার দুঃস্বপ্ন ও ডান চোখ স্পন্দিত হচ্ছে ।

স্বপনর কথাকহো শুনিয়োক প্রভু তযু
হৃদয়ত লাগি গেলা যাটি ।
উপরোক হইয়া গোড় তোমার শরীর গোট
সমূল পল্পিল যাটি ফাটি ।। (১৫৮৪)

ডাহিনর চক্ষু মোর সঘনে সঘনে ফুরে ।
আক হৃদয়ত ভালে শুনা । (১৫৫৮)

এই অনুরোধ রক্ষা না করে বালী যুদ্ধ যাত্রা করলে বিভিন্ন অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখতে পান ।

মাথার উপরে কাক শগুণ বর্ণায় ।।
বাম পাশে সর্প যায় ডাহিনে শৃগাল ।
কাক গৃধ পাখীর আকাশে কোলাহল ।।
চন্ডবায়ু বহে ঘোলা খাপরর জাক ।
কিঙ্কিণ্ধ্যাত বুধিরে বরিষে জাকে জাক ।
হাক্কং কৃহি নমানিয়া রণক গমন । (১৫১৭-১১)

রাবণের প্রতি মাল্যবানের উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য,

লঙ্কাতে অনিষ্ট ভৈলা তোমার কারণে ।
পথে পথে শৃগালে আরাব করে মনে ।।
শূকর কুকুর সব ফুরে পালে পালে ।
রাক্ষস কুলর ভৈলা প্রলয়র কাল ।।
গো সবে প্রসবয়ে গর্দভর ছাল্ল ।

নেউলর গর্ভত ইন্দুরর উদ্ভার ।।
কুকুরে বানর হোবে বিরালা বাঘ ।
ইরিকত উট হোবে মহিষত ছাগ ।।
সুপনর নারী সব দিগম্বর বেশ ।
রাক্ষস সবক খাইলা মুক্ত করি কেশ ।।
মেঘ সবে বরিষয় পর্বত শিখরে ।
কাক সবে বিনাচয় লঙ্কার উপরে ।।
ঠায়ে ঠায়ে দেখিয়া পুরুষ মুণ্ড লুণ্ডা ।
হস্তী মুণ্ডা দীর্ঘ তুণ্ডা খুখুণ্ডা চামুণ্ডা ।। (৪১৭৫-৪১৭৮)

মৃতদেহ অগ্নিসংস্কার করার বিবরণ আছে দশরথ, বালী ও রাবণের মৃতদেহ সৎকারের বর্ণনায় । মৃতদেহ চতুর্দোলায় তুলে আত্মীয় স্বজন সেই দোলা কাঁধে শ্মশানে যাওয়ার রীতি ছিল । দশরথের চিতায় উরুখল ও মুষল স্থাপনের কথা পাওয়া যায় । পশু বধ করে হোম করার ও সবৎসা ধেনু দানের পর মুখাগ্নি করার বর্ণনা পাওয়া যায় ।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরত ও শত্রুঘ্ন দশদিন অশৌচ পালন করে একাদশ ও দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ করেন ।

একাদশা দোয়া দশা শ্রাদ্ধ নিরন্তিন ।
নানাবিধ দান পাছে ব্রাহ্মণক দিল ।।
হাতী ঘোড়া রথ যত চতুর্দ্দোলা যান ।
দাসী দাস রূপা সোনা গৃহ বস্ত্রদান ।।
তাম্বুল ভোজন মাল্য আরো বর বস্ত্র ।
শয্যা ধেনু বৃষভ দিলন্ত বর ছত্র ।। (২০৪৭-৪৮)

এই দানের বর্ণনা যথার্থই একজন রাজার, এই শ্রাদ্ধ সহস্রোপচারের । আবার বনবাসী রাম লক্ষ্মণ যে [redacted] পিণ্ড দ্বারা শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করেছেন তা যথার্থই বনবাসীর উপযোগী ।

ইঙ্গুদীর দ্রব আম জাম আদি ফল।
এক খান করিলন্ত মন্দাকিনী জল ॥
নদীজলে বুর দিয়া অঞ্জলি করিল।
ইঙ্গুদীর দ্রব আম জাম আদি দিল ॥
একখান করিলন্ত মন্দাকিনী জল।
কুশ পারি ভূমির উপরে পিন্ড দিল ॥
হেরা পিন্ড লোয়া বনে যে হেন মিলিল ॥ (২৫৪৩)

আবার বালীর মৃত্যুর পর অঙ্গদ যে শ্রাদ্ধ করেছেন তা বৃষোৎসর্গ।

দন্ত কাষ্ঠ কাক বলি আর স্নান বলি।
অঙ্গদে পিতৃর দিলা পিন্ড জলাঞ্জলি ॥
নিজ গুরু ব্রাহ্মণে দিবন্ত স্নাহি পাহি।
অঙ্গদে করিলা কর্ম বিধিবতে চাহি ॥
নানাবিধ দান করিলন্ত বৃষোৎসর্গ।
হনুমন্ত সুগ্রীব্ সমস্তে জাতি বর্গ ॥
দানে মানে সব জ্ঞাতি লোক তুষ্ট ভৈলা। (৩৬১৭-১৮)

এই তিন শ্রাদ্ধের বর্ণনা থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে তৎকালীন সমাজে সামর্থ অনুযায়ী সবাই পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতেন।

সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভার কথাও এসে পড়ে। কারণ সমাজ মথিত উৎকৃষ্ট ব্যক্তিসমূহই রাজসভার শোভা বর্ধন করেন। কন্দলীর পৃষ্ঠপোষক রাজার রাজসভা পন্ডিত বহুল ছিল এর প্রমাণ কন্দলীর এই উক্তি —

পন্ডিত লোকর যেবে,
অসন্তোষ উপজয়,
হাত যোরে বোলো শুদ্ধ বাক,
পুস্তক বিচারি যেবে
তৈতে কথা নাপাবাহা,
তেন্তে সবে নিন্দিবা আমাক ॥ (৩৭১১)

এই উক্তি তৎকালীন সমাজে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপকতা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা প্রমাণ করে। দশরথের রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে —

"সেনাপতি যূথপতি, ম-ন্ত্রী সন্ধিকৈ।"

ইত্যাদি বর্ণনা থেকে পৃষ্ঠপোষক রাজার রাজসভার ছবি-ও ধরা পড়ে। এখানে 'সন্ধিকৈ' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'সন্ধিকৈ' আহোম রাজার পরিষদ শ্রেণীর একজন। এই শব্দের ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষক রাজার সঙ্গে আহোম রাজার সম্পর্কের কথা অনুমান করা যায়।

বাল্মীকির রামায়ণে রাজা দশরথ রামকে যুবরাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে কন্দলীর রামায়ণে অযোধ্যাবাসী রামকে যুবরাজ করার অনুরোধ জানিয়ে বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ম-ন্ত্রী ও পুরোহিতদের রাজা দশরথের কাছে পাঠিয়েছেন, এই জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন —

১. প্রজা সবে বলয় হরিষ করে মন।
রাম যুবরাজ ভৈলে সকল জীবন॥

২. দেবর আগত আমি নোবোলোহো মিছা।
রাম যুবরাজ হৈবে সমস্তরে ইচ্ছা॥ (১৫১১-১৫২৮)

এতে সভাসদ ও প্রজাদের সম্মানের আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যুবরাজের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে কন্দলীর দশরথ রামকে রাজসভায় এনে বসিয়ে রাজার গুণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দান করেন। রাম দেশ এবং প্রজা সুপালনের আশ্বাস দান করেন। এই পর্বের এখানেই শেষ নয়, রাম সীতাকে যুবরাণীর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেছেন যাতে পাত্রমিত্রাদির কাছে রাম লজ্জিত না হন। কন্দলীর এই সমাজ চিত্র এই বোঝায় যে তৎকালীন রাজার কাছে জনসাধারণ এবং পাত্রমিত্রাদি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন যাদের সম্মুখে প্রয়োজনে অ-ন্তঃপুরের স্ত্রীদেরও অবাধ যাতায়াত ছিল।

পান তাম্বুল এখনও আসামের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সভা, সমিতি, পূজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ বা বিবাহ সমস্ত কিছুতেই প্রথম এই তাম্বুলপান। তার বর্ণনাও রামায়ণে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ রীতি বহু যুগ চর্চিত রীতি।

রাম বনে গমনকালে গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হলে গুহক প্রথমে রামকে কর্পূর তাম্বুল দিয়েই আপ্যায়ণ করেন ।

কর্পূর তাম্বুল যত বিবিধ ভক্ষণ ।
রামর আগত করিলেক উপসন ॥ (২০২০)

রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন ভরত বনযাত্রা করেন, তখন প্রজাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পরে যায় সঙ্গে যাওয়ার জন্য । তার বর্ণনায় কন্দলী বলেছেন স্ত্রী স্বামীকে পান তাম্বুল দিয়ে উৎসাহিত করছে বনে যাবার জন্য ।

বিলম্ব নকরা হেরা দেউ ধরা
কর্পূর তাম্বুল খাহা । (২০৮৩)

শুধু মুখ রঞ্জক তাম্বুলই নয় তৎকালীন বেশভূষার কিছুটা আভাস কন্দলী তাঁর রামায়ণে রেখেছেন ।

অযোধ্যা কাণ্ডে কৈকেয়ীর আদেশে সীতাকে বল্কল পরিধানে বিরত রেখে দশরথের আদেশে বিভিন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয় । এখানে বিভিন্ন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায় —

১. শাশু পঞ্চাশতে পিন্ধাইলা অলঙ্কার ।
মুকুট কুণ্ডল গ্রীবে সাতেসরি হার ॥
নেপুর পগরি আনো অলঙ্কার যত ।
থানে থানে প্রতি প্রতি পিন্ধাইলা সমস্ত ॥
কঙ্কন কুণ্ডল রত্নাঙ্গুলি আরো কাঞ্চি ।
সমস্ত শরীর অলঙ্কারে নিলা ধাঞ্চি ॥ (১১০৭-০৮)

রমণীর বস্ত্র অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যের কথা বোঝা যায় সীতা বনবাস গমন কালে 'পেটারি' বা পেটিকার উল্লেখে —

চৈধ্য বরিষক লাগিয়া সীতার
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া ।
পেটারিত ভরি লৈয়া মাণ্ট করি,
সুমন্ত্র চড়িল গিয়া । (১১৫৭)

তাছাড়াও নেতবস্ত্র, নেতকমলি, পট্টবস্ত্র, চেলি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। যুদ্ধে কবচ বা সন্নাহ পরিধানের কথা থাকলেও কোন সেলাই করা পরিধেয় সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। রমণীগণের স্তন আবরণের উল্লেখও রামায়ণে পাওয়া যায়। উপরি উক্ত শ্লোকে বিভিন্ন অলঙ্কারের বর্ণনা আছে আর সুগন্ধির প্রয়োজনে ধূপ, পুষ্পমালা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কাকান্ডে পুরুষের 'পাগ' বা পাগরির উল্লেখ দেখা যায়। প্রসাধনে চন্দনের কথাও পাওয়া যায় —

১. রাঘবর শোকে তুমি গৈলা যমপুর।
খন্ডাইলাহা অলঙ্কার শিখর সিন্দুর ॥ (২২০১)

২. অনসূয়া বোলে যত দিলে অলঙ্কার।
সিন্দুর চন্দন তোর নুচোক আর ॥ (২৬৪৬)

সধবার অলঙ্কার আর সিন্দুর এই দুইতেই অধিকার ছিল। উল্লেখযোগ্য যে নারীজীবনে বৈধব্য সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা। রামচন্দ্রের মায়া-মুন্ড দর্শনে বা নাগপাশে বন্ধনের সময় - সীতা বলেছিলেন — পুরুজনের উক্তি ছিল — 'অলক্ষণী সীতা নোহে বিধবার যোগ' (৪১৩১) আর্যসমাজে বিধবাবিবাহের কোন কথা বাল্মীকি বা কন্দলী দেন নি। তারাকে যে সুগ্রীব বিবাহ করেছিলেন তা বোধ হয় বানর অর্থাৎ কোন উপজাতি সমাজের সামাজিক নীতিসম্মত। তাহলেও সধবার গৌরব সর্বত্র বন্দিত।

মাধব কন্দলীর রামায়ণে খাদ্যের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। সে সময়েও এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ভাত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় অযোধ্যা কান্ডে দশরথের উক্তিতে। রামকে বনে যাবার প্রাক্কালে একদিন ভাত খেয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি।

পরিচ্ছেদা একে খানে ভুঞ্জো
আজি ভাত। (অ.কা. ১১১১)

রামের অস্বীকৃতি ও প্রত্যুত্তরটি উল্লেখযোগ্য —

রাঘবে বোলন্ত বাপ আপনে।
আজি দুয়ো ভাত খাইবো কালি সাইবনে। (১১১২)

এই উক্তিতে পুত্র বিচ্ছেদ কাতর পিতার হৃদয়বেদনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে খাদ্যের পরিচিতিও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ফল, মূল, মাংস ইত্যাদি খাদ্যের উল্লেখ বারে বারে পাওয়া যায়। ফলের বর্ণনায় আসামে পাওয়া ফলেরই নাম উল্লেখযোগ্য। নারঙ্গ (কমলা), বদরি (টককুল) খাজুরি, তেঁতেলী, কঠাল, আম, জাম, নারিকল, আমলকি, শিলিখা (হরিতকি), কৰ্দৈ (কামরাঙ্গা), আমড়া ইত্যাদি। কুম্ভকর্ণকে জাগানোর প্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে বিশাল ভোজ্য বস্তুর তালিকা পাওয়া যায়।

ডেকা পর্ব্বতর সমান বাঢ়িল,
অন্ন ব্যঞ্জনর মিঠা।
মেরুর সমান ছবার কৰিল
খৰিকা জহাৰ পিঠা॥ (৫৪২২)

এই 'পিঠা' আসামের স্নেহের দান; 'পিঠা' ছাড়া কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

মাধব কন্দলীর রামায়ণে তৎকালীন আসামের বাসস্থানের একটি চিত্র পাওয়া যায় রামের প্রাসাদ বর্ণনায়। বাল্মীকি রামের প্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে কন্দলীর বর্ণনার কোন মিল পাওয়া যায় না। তিনি আসামের বাঁশ, খড়, বেত দিয়ে তৈরী বাড়ীর বর্ণনাই করেছেন — কেবল মাত্র তার স্থান সোনা, রূপো, প্রবাল ইত্যাদি নানা মূল্যবান ধাতু। কেননা, মাল্ডুলী, রুক্মিণী, সূচি কামী মাত্র বাঁশ, বেতের ঘর তৈরী করতেই ব্যবহার হয়। তবে তাঁর বর্ণনায় প্রাসাদের দেওয়াল অলঙ্করণের কথা পাওয়া যায়। যা থেকে অনুমান হয় যে সে সময়ে যে কোন বাড়ীর দেওয়ালের শোভা বর্ধনার্থে চিত্র আঁকা হত। এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে মধ্যযুগে আসামের দেবালয় ছাড়া রাজার বাসস্থান আর অন্যান্য ঘর বাড়ী সবই বাঁশ, খড় ইত্যাদির দ্বারাই তৈরী হত। আহোম রাজত্বের শেষ ভাগে বাঙ্গার স্থপতিদের এনে আহোম রাজারা প্রাসাদ, এম্ফিথিয়েটার (রঙ্ঘর), গুপ্ত মহল, (তলাতল ঘর) ইত্যাদি তৈরী করিয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ নদী পর্বত ও বন-প্রান্তর পশুপাখী, ধাতু পর্যায়ের নানা বর্ণনা দিয়েছেন কন্দলী নানাস্থানে। বনগমনের পূর্বে রাম সীতাকে যে বনের বর্ণনা

দিয়েছেন তা এই রকম –

মহিষ বরাহ বাঘ সরভ গবয় ।
সিংহ ঘোড় রাবে আতি ত্রাসক জনয় ।।
গোলাসতে রাজগোম পর্ব্বতীয়া বোর ।
মান্ডলীক অজগর যাক নাহি ওর ।।
ইসবক আদি করি ভয়ঙ্কর সর্প ।
দরশন মাত্রে কতো হরে বল দর্প ।।
কীট পতঙ্গ জোক নকুল ইন্দুর ।
ইটো সব জন্তু আছে বনত প্রচুর ।।
গুন্ডকুরি পরুরা আছয় অসিখোন ।
যাহার প্রহারে সিংহে নসহয় টান ।।
বিহঙ্গম চাতক বনত সব মিলে ।   (১৮৫৫-৫৬)

এই অরণ্যের কল্পনা অন্য কোন রামায়ণী কবির পক্ষেই অসম্ভব । গঙ্গার বর্ণনায় ও মুখ্যত: লৌহিত্যের ছবিই ফুটে ওঠে –

কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস শুশু ঘরিয়াল ।
নানাবিধ জলজন্তু করয় আস্ফাল ।।
হংস সারসর মধ্যে বক চক্রবাক ।
জলচর পক্ষীগণ নখি ডাকে জাক ।।   (২০১৭-১৮)

একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে শুশু শিশুমার বা মিষ্টিজলের ডলফিন গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রেই আছে । তাছাড়া উপমান রূপে চিত্রকল্পে নদীর বহুল প্রয়োগ কেবল নদীবহুল দেশের কবির পক্ষেই স্বাভাবিক ।

অযোধ্যা নদীত ভৈলা দশরথ জল ।
কৈকেয়ী রবিতাপে শুষিল সকল ।।
প্রজামৎস কচ্ছপ তরত পরি মরে ।
রাম শোক মৎস্যরঙ্গে খেদি খেদি ধরে ।।   (২৬০০-৬১)

আবার ভরত শত্রুঘ্ন রামের অন্বেষণে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলে গুহক যে নৌবাহিনী নিয়ে তাদের সেবায় অগ্রসর হন তার বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে মাধব কন্দলী-র নৌবাহিনী সম্পর্কেও অনুভব ছিল। আর তা সম্ভবত: তৎকালীন রাজাদের ব্রহ্মপুত্রে রক্ষিত নৌবাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থেকেই হয়েছিল।

পশ্চিমে তিরিশে চল্লিশে সে হাতী চড়ে।
তথাপিতো নাব সব ধানিকো নলরে॥
পর্বত সমান নাবুসব বাহি যায়।
ছাপে ছাপে নাভু যেন পবন উরায়॥ (২৪৫৬)

চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত সীতা এবং রাম যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছেন সেই ফুল ফলের বর্ণনায় বাল্মীকির উক্ত নিসর্গ এবং আসামের প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

১. জাই যুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।
কাঞ্চন টগর কুন্দ সেরালী মন্দার॥
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসা হিসি।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি॥
পীন্ডীত গরবক ফুলিল সেবৃতি।
ধুন্দুর কনৌর খারো ফুলিল মালতী॥
ওর পুষ্প মালি দুরামালি আবু মালি।
তমাল তুলসী মাধে মরুয়া সেরালী॥ (২০৭৩-৭৪)

২. দেখ দেখ সীতা আম জাম পনিয়াল।
আম্বুল কন্ঠাল নারিকল নানা ফল॥
কমলা মোহরি শ্রীফলর গন্ধ বহে।
নানা ফুল ফলর সুরভি বায়ু বহে॥ (২০৭৯)

৩. কঙ্ক বঙ্ক মউপিয়া পক্ষী মনোনীত।
নানাবিধ চিত্র পক্ষী দেখিতে শোভিত॥
কোকিলব বার পেচা ফিঞ্চা শুকসারি।
মনোহর পক্ষী যত বর্ণাইতে ন পারি॥ (২০৮১)

৪. কুমুদ প্রকাশে চম্পা সরোবর পাশ ।।
জলপদ্ম স্থলপদ্ম দেখি আতিকার ।
সেয়ালী নেয়ালী পুষ্প দেখিলা অপার ।।
মধুপায়ী চটক থাকয় ভরি পুরি ।
শরদতে মধু পান করে ফুরি ফুরি ।। (৩৩৮২)

লঙ্কাতে হনুমান যে পক্ষী পুষ্প দেখেছিলেন তা সবই সোনা দিয়ে তৈরী –

সুবর্ণর হংস লড় আলিচক্রবাক্ ।
সুবর্ণর সবালি উদয় ডাকে ডাক ।।
সুবর্ণর ময়না ভাটৌ চুটিয়া শালিক ।
সুবর্ণর কপবতি ফিঙ্গা পুণ্ডরীক ।। (৪০১১)

এই বর্ণনা আর আসামের বসন্তকালীন প্রকৃতির বর্ণনায় কোন ভেদ নাই ।

বাল্মীকি ও মাধব কন্দলী

রামায়ণের প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদসমূহের মধ্যে মাধব কন্দলীর অনুবাদ বোধহয় সর্বাপেক্ষা সমধিক মূলানুগত । কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড শেষে কন্দলী লিখেছেন —

বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র গদ্য পদ্য ছন্দে ।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ।।
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমত বুজিলো ।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ।।
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে ।
পক্ষী সব উড়য় যেন পথা অনুসারে ।।
কবিসব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে ।
কতো নিজ কত কতো লম্ভা কথা অনুসারে ।
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা ।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ।। (৬১১০-১৬)

আবার লঙ্কাকান্ড শেষে বলেছেন –

সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লঙ্কা পরিহরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিক্য বোলে কাব্যরস কিছু দিলো
দুগ্ধকে মথিলে যেন ঘৃত ॥ (৬৭১০)

এই উক্তি দুটি পূর্বে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । রামায়ণের সারসংক্ষেপ লঙ্কা অর্থাৎ অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে কবি বুধিমত রচনা করেছেন । কিন্তু কবি কি লঙ্কা বা খানিকটা অতিরঞ্জন বা কাব্যরস একেবারে বাদ দিতে পারেন ? কথা প্রসঙ্গে কিছু লোককথা আপনি এসে পড়ে রসসৃষ্টির জন্য । অধিকন্তু পৃষ্ঠপোষক মহামাণিক্যের কথায় – তিনি লৌকিক কথার সন্নিবেশ করেছেন স্থানে স্থানে । সংক্ষেপ করতে গিয়ে কোন অংশ বাদ দিতে হয়েছে আবার রস সৃষ্টির জন্য কোন বিষয় বা বর্ণনা লোককথা থেকে সংযোজন করতে হয়েছে । কেবল এইসব স্থলে বাল্মীকির রচনা থেকে খানিকটা আলাদা করা হয়েছে ।

কাহিনী বিশ্লেষণ ও চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে বর্জন সংযোজন, সংক্ষেপণ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে । কাজেই এখানে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে কেবল বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র করা গেল ।

১. বিভিন্ন কান্ডে কাহিনী বিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য আছে যেমন বাল্মীকি অযোধ্যাকান্ড শেষ করেছেন অত্রি অনসূয়ার সহিত সীতা ও রামচন্দ্রের সাক্ষাতে । কিন্তু কন্দলী এ আখ্যান দিয়ে সুরু করেছেন অরণ্য কান্ড । বাল্মীকির অরণ্যকান্ডের শেষ শবরীর উপাখ্যানে এবং *পম্পা*/ সরোবর বর্ণনা দিয়ে সুরু কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড । কন্দলী চম্পা (পম্পা) বর্ণনা দিয়ে অরণ্যকান্ড শেষ, সুগ্রীব মিলন দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড সুরু । সম্পাতির কাহিনী ও বানরগণের সমুদ্র লঙ্ঘনের মন্ত্রণা দিয়ে বাল্মীকির কিষ্কিন্ধ্যা-কান্ড শেষ ও হনুমানের সাগর লঙ্ঘন দিয়ে সুন্দরাকান্ডের সুরু । কন্দলী বানরগণের মন্ত্রণা দিয়েই সুরু করেছেন সুন্দরাকান্ড, শেষ করেছেন বিভীষণের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রভাব-ধনে । এই কাহিনী বাল্মীকি লঙ্কাকান্ডের অন্তর্গত বিবরণে নয়, বিন্যাসের পার্থক্য ।

২. অযোধ্যাকান্ডে রামকে যুবরাজ পদে অভিষেকের প্রস্তাব বাল্মীকিতে দিয়েছিলেন দশরথ নিজেই – অনুমোদন করে প্রজামন্ডলী । কন্দলীতে বিপরীত প্রজামন্ডলী প্রস্তাব করে রামকে যুবরাজ করতে ।

৩. বাল্মীকির রচনা বহির্ভূত কন্দলীর নিজস্ব সংযোজন এইগুলি –
(ক) রামের কুশপাদুকা (কুশর ধরম দুটি আছে তাক দিল – অ. ২৫৮১) (খ) সীতার জন্ম বিবরণে মেনকার উল্লেখ (নামত মেনকা গৃহে দেব অপেসুরী – অরণ্য ২৬৫০), (গ) তারার অভিশাপ - (কিষ্কি-ধ্যা ৩৬৬৬-৬৭), (ঘ) রাবণদ্বারা বিভীষণের পদপ্রহার (বিভীষণ বীরর যে হৃদয় মাজত লৈয়া ক্রোধে মারিলেক এক লাথি – সুন্দরা-৪৭৬৭), (ঙ) রামের শরণ নেবার আগে মাতা ও কুবেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ (প্রণাম করিল লৈয়া মায়র চরণে - ৪৭৭৪ এবং কুবের দদাত সোধো - ৪৪৭৭-৪৭৮৬), (চ) হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন পথে গন্ধকালী ও কালনেমীর বৃত্তান্ত (লঙ্কা ৬১২০-৬২৯০)
(ছ) সরমার চিলনী রূপ ধারণের কথা (অন্তরীক্ষে চলিনা চিলনী রূপ ধরি (লঙ্কা ৪২৫১), (জ) ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র কর্তৃক অশোক বনে সীতাকে পায়েস দান (লঙ্কা ১২৯০-১৩০০)

৪. বাল্মীকি রচনার কোন কোন অংশ বাদও দিয়েছেন কন্দলী - যেমন
(ক) সুন্দরাকান্ডে তৃতীয় সর্গে বর্ণিত লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী চন্ডিকার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, (খ) অরণ্যকান্ডে ৭১তম অধ্যায়ে অযোমুখী বৃত্তান্ত ।

৫. কিছু কিছু স্থানে ঘটনায় ব্যক্তিনামের রূপান্তর ঘটেছে –
(ক) সুন্দরকান্ডে অশোককাননে সীতাকে বধ করতে উদ্যত রাবণকে বাধা দিয়েছিলেন রাবণের পত্নী ধান্যমালিনী, কিন্তু কন্দলী বলেছেন – মন্দোদরী (মন্দোদরী বোলয় - ৪২১৩) ।
(খ) ইন্দ্রজিত বধের পর রাবণ আর একবার সীতাবধে উদ্যত হলে, বাধা দিয়েছিলেন মন্ত্রী সুপার্শ্ব । কন্দলী বলেছেন মন্ত্রী অরবিন্দ (অরবিন্দ মন্ত্রী যে জানন্ত অভিপ্রায় - লঙ্কা ৬০২৬)

এই জাতীয় ছোটখাট নানা বিষয়ের অনৈক্য আছে কিছু কিছু। চরিত্রগুলির আদর্শ ঠিক আছে যেখানে কিছু অসাদৃশ্য বা আতিশয্য আছে তা চরিত্র বিশ্লেষণ কালে উক্ত হয়েছে।

কন্দলীর কাব্যসৌন্দর্য :

কাব্যসৌন্দর্য বিচারে বহিরঙ্গভাবে শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ, অলংকার, বিশিষ্ট চিত্রকল্প রচনা, বাগবিধি, প্রবাদ বা সুভাষিত বাক্যাবলী ইত্যাদির কথা এবং অন্তরঙ্গ ভাবে মুখ্যত রমণীয়তা ও রসের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এই উভয় দিক থেকেই মাধব কন্দলীর স্থান সমুচ্চ।

শব্দচয়ন ও প্রয়োগে কন্দলী তৎসম, অসমীয় তদ্ভব, অর্ধ তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের মিলন ঘটিয়ে এমন সরল সমন্বিত ভাবে প্রকাশ করেছেন - যা তাঁর অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। শব্দ নির্বাচন ও যথাযোগ্য স্থলে সমন্বিত করে তার যোজনা কবিত্ব শক্তির বিরল উদাহরণ। এক একটি শব্দের মধ্যে যে ধ্বনি থাকে – তা দিয়ে ঘটনার বা চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণে রামের বনবাস ঘটেছে, অযোধ্যার চরম দুর্গতি ও দশরথের মৃত্যু ঘটেছে। এই সমস্ত দুষ্কর্ম ও অপরাধের আধার কৈকেয়ীর পরিচয়টি – ভরতের ভর্ৎসনার মধ্যে প্রতিটি শব্দে আলাদা ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত –

শুষিণী নাগিনী খিকারুনী সংহারিণী।
নির্দয়িণী, রাক্ষসিনী বাঘিনী দারুণী ॥
যক্ষিণী, ডাহিনী তই সুস্বামী ভক্ষিণী।
পিশাচিণী, আরো রাক্ষী ভৈলি অলক্ষিণী ॥
সকলো লোকক শোকে মরি নিবিছুই।
অযোধ্যা রাজ্যত তই ভৈলি [illegible] ॥
বাপক মারিলি আগে আবে মোক খাহা।
নিলাজী বেবিনীচারী মরিবাক যাহা ॥ (২২৭৭ - ৭৯)

পদ, দুলড়ী, ছবি ও ঝুমুরী – এই চারটি ছন্দে মাধব কন্দলী রচনা করেছেন। যেখানে বর্ণনায় বেগ মন্থর সেখানে দুলড়ি (বাংলার ত্রিপদী) এবং মন্থরতা সুরেলা হলে ছবির (বাংলার দীর্ঘ ত্রিপদী) প্রয়োগ। আর আবেগঘন দ্রুততার সময় ঝুমুড়ি। আর সাধারণ বর্ণনা পদ (বাংলা পয়ার)। সাধারণভাবে দুলড়ি – ৬+৬+৮। ছবি - ৮+৮+১০, ঝুমুরী - প্রতি চরণে ৮ আর পদ ১৪। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে মাধব কন্দলী পাঁচটি কান্ডে দুলড়ি (১২৮+৪২+৪২+৬৩+২৭৬) = ৫৪৮ টি, ছবি (১৪+৩৮+৩৭+১০৫) = ১৯৪ টি, ঝুমুরী (০+২৬+১৫+৩+০) = ৪৪টি, আর পদ (৯৯৭+৬৯১+৫০৭+২৫৩+১৪৮৮) = ৩৯৯৬ ব্যবহার করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে মাধবদেব এবং শঙ্করদেবও আদি ও উত্তর কান্ডে এই আদলেই ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

কন্দলী শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় প্রয়োগেই সিদ্ধ হস্ত। অর্থলংকা-রের মধ্যে উপমাশ্রেণীর অলংকারই প্রধান। কন্দলীও এই জাতীয় অলঙ্কার-ই ব্যবহার করেছেন। অলংকৃত বাক্যপ্রয়োগে তাঁর চিত্রকল্পগুলিও মনোরম, কিছু চিরাগত কাব্যিক আর কিছু অভিজ্ঞতা লব্ধ উপমান দিয়ে রচিত। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রমুখ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার স্বভাবত:ই সমধিক –

ক) সীতার প্রভাবে মুখ মলিন সবার।
পূর্ণচন্দ্র উদয়ে ন জ্বলে যেন তার ॥ (১৫১৫)

খ) দশরথ সাগর তরঙ্গী নদী তই।
অনপেক্ষে সুধা... মাইবি আনেলোহো মই ॥
প্রিয় গঙ্গা কৌশল্যা গম্ভীর বেগে বহে।
রাম অভিষেকক বেকত করি কহে ॥ (১৫৮০)

গ) শোকবহ্নি শ্বাস ধূম বিয়োগ তোমার।
নিরন্তর শবদাহ করিবে আমার ॥ (১৭৯৭)

ঘ) কৈকেয়ীক দেখিয়া শরীর মোর কাম্পে ।
হরিণীক নিতে যেন বাঘিনীয়ে জাম্পে ॥
সর্পিণীর আগত যেন মণ্ডুকীর গতি ।
শেণীর আগত যেন কাম্প কপোবতী ॥ (১৭১১)

ঙ) মুখচন্দ্র অরি অমৃতর অভিলাষে ।
গ্রাসিবাক লাগি রাহু আসি ভৈলা পাশে ॥
ভ্রূযুগ ধনুত কটাক্ষ যেন শর ।
চমকিয়া রাহু গৈল গগন উপর ॥ (১৮২৯)

চ) উজানি বাহন্তে মই বাহিলোহো ভাটি ।
লাভক চাহন্তে মূলক করিলোহো নাটি ॥
লঙ্কাক দহন্তে মই একা ন চাহিলো ।
নগরর লগে সীতা দেবীকো দহিল ॥ (৪৫৩৭)

প্রতি সাহিত্যেই প্রবাদ, প্রবচন, সূক্তি, সুভাষিত - অমূল্য সম্পদ । প্রভূত অভিজ্ঞতা গভীর উপলব্ধি এবং অসাধারণ কবিত্ব শক্তি না থাকলে সূক্তি, প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি হয় না । মাধব কন্দলীর প্রবাদ প্রবচন অসমিয়া সাহিত্যে, সমাজে জীবনে এক অমূল্য সম্পদ । অপর্যাপ্ত প্রবাদ প্রবচনের কয়েকটি দেওয়া যাক্ —

১. সাপে খায়া মারোক গরল নোহে খাহা ।
হালে হান্দি বান্ধি নোহে মরিবাক যাহা ॥ (১৫৭০)

২. অঙ্গারক দুগ্ধে করে শতেক প্রক্ষাল ।
তথাপিতো নেরয় স্বভাব্ বর্ণ কাল ॥ (১৫৮১)

৩. বৃদ্ধর তরুণী ভার্য্যা আতি বর রতি ।
তোর বোল বাধিবাক নুহিবে শকতি ॥ (১৬০০)

৪. সুখ দুখ দুই ভুঞ্জিলেহে যায় ক্ষয় ।
তুলা ধরিয়াছে বিধি ভাগ্যে সে মিলয় ॥ (১৭৫৩)

৫. যেহেন সাপর বিষ শিখাগ্রক গৈল ।
নমাই হানি গারুড়ী নিষ্প্রভ করি থৈল ॥ (১৭৬৫)

৬. অন্ধলীর নাঠি কহি নাগি যায় । (১৭৭৭)

৭. প্রবলে সহিতে দ্বন্দ্ব নুহিতে উচিত । (১৭৯১)

৮. আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ । (২১০৬)

৯. নিশ্বাস ফোকারে যেন ঠষ্ঠারির ভাটি । (২১০০)

১০. মরন্তাক মারিলে নাহিকে কিছু ফল । (২১৩৭)

১১. আমার বাপর শাপ প্রচণ্ড অগনি ।
শুকান বনক যেন দহিবেক ছনি ॥ (২১৫৯)

১২. চণ্ডবায়ে কাম্পে যেন কদলীর বন । (২১৯১)

১৩. বিনা মেঘে আসি নিঘাত পরিয়া
যেন ভূমি ভৈলা চূর ।

১৪. বোঝার উপর শাক যেন পটন্তর ।

১৫. তপত খোলাত করে মাছ যেনমত । (২৩১৫)

১৬. বৎসক নাপায়ো যেন ধেনু হামলায়ে । (২৪২৯)

১৭. যেন কাক জীবয় বলির ভাত খাই । (২৫৫৭)

১৮. শুকান অরণ্য প্রজা নাগি গৈল ছন্নি । (২৫৯৮)

১৯. কোপ করি ছাগে গল কটার ঘষয় । (২৮৩৮)

২০. ঘৃত পাই যেহেন অগ্নি জ্বলি গৈল । (৩০০৮)

২১. ধীরে ধীরে যায় ভরি নবাঢ়ুয় আগ ।
কাটিবাক নেই যেন অষ্টমীর ছাগ ॥ (৩০৭২)

২২. সার পুটি বায় তোর হরিণর মুখ ॥
মুখত অমৃত তোত চিত্ত বিমঘট । (৩১০৮)

২৩. হেনয় স্বভাব নিদারুণ স্ত্রীজাতি ।
ভাই ভাই বেলপায়ে যাজে দিয়া কাটি ॥ (৩১১৪)

২৪. হাড়ী জাতি হুয়া পরিবাক চাস বেদ । (৩১৭৬)

২৫. বটালী নকাটে যেন বিনা হাঠুরিয়ে । (৩৭১৩)

২৬. ধান্যক পাঁড়িয়া বিনাই বনে থাকে জমি । (৩৭১৫)

২৭. ভৃত্য হুয়া তেন কুঢ় বোলয়স
গৃহস্থর পায়ে খস । (৩৭৩৩)

২৮. বিড়ালীর যদি দোষক ধরিয়া
নিতেহি হান্তি পেলাইবা । (৩৭৪১)

২৯. বিপ্রর কথিনা যেন চন্ডালের ঠায়ে ॥ (৪১২০)

৩০. উঝরা ডিঠিত যেন থাকি শৈল স্তম্ভ ॥ (৪১৪০)

৩১. বায়ু পায়া কদলী কাম্পয় যেন মতে । (৪১৬৬)

৩২. তুলা নিবে মোরারয় ভার বান্ধে শিলে ।
শুশুকুরি পুরুয়ায়ে হাতী গোট গিলে ॥
ঢোল হেন ডিমা পারে চুঙ্গার বাদুলী ।
পিপিয়া চটকে পর্ব্বতক লয়ে তুলি ॥ (৪২৯২)

৩৩. কুমারর চাক যেন ফুরাইন-ত ধরি । (৪৩৬০)

৩৪. কাকো তুলি আছার-ত বস্ত্র যেন ধোরে । (৪৩৬৯)

৩৫. ডানত ধরিয়া কতো ওলমা বাদুলী । (৪৫৩৯)

৩৬. তপত খোলাত দিলে যেন মৎস্য মরে ।। (৪৬৩৮)

৩৭. শুকান তৃণত যেন অগিনি লাগিয়া গেল । (৪৭৪২)

৩৮. আসন্ন কালত পন্ডিতর বুদ্ধি নাশ ।। (৪৯১০)

৩৯. থর লাগা ধান যেন বরিষণ জলে । (৪৯৩০)

৪০. আগ তল যায় যদি হাতীও বুরয় । (৪৯৪৬)

৪১. অলপ পানীর মল দদরা দদরি । (৪৯৩০)

৪২. ঘুষে ধান দিলে আথে হ'য়ে যেন । (৫১৮৩)

৪৩. তেলীয়ার জান্ত যেন চোবায়ন্ত দান্ত । (৫০২০)

৪৪. দান্ত ভাঙ্গা সাপ যেন মিছাত ফোম্পাহা । (৫৪৫৩)

৪৫. অগনি দহন্ত যেন শুকান বনক । (৫৪৮৬)

৪৬. নুষুভয় কুকুরায় নাদয় বিস্তর । (৫৭৭২)

৪৭. বীচি ধান বুইলো যেন উখরা ভূমিত । (৫৮১৯)

৪৮. অগনি উপজি যেন কাষ্ঠক দহয় । (৫৮৭০)

৪৯. কুশর কন্টক দিতে ঠাই নাই গাত্রর । (৫৯৫৫)

৫০. কুহুরি ঢাকিল যেন পৌষ যে মাসর । (৬০৯৫)

তৃতীয় অধ্যায়

কৃত্তিবাসের স্থান কাল জীবনকথা ও রামায়ণ বিশ্লেষণ

(ক) কৃত্তিবাসের জীবনকথা

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের তথা পাঁচালী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস ও কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে মধুসূদন কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর অনুসারী পাঁচজন কবির নাম করেছেন – ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস, মুরারি ও কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি | এ বঙ্গের অলংকার।

কিন্তু বঙ্গের অলংকার কীর্তিবাস কবি কৃত্তিবাস কবি কৃত্তিবাসের জীবনকথা - কবির ভণিতা, বা পুথির পুষ্পিকা থেকে, প্রাচীন অন্যান্য কবির মতো পুরাটা সংগ্রহ করা যায়নি। অধিকন্তু বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর এত বেশি এবং লিপিকারদের, তদুপরি গায়নদের - কলমে ও গানে তা পল্লবিত হয়েছে এত বেশী যে কোনটা কৃত্তিবাসের রচনা, কোনটা গায়নদের বা কোনটা লিপিকার প্রক্ষেপ তা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রাচীন কবির লেখায় এই বিড়ম্বনার কথা সুবিদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা অন্যান্য স্থানে সংগৃহীত যে সব পুথি – (যা প্রায় সবই খন্ডিত) – পাওয়া যায় এবং যে সব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যে ছোট ছোট কবি পরিবার আছে, তার নমুনা এইরকম – (ক)

১. কৃত্তিবাস পন্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।

২. রাঢ়া কুলে ঘর ওঝার রত্ন না সে পুরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চাপিয়া বহেন গঙ্গা সুরেশ্বরী॥
ফুলিয়া নগর সর্বলোকেতে বিদিত।
সেখানে বসেন কীর্তি বাসপন্ডিত॥

৩. মুখটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস পন্ডিত॥

৪. পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে ।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর ।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥

৫. ছোটর বন্দ বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার ।
তথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥
রাঢ়া মধ্যে বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি ।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥

৬. কৃত্তিবাস পন্ডিত রাজসভায় পূজিত ।
যাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ গীত ॥
... ...
কির্ত্তিবাস পন্ডিতের সকল গোচর ।
নানা রত্ন দিয়া যারে পূজে গৌড়েশ্বর ॥

এইসব পুঁথি এক করলে জন্মস্থান, পিতামহ, পিতা-মাতা, ছয় সহোদর, অধ্যয়ন স্থান, আচার্য গৌড়েশ্বরের সভায় সম্মাননা — ইত্যাদি পাওয়া যায় ।

তারপর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আবিষ্কৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অংশটির প্রকাশের পর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিচয় সুলভ হয় । প্রথম এর খানিকটা প্রকাশিত হয় নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম খন্ডে ১৩০৫ সালে । দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) এবং রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর গ্রন্থে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন । হারাধন দত্ত নাকি ১৪০২ শকাব্দে (খ্রী. ১৫১৯) লেখা একটি পুঁথি থেকে এই বিবরণীটুকে নিয়েছিলেন । কিন্তু পুঁথিটি পরে আর পাওয়া যায় নি । নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুসন্ধানে নাকি আত্মবিবরণীর আরও অনুলিপি পাওয়া গিয়েছিল । যাহোক এই বিবরণীর অকৃত্রিমতা নিয়ে বিদগ্ধ পন্ডিতগণ একমত হতে পারেন নি । আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন যে এটি "কোন কুলজী বিশারদ গায়েনের সংযোজন ।"(৩৮) যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই বিবরণীর প্রামান্য স্বীকার করেন । ভট্টশালী প্রমুখ পন্ডিতগণ এর আংশিক সত্যতা মেনে নিয়েছেন ।

পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এবং দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আত্ম-বিবরণীতে সম্পূর্ণ উল্লিখিত সুদীর্ঘ বিবরণটি –

পূর্বেতে আছিল শ্রী দনুজ মহারাজা ।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥ ইত্যাদি

এবং রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥ ইত্য-ত মোট

৭৬টি পয়ার শ্লোকে রচিত ।

দনুজ মহারাজার পাত্র নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে অস্থিরতা দেখা দিলে, দেশ ছেড়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে এলেন এবং ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করলেন ।

গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি ।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী ॥

তাঁর এক পুত্র হল গর্ভেশ্বর । গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র – মুরারি, সূর্য, গোবিন্দ । মুরারির সাত পুত্রের একজনের নাম বনমালী । বনমালীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা ।

মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী ।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
*** *** ***
আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস ।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

অতঃপর বৎসরান্তে – ' বার বৎসরে "পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ।"

বৃহস্পতিবার উষা পোহালে শুক্রবার ।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥

গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে অনুমতি নিয়ে এলেন কৃত্তিবাস – ইচ্ছা "রাজপন্ডিত" হবেন । পাঁচটি শ্লোক লিখে দ্বারীকে দিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । পরে ডাক এল ।

রাজসভায় প্রবেশ করে কৃত্তিবাস দেখলেন –

সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে ।।
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।
পাত্রমিত্র সনে রাজা পরিহাস মন ।।
গন্ধর্বরায় বসে আছে গন্ধর্ব অবতার ।
রাজসভা পূজিত তেঁহ গৌরব অপার ।।

রাজার আদেশে সাত শ্লোক পড়লেন কৃত্তিবাস –

নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভাএ ।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চাএ ।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল ।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ।।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া ।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ।।

রাজা পুরস্কার প্রার্থনা করতে বলায় কৃত্তিবাস বললেন –

কারো কাছে নাহি লই করি পরিহার ।
যথা যাই তথাএ গৌরব মাত্র সার ।।
*** *** ***
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ ।
রামায়ণ রচিতে করিনা অনুরোধ ।।

চন্দনাদি ভূষিত কৃত্তিবাস বাহির হইলে ধন্য ধন্য করে অনুগমন করল সবাই –

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি ।
পন্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহা গুণী ।।
বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকান্ড গান ।।

এই হল আত্মবিবরণীর সার কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে — জন্মের মাস, বার তিনি উল্লেখ করলেন কৃত্তিবাস, কিন্তু সনের উল্লেখ নেই কেন ? আর গৌড়েশ্বর কে ? কেন তাঁর নাম বললেন না কবি ? এইখানে জট পাকিয়ে গেছে এবং তর্ক তুমুল হয়ে দেখা দিয়েছে।

মূল প্রশ্ন দুটি — কৃত্তিবাস কখন, কোন সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং কোন রাজার সভায় উপস্থিত হয়ে তার আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। এক দিক থেকে দুটি নয় একটিই আসল প্রশ্ন কৃত্তিবাসের কাল নির্ধারণ। গৌণ প্রশ্ন — কৃত্তিবাস কোথায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, বেঁচেছিলেন কতদিন ইত্যাদি।

এ নিয়ে বহুকাল ধরে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। "আদিত্য বার শ্রী পঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এবং পাঠান্তর "পুণ্য মাঘ মাস" ধরে জ্যোতিষ্ক গণনা করে সময় নিরূপণের চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ মুখ্যত: যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। পূর্ণ মাঘ মাস অর্থাৎ ২৯শে কি ৩০শে মাঘ ধরে প্রথম গণনা করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ১২৫০ শক থেকে ১৩৫০ শক পর্যন্ত এক শত বৎসরের মধ্যে সংক্রান্তিতে রবিবার শ্রী পঞ্চমী তিথি পড়েনি। (খ) তারপর মত পরিবর্তন করে লেখেন যে ১২৫৯ শকের ৩০শে মাঘ ও ১৩৫৪ শকের ২৯শে মাঘ এই যোগ ঘটতে পারে। (ঘ) অত:পর তিনি ১৩৫৪ শকের ২৯শে মাঘ রবিবার, (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) কৃত্তিবাসের জন্ম দিন ধার্য করেন। অবশ্য এই অবধারন সকলে মেনে নেন নি।

এবার গৌড়েশ্বরের কথা। তিনি কি রাজা গণেশ, না তাঁর পুত্র যদু জালালুদ্দিন না মহেন্দ্রদেব, দনুজমর্দন দেব ? না, শাহাবউদ্দীন বায়জিদ না রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ? কিংবা কংসনারায়ণ ? এই বিচারে গৌড়ের শাসকদের সময় নির্ধারণ, মুদ্রা এবং পাত্রগণের কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, প্রভৃতির যথাযথকরণ, "পূর্ণ মাঘ" বা "পুণ্য মাঘ", 'দেবানুজ' অথবা যে দনুজ এই সব পাঠান্তর নিয়ে বহু পন্ডিত যাঁর যাঁর মত ও যুক্তি নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। কোন গৌড়েশ্বরের রাজসভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়েছিলেন প্রমাণিত হলেই কবির যথার্থ সময় নিরূপিত হবে। এই বিষয় নিয়ে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু,

চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হারেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক যমীন্দ্রমোহন বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, নিখিলনাথ রায়, অধ্যাপক ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তরঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, অমিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্য ইতিহাস লেখক ও বিখ্যাত বহু পন্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করেছেন এবং বলা বাহুল্য যে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। বিস্তৃত যুক্তি প্রমাণ বাদ দিয়ে আমরা কয়েকজনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

(১) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন – "গুণরাজ খান উপাধিযুক্ত মালাধর বসুই বাঙ্গালার আদিকবি এবং তৎপ্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থই বঙ্গভাষার আদিকাব্য ১৩১৫ শকে আরব্ধ হইয়া ১৪০২ শকে কাব্য রচনা সমাপ্তি হইয়াছিল। মালাধর বসু আদি শূরবংশীয় কায়স্থ পঙ্‌ক্তির অন্যতম দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লেখকের মতানুসারে কৃত্তিবাস যদি মুরারির পৌত্র হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীহর্ষ হইতে নিম্নতন দ্বাবিংশ পুরুষ। সুতরাং কৃত্তিবাস মালাধর অপেক্ষা অনেক আধুনিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (৬)

(২) রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন – "চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পাঁচ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪০২ শকে মেলবন্ধন হইয়াছিল; সে সময়ে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন না। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হইয়াছে ধরিয়া লইলেও চৈতন্যদেবের ৬৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৪২ শকে (১৪২০ খৃঃ অব্দে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন বলা যাইতে পারে।" (৮)

(৩) যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন – "তাঁহার সমকালীন ঘটনাসমূহ বিচার করিলে ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।" (৯)

(৪) চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – "রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিত হইয়াছে ১৪৪০ খৃঃ অব্দে কিংবা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম। অতএব দীনেশবাবুর মতে কৃত্তিবাসের

জন্ম শকাব্দা ১৩৬২ বা তাহার দু'দশ বৎসর এদিক ওদিক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন ১২৫৭ শকাব্দায় কৃত্তিবাসের জন্ম। অর্থাৎ দীনেশবাবুর অনুমানের শতাধিক বর্ষ পূর্বে। এই সংখ্যা পত্রিকাতেই শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া 'কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য' প্রকাশ করিয়া বলেন, কৃত্তিবাস ১৩৩০ হইতে ১৩৩৫ শকাব্দার মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।" (জ)

(৫) অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন – "যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা করিয়া প্রথমত: নির্ণয় করিয়াছিলেন যে কৃত্তিবাস ১৩৫৪ শকে ২৯শে মাঘ (১৪৩২ খৃ: ১১ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩, পৃ: ৩১৭)। পরে তিনি 'পূর্ণ' শব্দকে 'পুণ্য' শব্দ রূপে গ্রহণ করিয়া গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস ১৩২০ শকের ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিনে জন্মগ্রহণ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (তৎকর্তৃক সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উভয়ের মধ্যে ৩৪ বৎসরের ব্যবধান। *** *** *** ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্বে কংস নারায়ণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন (মধ্যযুগের বাঙলা, পৃ: ১১, ২৫, ২৯ এবং গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৩ দ্রষ্টব্য)। তখন কংস নারায়ণের সম্পর্কান্বিত এবং সাময়িক ব্যক্তিগণের উল্লেখ আমরা আত্মবিবরণীতে পাইতেছি। তখন এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, কৃত্তিবাস যদি কাহারও নিকট হইতেই রামায়ণ রচনার নির্দেশ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে কংসনারায়ণের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। ইহাকে গৌড়েশ্বর রূপে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না বলিয়াই বোধহয় তিনি আত্ম-বিবরণীতে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই।" (ঝ)

(৬) নিখিলনাথ রায় লিখেছেন – "এই তিনজন হিন্দু গৌড়েশ্বরের মধ্যে কাহার দরবারে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন আমরা এখন তাহার-ই আলোচনা করিব। *** *** *** গণেশের সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধে-ও সন্দেহ আছে। *** *** সুতরাং মহেন্দ্রদেব অথবা দনুজমর্দনের মধ্যে কাহার-ও সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। *** *** সুতরাং কৃত্তিবাসের দনুজমর্দনের

সভায় উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। ••• ••• আমরা যেরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম, তাহাতে কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, আর তিনি যে রাজার সভায় উপস্থিত রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন তাঁহাকে পাণ্ডুনগরাধিপ দনুজমর্দনদেব-ই বলিয়া বোধ হয়।" (৫৯)

(৭) অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন "উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে খুব সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস তরুণ বয়সে গৌড়েশ্বর জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের সভায় গমন করেন এবং তাঁহার-ই আজ্ঞায় রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচনা করেন।" (৬০)

(৮) সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "এই গৌড়েশ্বর কে ? আমার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)।" (৬১)

(৯) ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — "তিনি কোন গৌড়েশ্বরের সভাতে গিয়েছিলেন ? ••• ••• নানা রকম মতভেদ আছে সুতরাং তিনি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোন গৌড়েশ্বরের সভাতে গিয়ে সম্মান পেয়েছিলেন তার ঐতিহাসিকতা আমরা নির্ধারণ করতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হই নি। নানা অনুমান মাত্র করতে পারি। নিশ্চয় কোন সন তারিখ আমরা বলতে পারিনা। এইটুকু বলতে পারি — চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর আবির্ভাব হয় এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় লেখার আগে তাঁর রামায়ণ লেখা হয়। ••• ••• কৃত্তিবাস গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে রামকথা লিখতে সুরু করলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বোধ করি ভারতীয় ভাষায়। এটাই বাল্মীকির দ্বিতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ তামিল ভাষায় কম্বনের রামায়ণ।" (৬২)

গৌড়েশ্বর কে ছিলেন কৃত্তিবাসের উৎসাহদাতা — সে সম্বন্ধে মতৈক্য হয় নি কাজেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের সঠিক কাল সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা আছে। তবে এ কথা বোধ হয় সর্বসম্মত যে কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব কবি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর আরও কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক আছে। কে ছিলেন তাঁর গুরু ? "পাঠের নিমিত্ত গেলাম

বড় গঙ্গা পার।" – এই বড় গঙ্গা কোন নদী ? নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এবং অভিমত-দর্ভের ক্ষেত্রে এ আলোচনা অনিবার্য নয় ও খানিকটা প্রসঙ্গ বহির্ভূত মনে করে – জীবনী বা ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উদ্ধার করে এবং কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব এবং নিকট পক্ষে অন্তত: পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের কবি এটি স্থির করে প্রসঙ্গের ইতি করা যাক।

(খ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ

মধ্যযুগের সাহিত্য মাত্রেই পদ ও পাঁচালী এবং মুখ্যত: তা শ্রব্য ও গেয়। পুথি নকল করে করে নিয়ত গায়নরা পালাগান করত এবং সকলে শুনত। এই ছিল সাহিত্য রসাস্বাদনের একমাত্র পন্থা। যে বিষয় যত জনপ্রিয় হোতো - তার পুথির নকলও হতো বেশি। আর লিপিকারগণ না বুঝে, কখনো বা বুঝেও নিজের কবিত্ব ফলানোর জন্য নতুন শব্দ, কথা, শ্লোক যোগ করে দিতেন ফলে পাঠান্তর বাড়ত, গায়নরাও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে নতুন বস্তু আমদানী করতেন। এইভাবে পুথির পাঠান্তর বাড়তে বাড়তে - বিষয়বস্তুর আদল থাকলেও ভাষায় কথায় মিল থাকত না। যে বিষয় যত জনপ্রিয় - তার পাঠান্তর অর্থাৎ রচনার মধ্যে পার্থক্য ততো বেশি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল রাম ও কৃষ্ণ। কানু ছাড়া গীত নাই – এই প্রবাদটি বাংলা মধ্যযুগের ও লৌকিক সাহিত্যে সঙ্গীতে পুরাপুরি সত্য। রামকথার ব্যাপ্তি ততখানি ছিল না, তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কৃষ্ণ-গীতি ও কীর্তন রামকথাকে যেন একবারে আচ্ছন্ন করে দিল। ফলে রামকথাকে নিয়ে গীত, পাঁচালি উত্তরকালে কৃষ্ণকথার তুলনায় নগণ্য। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর বিষয় গৌরব ও একান্ত ভাবে পারিবারিক সুখদু:খের কথা – বাল্মীকিকে আশ্রয় করে দেশীয় রামপাঁচালী, বহু কবিকে আকৃষ্ট না করতে পারলেও একা কৃত্তিবাসের দেহবৃক্ষের বহু শাখায় প্রসারিত ছিল এবং তার অমৃত ফল এখনো বাঙালী আনন্দে আস্বাদন করে।

কৃত্তিবাসের অত্যধিক জনপ্রিয়তা এবং তার ফলে বহু পুথির লিপিতে মূল কৃত্তিবাসের রামায়ণ কোনটি বলা কঠিন। যখন প্রথম ছাপাখানা এল তখন শ্রীরামপুর থেকে আদি-অযোধ্যা-অরণ্য ও কিষ্কিন্ধ্যা – এই চার কান্ড বেরিয়েছিল ১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে - আর বাকি তিন কান্ড – সুন্দর-লঙ্কা ও উত্তরাকান্ড ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সংস্করণে নানারকমের ভুলভ্রান্তি ছিল কৃত্তিবাসের বানানটি-ই ছিল 'কীর্তিবাস'। তারপর উল্লেখযোগ্য বটতলার সংস্করণ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন – "১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বটতলা হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীরামপুরী রামায়ণের ⁎জয়গোপাল তর্কালংকার কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণ। কালে এই সংস্করণ-ই সাধারণ্যে বহুল প্রচার লাভ করে এবং ইহার প্রতিযোগিতায় অপর সংস্করণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখন দেশের সর্বত্র যে রামায়ণ পঠিত হইতেছে তাহা ঐ জয়গোপালী সংস্করণের পুন: সংস্কার মাত্র।" তারপর মোটামুটি এই আদলেই পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর, দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভটশালী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে রামায়ণ সম্পাদনা করেছেন।

কাণ্ডানুসারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয় বিন্যাস এই রকম :

আদিকাণ্ড : – বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ : রত্নাকর কাহিনী, বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার জন্য নারদের নির্দেশ ও রামকথা বর্ণন, মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্যবংশ ধ্বংস এবং হারীতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, সগর বংশের ইতিহাস। সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশ নাশ, কপিল কর্তৃক সগর বংশ উদ্ধারের নির্দেশ, গঙ্গার জন্ম, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ণ, চারিধারায় গঙ্গার মর্ত্যে আগমন ও ঐরাবতের গর্ব ভঙ্গ, মহাদেবের জটায় গঙ্গা, বারাণসী মাহাত্ম্য, জহ্নুমুনির কথা, কাণ্ডার মুনির উপাখ্যান, সগর বংশ উদ্ধার, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, রঘু কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়, অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ, দশরথের জন্ম, অজ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু, কৌশল্যার সহিত দশরথের বিবাহ, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সঙ্গে বিবাহ, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি - জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা, গণেশের মুণ্ড পরিবর্তন কথা, দশরথকে শনির বরদান, দশরথের মৃগয়া, সিন্ধু বধ ও অন্ধকের অভিশাপ, সম্বর বধ, কৈকেয়ীকে বরদানের অঙ্গীকার, কৈকেয়ীকে দ্বিতীয় বরদান অঙ্গীকার, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম ও অনাবৃষ্টির জন্য লোমপাদ রাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ণ, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ, সীতার জন্ম, চরু বিভাগ, রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের জন্ম। সকলের আনন্দ ও রাবণের আতঙ্ক, বানরগণের জন্ম, দশরথের চারপুত্রের অন্নপ্রাশন - বাল্যক্রীড়া - বিদ্যালাভ, মারীচ প্রসঙ্গ, সীতার বিবাহে হরধনু

চাপের কথা ও রাজন্যবর্গের ধনুভঙ্গে ব্যর্থতা, গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রতা, দশরথের সভায় বিশ্বামিত্র, রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা, দশরথের প্রতারণা, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, রাম লক্ষ্মণের মন্ত্রদীক্ষা, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, রাম কর্তৃক তিন কোটি রাক্ষস বধ, রামের মিথিলা যাত্রা, সীতাদেবীর বর ভিক্ষা, হরধনু ভঙ্গ, রামাদির বিবাহ, চন্দ্রবংশ উপাখ্যান পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড :— রামের অভিষেক প্রসঙ্গ ও অধিবাস, কৈকেয়ীকে মন্থরার কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা ও দশরথের খেদ, পিতৃসত্য পালনে রামের বনগমনে প্রস্তুতি, রামলক্ষ্মণ সীতার বনে যাত্রা। শৃঙ্গবের পুরে, সুমন্ত্রের বিদায় গ্রহণ, জয়ন্ত কাকের চক্ষুবিদ্ধকরণ, রাম চিত্রকূটে, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন, ভরতের বিলাপ - কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা, শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরাকে প্রহার, দশরথের অন্ত্যেষ্টি, রামকে ফিরাবার জন্য ভরতের বনযাত্রা, রামের সঙ্গে চিত্রকূটে ভরতের সাক্ষাৎ, রাম কর্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধ, রামের পাদুকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য শাসন, দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদীর প্রতি সীতার অভিশাপ ও বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্বাদ; পম্পা মাহাত্ম্য।

অরণ্যকাণ্ড :— চিত্রকূট অবস্থান ও অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে, বিরাধ রাক্ষস বধ, শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রাম ও বনান্তরে গমন, অগস্ত্যাশ্রমে রাম ইল্বল-বাতাপি বৃত্তান্ত, পঞ্চবটীতে রাম, জটায়ু পরিচয়, শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, রামের সঙ্গে রাক্ষসগণের যুদ্ধ, খরদূষণ বধ। রাবণের কাছে শূর্পনখা, সীতাহরণে মারীচের নিষেধ পরে মায়ামৃগ রূপ ধারণ, মারীচ বধ, সীতাহরণ, জটায়ু রাবণ যুদ্ধ, সীতাসহ লংকায় রাবণ ও অশোক কাননে সীতার স্থান, দেবগণ কর্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা। রামের বিলাপ, সীতা অন্বেষণ, জটায়ু সমাগম, জটায়ুর মৃত্যু, কবন্ধের শাপমুক্তি, শবরী উপাখ্যান।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড :— সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা, সীতার আভরণ প্রদর্শন, রাম-নাম মাহাত্ম্য, সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা — বালী সুগ্রীবের কলহ বৃত্তান্ত, দুন্দুভি বধ, বালীবধে ও সুগ্রীবকে রাজ্যদানে রামের প্রতিজ্ঞা। বালীবধ, তারার অভিশাপ, বালীর সৎকার ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, রামচন্দ্রের বিরহ বিলাপ, লক্ষ্মণের

দৌত্য, সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহ উদ্যম, সীতা অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ, গঙ্গা মাহাত্ম্য, উত্তরদিক থেকে বানরদের প্রত্যাগমন, রামনাম কীর্তন, দক্ষিণ পাতালে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রবেশ ; প্রায়োপবেশন, সম্পাতির সঙ্গে পরিচয়, রামনাম শ্রবণে সম্পাতির পক্ষ উদ্গম, সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান ও বানরগণের সমুদ্র লংঘন উদ্যম ।

সুন্দরা কান্ড:— সাগর উত্তীর্ণ প্রসঙ্গ, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত, হনুমানের লংকাযাত্রা, সুরসা মৈনাক প্রসঙ্গ, সিংহিকাবধ, হনুমানের লংকা প্রবেশ, চামুন্ডার লংকাত্যাগ, সীতা অন্বেষণ, অশোকবনে রাবণের আগমন, চেড়ীগণের অত্যাচার, ত্রিজটার দুস্বপ্ন, সীতা হনুমান সংবাদ, রামের অঙ্গুরীয় প্রদান, সীতার শিরোমণি দান, হনুমানের আমুবন ভঙ্গ, রাক্ষস ও অক্ষকুমার বধ, ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্দী হনুমান, হনুমানকে দন্ড, লংকা দাহণ, সীতার নিকট হনুমানের বিদায় ও কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা , মধুবন ভঙ্গ, সীতার বার্তা শ্রবণ, কপিসহ সমুদ্রতীরে রামের আগমন, রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ও বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত, বিভীষণের লংকাত্যাগ, রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রী ও বিভীষণের অভিষেক, সমুদ্রের উপাসনা ও সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উপদেশ, নল কর্তৃক সেতুবন্ধন, নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ, শ্রীরামের লংকা যাত্রা ও শিব প্রতিষ্ঠা, রামের ভস্মলোচন বধ ও লংকা প্রবেশ ।

লংকা কান্ড : — শুকসারণের রামসৈন্য দর্শন, বন্ধন ও মুক্তি, রাবণের নিকট শুকসারণের সংবাদ, শুকসারণ কর্তৃক রাবণকে রামসৈন্য প্রদর্শন, রামের শরক্ষেপ ও রাবণের পলায়ন, রাবণ কর্তৃক শুকসারণকে ভর্ৎসনা, শার্দুল চর প্রেরণ ও রামশিবিরে বন্ধন ও মুক্তি, রাবণ কর্তৃক রামের মায়ামুন্ড প্রদর্শন, সীতার বিলাপ, সরমার সান্ত্বনা, লংকার চতুর্দিকে বানর সৈন্য সংস্থাপন, দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হরপার্বতীর কলহ, অঙ্গদের রাজদ্বার রাবণের মুকুট সহ প্রত্যাবর্তন, রাবণের ঐশ্বর্য বর্ণনা, ইন্দ্রজিতের প্রথমবার যুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বন্ধন, রামলক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন দর্শনে সীতার বিলাপ, ত্রিজটার সান্ত্বনা, নাগপাশ থেকে মুক্তি, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্তের যুদ্ধ ও মৃত্যু, প্রথমবার রাবণের যুদ্ধে গমন, বিভীষণ কর্তৃক রাবণসৈন্য পরিচয়, রাম-রাবণের প্রথম দিনের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের

সঙ্গে কথোপকথন, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যু, অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ, রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা, ঔষধের জন্য হনুমানের ঋষ্যমূক পর্বতে যাত্রা, পর্বতের স্তব, ঔষধ আনয়ন - মূর্ছা ভঙ্গ, রাবণ কর্তৃক লংকার দ্বার রোধ, বানরগণ কর্তৃক দ্বিতীয়বার লংকা দাহন, কুম্ভ নিকুম্ভ ও মকরাক্ষের যুদ্ধ মৃত্যু, তরণীসেন বধ, বীরবাহু-ধূম্রাক্ষ-ভস্মাক্ষের যুদ্ধ ও মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রা, মায়াসীতা বধ, বিভীষণ কর্তৃক মেঘনাদের মরণোপায়, যজ্ঞভঙ্গ ও ইন্দ্রজিত বধ, সুষেণ কর্তৃক লক্ষ্মণের ক্ষত চিকিৎসা, রাবণ মন্দোদরীর বিলাপ, রাবণ কর্তৃক সীতাবধের উদ্যোগে মন্দোদরীর বাধাদান, রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ শক্তিশেল, রামের বিলাপ, হনুমানের গন্ধমাদন যাত্রা, গন্ধকালী উদ্ধার, কালনেমি বধ, সূর্যকে কক্ষতলে গ্রহণ, গন্ধর্ববিজয়, ভরতের বল পরীক্ষা, লংকায় আগমন, লক্ষ্মণের জীবন লাভ, হনুমানের কক্ষতলস্থ সূর্যদেবের মুক্তি, রাবণ কর্তৃক মহীরাবণকে স্মরণ, মহীরাবণের আশ্বাস দান, বিভীষণ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণকে প্রহরার ব্যবস্থা, মহীরাবণ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণ হরণ, হনুমানের পাতাল পুরে গমন - রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ, ব্রহ্মা কর্তৃক মহীরাবণের পূর্বজন্ম কথন, হনুমান কর্তৃক মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধ, রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন, রামের জন্য ইন্দ্রের রথ প্রেরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, রাবণ কর্তৃক অম্বিকা স্তব, দেবীর রাবণকে অভয় প্রদান, রাবণ বধের জন্য অকাল বোধন, দুর্গোৎসব নবমী পূজা, হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন, দেবী কর্তৃক একটি পদ্মহরণ, রামের দেবীস্তুতি, একটি চক্ষুদানের সংকল্প, দেবীর দয়া ও রামের বরলাভ, দশমীপূজান্তে বিসর্জন, হনুমানের চণ্ডীর শ্লোক বিলোপ করণ ও চণ্ডীপাঠে ভ্রমোৎপাদন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, রাবণ বধ, রাবণের নিকট রামের রাজনীতি শিক্ষা, বিভীষণের শোক, মন্দোদরীর বিলাপ ও রামের নিকট অবৈধব্য বরলাভ, রাবণের সৎকার ও মুক্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার রাম সম্ভাষণে যাত্রা, মন্দোদরীর অভিশাপ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার জন্য রামের বিলাপ, অগ্নি কর্তৃক সীতা সমর্পণ, দশরথের শ্রীরাম সম্ভাষণ ও ভরতকে বরদান, ইন্দ্র কর্তৃক মৃত বানরদের জীবন দান, সীতা রামের মিলন। বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের সন্তোষ বিধান, অযোধ্যা যাত্রা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সেতুভঙ্গ, শ্রীরামের শিবপূজা, ভরদ্বাজাশ্রমে

গমন, রামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ, রামের রাজ্যাভিষেক, অভিষেকে দেবকন্যাগণের আশীর্বচন, সীতা ও রাম কর্তৃক বানরগণের পুরস্কার, হনুমানের নিজের বক্ষমধ্যে রামনাম প্রদর্শন, হনুমানের ভোজন, বিভীষণাদির বিদায় ।

উত্তরা কান্ড : — রামের সভায় মুনিগণের আগমন, লক্ষ্মণের চতুর্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য-নিদ্রাজয়, উপবাস বৃত্তান্ত, রাক্ষসগণের জন্ম বৃত্তান্ত, মালী-সুমালী মাল্যবানের জন্ম, লংকাতে রাক্ষস রাজত্ব স্থাপন, গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত, মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবাকের পাতাল প্রবেশ, কুবেরের জন্ম তপস্যা ও লংকায় রাজত্ব, রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, রাবণ কর্তৃক লংকারাজ্য অধিকার, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম, কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ, রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ, রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা, বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার ও বেদবতীর অভিশাপ । মরুত্ত রাজার যজ্ঞ ও রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার, রাবণ কর্তৃক অনরণ্য বধ ও অনরণ্যের অভিশাপ । কার্তবীর্যার্জুনের কাছে রাবণের পরাজয় । পুলস্ত্যের মধ্যস্থতায় রাবণের মুক্তি ও কার্তবীর্যসহ রাবণের সখ্য, বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা, যমলোকে রাবণের অভিযান, রাবণের নিকট যমের পরাজয়, রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয় । রাবণের নিবাতক সহ যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের বরুণপুরী বিজয় । বলির যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা, মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের চন্দ্রলোক জয়, রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ, সূর্পনখার বৈধব্য, রাবণের স্বর্গজয়ে যাত্রা, মধুদৈত্যের সহিত মিলন, রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ, রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়, হনুমানের বিবরণ, রামসীতার জন্য বিশ্বকর্মার প্রমোদ ভবন নির্মাণ, ভদ্র নামক মন্ত্রীর কাছে রামের সীতা সম্বন্ধে অপবাদ শ্রবণ, সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের স্বর্ণ সীতা নির্মাণ, কালিঞ্জর রাজার বিবরণ, শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ দৈত্য বধ, রাম কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ, ব্রাহ্মণপুত্রের জীবনলাভ, গৃধিনী ও শেবকের কলহ, মৃত্যুহারী দৈত্যরাজের কথা, রামের অশ্বমেধ করার সংকল্প, শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়, লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন, লবকুশের সহিত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পতন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ ও পতন । রামচন্দ্রের যুদ্ধ আয়োজন, লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ, শ্রীরামের বিলাপ, রামের পরাজয়, সীতার নিকট

[redacted] লবকুশের যুদ্ধের বিবরণ, সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সংকল্প, বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্য রামচন্দ্রের প্রাণদান, লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লবকুশের বিলাপ, ব্রহ্মাদির উপদেশ, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও রামায়ণ গান, সীতাবিরহে রামের বিলাপ, ভরত কর্তৃক কেকয় দেশে তিনকোটি গন্ধর্ববধ, রামাদির অষ্টপুত্রের অভিষেক, কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জন, শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিশ্লেষণ

জীব মাত্রেই স্থান কালের অধীন । তবে অন্যান্য জীবের মতো মানুষের ক্ষেত্রে এই অধীনতা সর্বাতিশায়ী নয়, আংশিক । বিদ্যাবুদ্ধি বিচার বিবেক সম্পন্ন মানুষের একটি চক্ষু থাকে সমকালের উপর চঞ্চল, অপরটি নিত্যকালের দিকে স্থির । মানবচিত্তে একই সঙ্গে অন্ত ও অনন্তের লীলা । আবার যাঁরা কবিত্বশক্তি সম্পন্ন তাঁদের একটি তৃতীয় নয়ন থাকে নিত্য ও অনিত্যের । চিরকালের ও সমকালের মধ্যে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যসূত্র আছে তা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা সত্যকে নিজ রুচি ও শক্তিদ্বারা রসসিক্ত করে, কল্পনার রঙিন আলোকে উদ্ভাসিত করে, নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞারূপ প্রতিভা বলে রচনা করেন কাব্য — মহাকাব্য । মানুষের চিরকালের অবিনশ্বর সম্পদ । কিন্তু মানুষ মাত্রেই বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন । কাজেই নানা কবির কাব্যে নানা সুর, স্বকীয়তায় বৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্য । অনুবাদও একধরণের সৃষ্টি । কাজেই মূল কবির ভাবনা-চিন্তা, রচনার ভঙ্গি, বর্ণনার বস্তুর সঙ্গে অনুবাদকের সমকালের মানসিকতার সংমিশ্রণ ঘটে — ফলে মূলের সঙ্গে অনুবাদকের নিজের কথা — যুগধর্ম ও পরিবেশের কথা মিশে যায় । অনুবাদকের মনের গঠন অনুসারে একই বিষয়ের ভাষান্তরে ইতর-বিশেষ হয়ে পড়ে, বিষয়ানুগত্যের সঙ্গে নিজস্বতার একটা সন্ধি হয় ।

কবি কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । বাল্মীকির কথাবস্তুকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেও নিজের ভাব-ভাবনা দ্বারা বহুক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র করেছেন, নূতনতর করেছেন । এই সূত্রেই আসে পুরাতন বস্তু বর্জন, নতুন সংযোজন, পুরাতনের খানিকটা সংস্কার বা শোধন প্রমুখ পদ্ধতি । কেবল কাহিনী বা ঘটনা সংস্থানে নয়, চরিত্র সৃষ্টিতেও তার স্বাক্ষর স্পষ্ট ।

সপ্তকান্ড রামায়ণে – পাঁচটি কান্ডের নাম ঠিক থাকলেও বাল্মীকির বাল-কান্ড ও যুদ্ধকান্ড কৃত্তিবাসের ভাষায় আদি কান্ড ও লংকা কান্ডে নামান্তরিত হয়েছে। প্রথমটি আদি ও শেষটি উত্তর এই নামাংকন অপেক্ষা আদি ও উত্তর কি অধিক তাৎপর্য-বহ নয় ? আর যুদ্ধ তো অনেকই আছে, কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধ, লংকার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্ময়কর যুদ্ধ হয়েছে কয়টি ? কবি-ও বলেছেন – 'রাম-রাবণয়ো যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ।।' বাংলা প্রবাদ 'লংকা কান্ড' – কৃত্তিবাসের অবদান।

বাল্মীকির রামচন্দ্র মূলতঃ মানুষ, মহত্তম মানুষ, ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার – স্বয়ং ঈশ্বর মনে হয়। ভাবনা যেন উত্তরণধর্মী। কিন্তু কৃত্তিবাসের সমকালে ভক্তি-বন্যা অবাধ উত্তাল, ভাবনা অবতরণধর্মী। প্রথমেই বিষ্ণুর চার অংশে প্রকাশ। নারদের বিস্ময়, ব্রহ্মার জিজ্ঞাসা ও মহাদেবের বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ।

মহাপাপী হয়ে যদি রাম নাম লয়।
সংসার সমুদ্র তার বৎস পদ হয় ।। (৮)

তারপর মহাপাপী রত্নাকর দস্যুর মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি-তে রূপান্তর ও উত্তরণ রাম-নাম মন্ত্রে। এই কাহিনী কৃত্তিবাসের নতুন সংযোজন। নিজের জীবনসত্যটি, যে রাম-নাম নৃশংস দস্যুকে পরম কারুণিক ঋষিতে রূপান্তরিত করে সেটি – আদি কবির ভূমিকা – তারপর ক্রৌঞ্চবধ ও 'মা নিষাদ' শ্লোকের উক্তি এবং নারদের উপদেশে রামায়ণ শ্রবণ ও রচনা এটা – মনে হয় অধিকতর নাটকীয়।

রামচন্দ্র সূর্যবংশে আবির্ভূত হবেন তাই এ বংশের পূর্ব রাজাদের কথা বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস, বাল্মীকির ধারায় সগর বংশের কথা, ভগীরথ, গঙ্গাবতরণের কথাও বলেছেন। মোটামুটি ঠিক থাকলেও ঐরাবত প্রসঙ্গ, কান্ডার মুণির কথা কৃত্তিবাসের নতুন সংযোজন। সূর্যবংশের রঘুর বিক্রম-অজ-ইন্দুমতী-দশরথ জন্মাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কৃত্তিবাস কিন্তু বাল্মীকির সমুদ্রমন্থনাদি বাদ দিয়েছেন। বিশ্বামিত্রের জীবনকাহিনী-ও কৃত্তিবাস বর্ণনা করেন নি। বাল্মীকির রামায়ণে – রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যখন যাত্রা করেছেন বিশ্বামিত্র – তখন এইসব প্রসঙ্গ উঠেছিল চমৎকার ভাবে, কৃত্তিবাসে

নেই । ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন ও যজ্ঞাদি বর্ণনার পর চরু ভাগ নিয়ে ঋষি কবির সঙ্গে বাঙালী কবির পার্থক্য আছে । মূলে আছে পায়সের ষোল ভাগের ৮ ভাগ কৌশল্যা, সুমিত্রা ৬ ভাগ আর কৈকেয়ী পেয়েছিলেন ২ ভাগ । কৃত্তিবাস লিখেছেন —

কৌশল্যা কৈকেয়ী তার মুখ্যা দুইরাণী ।
এক ভাগ চরু হৈলা দুই খানি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে ।
শেষ ভাগ দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥

চরু না পেয়ে সুমিত্রা কাঁদতে লাগলেন । তখন কৌশল্যা নিজের ভাগের অর্দ্ধেক দিয়ে সুমিত্রাকে বললেন —

ইহাতে তোমার যদি জন্মায় নন্দন ।
আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন ॥

অনুরমতি কৈকেয়ী তখন তার পুত্রের সঙ্গী হবে এই শর্তে নিজের চরুর ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন - বাঙালী কবির হিসাব সহজ — রাম লক্ষ্মণ ও ভরত, শত্রুঘ্নের স্বাভাবিক পারস্পরিক প্রীতি কারণ সহজভাবে বলেছেন বা আবিষ্কার করেছেন ।

কৃত্তিবাসের আর একটি নূতনত্ব - বিশ্বামিত্র দশরথের কাছে রাম লক্ষ্মণকে যজ্ঞ রক্ষার জন্য নিতে এলে তাদের বদলে ভরত শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের হাতে তুলে দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন রাজা । তার কারণও ছিল । দশরথের মনে ছিল অন্ধকের অভিশাপ — পাছে রামের অদর্শনে মৃত্যু হয় ।

পুত্র শোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে ।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন ছলে ॥

তাই — প্রাণ চাহে যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি ।
এক দণ্ড রামচন্দ্র না দেখিয়া মরি ॥

প্রতারণা ধরা পড়ল ভরতের কথায় । বনের পথে গিয়ে বিশ্বামিত্র দুটি পথ দেখিয়ে বললেন — এই পথে আশ্রমে যেতে লাগবে তিনদিন অপর পথে — তিন প্রহর । তবে সোজা পথে ভয় আছে তাড়কা রাক্ষসীর । ভরত উত্তর করলেন — "দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন ।" চমকে উঠলেন বিশ্বামিত্র । সে কি ? এই কি রাক্ষসের শাস্তা রাম ? প্রতারণা ধরা পড়ল — অযোধ্যা দগ্ধ করবেন ক্রুদ্ধ কৌশিক । তারপর রাম লক্ষ্মণ গেলেন । যজ্ঞরক্ষা, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ। রামাদি চার ভ্রাতার বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ ঘটনা পরম্পরা বাল্মীকির ধারাতেই বর্ণিত । কিন্তু বহুক্ষেত্রে কৃত্তিবাস নিজস্বতা দেখিয়েছেন — গভীর ভক্তি রসের সঙ্গে কৌতুক রসের মিশ্রণে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন কৃত্তিবাস । কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা যাক ।

রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাবণের অশুভ সূচিত হল ।

আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে ।
মাথার মুকুটখানি পড়ে ভূমিতলে ।।

কী ব্যাপার ? বিভীষণ বললেন — "তোমাকে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ।" রাবণ শুক সারণকে পাঠালেন সন্ধান নিতে । অযোধ্যায় গেল শুক সারণ ।

"পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুই জন ।
চতুর্ভুজ রূপে দেখিলেন নারায়ণ ।।"

তারা ঠিক করল এ খবর রাবণকে দেবে না । বলল কোথাও কিছু দেখে নি । তখন বিভীষণের পরামর্শে ফাড়া কাটাবার জন্য তীর্থ জলে স্নান করলেন রাবণ ।

২) রাম ও ভরতের নামকরণ —

যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপে অবিরাম ।
কৌশল্যা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ।।
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত ।
সেই হেতু তার নাম হইল ভরত ।।

৩) বশিষ্ঠের বাড়ীতে রাম পাঠ নিয়েছেন —

ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি ।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
*** *** ***
কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর ।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥

অস্ত্র শিক্ষা । ধনুর্বাণ হাতে রাম ঘুরছেন এমন সময় মারীচ এল মৃগ হয়ে । রাম বাণ মারলেন —

ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে ।
মহাভীত্ মারিচ পালায় মহা ত্রাসে ॥

৪) রাম তো চৌদ্দ বৎসর বনে যাবেন রাবণ বধ করতে । কিন্তু ফলমূল খেয়ে যুদ্ধ করতে পারবেন কেন ? ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন —

মৃগান ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা ।
খাইয়ে অমৃত রস পাশরিবে ক্ষুধা ॥

৫) গঙ্গাস্নানে গেলেন দশরথ রামকে নিয়ে । নারদ বল্লেন দশরথ অজ্ঞান ।

পতিত পাবনী গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে ।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যার পদতলে ॥

তার আবার গঙ্গা স্নান পুণ্য ? নারদের কথা শুনে দশরথ ফিরে যাবেন কিন্তু রাম যেতে চাইলেন - গঙ্গার মহিমা ম্লান হবে । চণ্ডালরাজ গুহক রামকে দেখতে চাইল । দশরথ দেখাবেন না । যুদ্ধ শেষে সাক্ষাৎ হল । গুহক আত্মনিবেদন করে পূর্বজন্মের কথা শোনালেন, ছিলেন বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব । অন্ধক মুনির পুত্রকে হত্যা করায় দশরথের যে পাপ হয়েছিল তা দূর করতে বামদেব তিনবার রাম-নাম করতে বলেছিলেন দশরথকে । তিনবার কেন ? একবার-ই পর্যাপ্ত । কাজেই এই অপরাধের জন্য বশিষ্ঠ-শাপ দেন, ফলে এ জন্মে চণ্ডাল । রাম গুহকের সঙ্গে মিত্রতা করেন ।

৬) অহল্যা উদ্ধারের পর গঙ্গা পার হয়ে মিথিলা যাবেন বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ সহ । নাবিককে ডাকলেন । নাবিক শুনেছে পায়ের ধুলিতে পাষাণ মানুষের মূর্তি হয় । কাজেই রামকে নিতে পারবে না –

নৌকা মূর্ত হয় যদি লাগি পদধূলি ।
কি দিয়া পূষিব আমি মম পোষ্যগুলি ।।

৭) হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করতে এসেছেন রাবণ । বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন । শেষবার চেষ্টা করছেন –

আর বার রাবণ ধনুক খান টানে ।
তুলিতে না পারে চায় গৃহস্তের পানে ।।
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরিখে ।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ।।

৮) রামকে দেখে সীতা তাঁকে পতিরূপে পাবার জন্য ব্যাকুলা হলেন । সুকুমার তনু রাম কি হরধনু ভাঙতে পারবেন ? সীতা রাম পতি প্রাপ্তির প্রার্থনা জানালেন । দৈববাণী হল —

শুন গো জনক সুতা না হইও দুঃখ যুতা
স্বামী তব রাম গুণমণি ।।

৯) বাঙালী বিবাহের প্রতিরূপ রামসীতার বিবাহ, নান্দীমুখ, বরপক্ষ ও কন্যা-পক্ষের পরিচয় –

হরিদ্রা মাখায় চারি বয়ে কুতূহলে ।
অঙ্গেতে পিঠানী দিল সখীরা সকলে ।।
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বয়ে ।
বান্ধিল মঙ্গল সূত্র তাহাদের করে ।।

তারপর বিবাহান্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভোজন শেষে দধি, দুগ্ধ এবং কর্পূর তাম্বুল করে মুখের শোধন ।

১০) পরশুরামের দর্পচূর্ণ বৃত্তান্ত একটি কৌতুককর টিপ্পনী দিয়েছেন কৃত্তিবাস। পরশুরাম যখন রামকে বললেন আমার ধনুকে গুণ দাও — তখন সীতার মনে দুর্ভাবনা এল —

একবার ধনুক ভাঙিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুণি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥

অযোধ্যা কাণ্ডের মূল বিষয় কৈকেয়ীর চক্রান্ত রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনে গমন, দশরথের মৃত্যু, রামকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা ভরতের, রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং চিত্রকূট হয়ে রাম-সীতার বনান্তরে পর্যটন। কৃত্তিবাস এই মূল কাহিনী-ই অনুসরণ করেছেন কিন্তু সর্বত্র-ই কম বেশি নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে।

রামকে রাজা করার অনুরোধ দশরথের কাছে প্রথম করেন রাজন্যবর্গ — দশরথ নয়। বাল্মীকির অনুরূপ কৃত্তিবাসের দশরথও বলেছিলেন —

আজি অধিবাস পুনর্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ড ছত্র॥

কৃত্তিবাস মন্থরার পরিচয় ও কর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

পূর্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুব্জী হয়ে নামেতে মন্থরা॥
*** *** ***
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥

কৈকেয়ীর বর, রাম-দশরথ, রাম কৌশল্যা, রাম-সীতা, রাম-লক্ষ্মণ — বৃত্তান্তে কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকির রামের মত কৃত্তিবাসের রাম-ও কৈকেয়ীর দোষ দেখেন নি — বলেছেন দৈবই স্নেহময়ী কৈকেয়ীর দুর্মতির হেতু —

বিধাতার দোষ নাহি দোষী নহে কৈকেয়ী ।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজি ।।

বন গমনকালে কৌশল্যার সীতার প্রতি উপদেশ ও লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার প্রসিদ্ধ উক্তি-টি – কৃত্তিবাস একটু ঘুরিয়ে ভাষান্তর করেছেন —

রামং দশরথং বিদ্ধি মাংবিদ্ধিজনকাত্মজাম্ ।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব শাস্ত্রে জানি ।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী ।।

কৃত্তিবাসের রচনায় রামের বনগমন বর্ণনা, বাল্মীকির মত শোকাবহ গম্ভীর নয় – অনেকটা সাদামাটা । গৃহক প্রসঙ্গ সংকীর্ণ । সুমন্ত্রের বিদায় গ্রহণের পর কৃত্তিবাস জয়ন্ত কাকের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন । এটি বাল্মীকি করেছিলেন লংকাকাণ্ডে সীতার মুখে একটি গোপন অভিজ্ঞান রূপে হনুমানের কাছে রামের জন্য । অবশ্য কৃত্তিবাস-ও সেইখানে এই নিদর্শনের কথা বলেছেন ।

মাতুলগৃহে ভরত যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন তা সংক্ষেপে বলেছেন কৃত্তিবাস একটু তরল ভাবে –

স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-সীতা গিয়াছেন বন ।।

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সসৈন্য ভরতের আপ্যায়ন বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ –

চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ।।

পাদুকা সহ ভরতের প্রত্যাবর্তন কাহিনী-ও সরল, বাল্মীকির রচনার মতো বিচারবহুল - আবেগগম্ভীর নয় । নন্দীগ্রামে অবস্থান দিয়েই বাল্মীকি শেষ করেছেন । কিন্তু দশরথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও গয়া কৃত্যের কথা বলেছেন কৃত্তিবাস নিজস্ব ধারায় ।

রামের পিণ্ড দিতে বিলম্ব হওয়ায় দশরথ আবির্ভূত হয়ে সীতার কাছে পিণ্ড প্রার্থনা করেন । সীতা তুলসী, ব্রাহ্মণ, ফল্গু নদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষ্য রেখে বালুর পিণ্ড দান করেন এবং দশরথ তৃপ্ত হয়ে চলে যান । তারপর রাম এলে সীতা এই বিবরণ দেন । সীতা বিষয়টির সত্যতার সম্বন্ধে সাক্ষীদের ডাকেন । ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গু মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু সত্য বলে বটবৃক্ষ । সীতা তিনজনকে অভিশাপ ও বটবৃক্ষকে বর দেন – ব্রাহ্মণকে বলেন –

লক্ষ টংকার দ্রব্য-ও থাকে যদি ঘরে ।
ভিক্ষার লাগিয়া যাবে দেশ দেশান্তরে ॥

তুলসীকে বলেন –

অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে ।
শৃগাল কুকুরে তোরে অশুচি করিবে ॥

ফল্গুর প্রতি অভিশাপ –

অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্বকাল ।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুর শৃগাল ॥

বটবৃক্ষকে বর দেন রাম ও সীতা । রাম বলেন বটকে চিরজীবী অক্ষয় অমর হবে সীতা বলেন –

ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার ।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥

তারপর গয়া মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অযোধ্যা কাণ্ড শেষ ।

অরণ্য কাণ্ডের মুখ্য বিষয় সীতাহরণ ও সীতা অন্বেষণ । প্রথমে অত্রি আশ্রমে । দেবী অনসূয়া সীতাকে দিব্য বস্ত্রাভরণ দিলেন । তারপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ ও আনন্দ । বিরাধ বা শরভঙ্গ মুনির আশ্রম হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ ।

এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন ॥

তখন সুতীক্ষ্ণ মুনির নির্দেশে অগস্ত্যাশ্রমে গেলেন তারা । ইল্বল-বাতাপির কাহিনী শুনলেন । তারপর পঞ্চবটীতে কুটির বাঁধলেন । এখানে এল শূর্পনখা । খড়্গাঘাতে নয় –

শ্রেধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কাণ ।।

রাক্ষস নিধন, খর দূষণ বধ । শূর্পনখা ছুটে গেল রাবণের কাছে । বিবরণ জানিয়ে বলল –

সীতার রূপের সম নাই আর নারী ।
উর্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি ।।

সীতা হরণের বুদ্ধি দেয় শূর্পনখাই –

তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ।

তাকে হরণ কর ।

তারপর রাবণ মারীচ সংবাদ । যথা নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ । কেবল সীতার ভর্ৎসনায় লক্ষ্মণ একটি রক্ষাগণ্ডী কেটে রক্ষার শেষ চেষ্টার নতুন কথা –

গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর ।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ।।

তারপর সীতাহরণ । জটায়ুর বৃদ্ধি বিশদ বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস । ঋষ্যমূক পর্বতে বানরদের কাছে অলংকার নিক্ষেপের কথা আছে । নতুন কথা সম্পাতি নন্দনসুপার্শ্বের প্রসঙ্গ । সুপার্শ্বই রাবণকে বাধা দিল রাবণ নিবেদন করল যে রাম তার বোনের অপমান করেছে তাই রামের স্ত্রী হরণ করছে সে –

করিয়াছে রাঘব আমার অপমান ।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান ।।
তাই খর দূষণের রাম মহা অরি ।
সেই শ্রেধে হরিনাম রামের সুন্দরী ।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জয় ।
তব ঠাই পক্ষিরাজ মানি পরাজয় ।।

কৃত্তিবাসের সীতা সমুদ্র দেখে প্রথম মূর্ছিতা পরে সমুদ্র লংঘন করে কীভাবে রাম আসবেন ভেবে উদ্বিগ্না হলেন । রাবণ-ও উদ্বিগ্ন কোথায় লুকিয়ে রাখবেন সীতাকে । বাল্মীকির রাবণ আটজন রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিলেন দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি নজর রাখতে । কৃত্তিবাসের রাবণ চৌদ্দ জনকে নির্দেশ দিলেন । কিন্তু রামের ভয়ে তারা পালিয়ে গেল লংকা ছেড়ে ।

আর একটি নতুন কথা — ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন - সীতাকে দশমাস বাঁচিয়ে রাখার জন্য অমৃত পরমান্ন দিতে । ইন্দ্র গেলেন — নিজের পরিচয় দিলেন সীতাকে ।

মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল ।
প্রতিদিন আমি তোমাকে যোগাইব সুধাফল ।।

এদিকে দণ্ডকারণ্যে রামের বিলাপ । জটায়ুর কাছে সীতাহরণের সংবাদ, কবন্ধ বধ, শবরী উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা ।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের মুখ্য বিষয় সুগ্রীব - রামের মিত্রতা - বালিবধ ও সীতার অন্বেষণ । ঘটনার বিষয় ও পরম্পরা মূলানুসারী । কৃত্তিবাস রাম মাহাত্ম্য আলাদা বর্ণনা করেছেন । অতি পরিচিত মহিমা-স্তুতিটি এখানে আছে —

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই অংশটি শ্রীরামপুরী সংস্করণে ছিল না, বটতলা সংস্করণে যুক্ত হয়েছে । কাজেই হয়ত জয়গোপাল তর্কালংকারের সংশোধন । বালী-সুগ্রীবের বিরোধ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃত্তিবাসের সুগ্রীব — "রাজমহাদেবী" তারাকে-ও রাজ-সিংহাসনের সাথে গ্রহণ করেছিলেন সে কথা বলেছেন । বালীর পরাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন এবং রামের পক্ষে বালীবধ সম্ভব হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করেছেন । ফলে রামকে শক্তির পরীক্ষার জন্য দুন্দুভির পঞ্জর-পদাঘাতে —

ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন ।
ফেলেন যোজন শত কমল লোচন ।।

এবং সপ্ততাল ভেদ করতে হয়েছিল ।

সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার ।

* * * * *

এবং পুনর্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ।

দ্বিতীয়বার সুগ্রীবের ডাকে যুদ্ধে যেতে তারা বালিকে বারণ করেছিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রীর কথা বলেছিলেন । কিন্তু সত্যবাদী রাম বালিকে মারবেন একথা বিশ্বাস করেননি বালি । বাণাহত হয়ে রামকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেছিলেন বালি । রামের মুখ্য উত্তর ছিল —

ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন ।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন ॥

ভক্তাধীন ভগবানের ভূমিকা । তারপর বাল্মীকির কাহিনী অনুবর্তন কেবল বিশেষ রামের প্রতি তারার অভিশাপ —

আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে ।
কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডাইতে পারে ॥
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন ।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥

পম্পা দর্শনে বর্ষা ও শরতে রামের বিরহ বাল্মীকির বর্ণনায় যে অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়েছে তিনটি (২৮-৩০) সর্গে, বিভিন্ন গম্ভীর ছন্দের ১৮৫টি শ্লোকে কৃত্তিবাস রচিত কিঞ্চিদধিক ৫০টি পয়ারে তার প্রত্যাশা ও তুলনা করা বাতুলতা । তবু এই কথাগুলি গভীর আন্তরিকতায় ব্যাকুলতায় মধুময় ।

একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস ।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥
আমা বিনা জানকীর আনা নাহি মন ।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ।
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত ।
কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিত ॥

পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার ।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ।।

তারপর লক্ষ্মণের ভর্ৎসনায় সচকিত সুগ্রীবের দিকে দিকে সীতা অন্বেষণের জন্য বানর-সৈন্য প্রেরণের বৃত্তান্ত মোটামুটি মূলানুগ –

কৃত্তিবাস এখানে বর্ণনা স্থগিত করে
রামনাম বল ভাই মুখে বার বার ।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ।। ইত্যাদি

এবং এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
হেলায় তরিয়ে যাব মুখে বল হরি ।। ইত্যাদি ৫৩টি পয়ার দিয়েছেন । ভক্তিবিহ্বলতা তো বটেই কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বুঝা যায় যে এটি উদ্দেশ্যমূলক । এর পরই হনুমানাদির সীতা সন্ধানে গমন ও পরে রামনামে সমুদ্র লংঘন । কাজেই এই ভক্তি ও নাম মহিমার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ । যাহোক স্বয়ং প্রভার গহ্বরকে কৃত্তিবাস দক্ষিণ পাতাল বলেছেন – এবং স্বয়ং প্রভার নামের বদলে বলেছেন সম্ভবা । অন্যান্য কাহিনী মোটামুটি ঠিক ।

তারপর বানরগণের সমুদ্রতীরে আগমন এবং সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ – এবং সীতাকে রাবণ হরণ করে লংকায় নিয়ে গেছেন সংবাদপ্রাপ্তির বিবরণ । রাম নাম ও কথা শ্রবণে সম্পাতির দগ্ধ পক্ষের পুনরুদ্গম হল, সম্পাতি উড়ে গেলেন । বাল্মীকির অনুগত হয়ে কৃত্তিবাস-ও –

সম্পাতি বলিল আমি রাম কার্য করি ।
রামায়ণ প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি ।।
হইল উত্তম পক্ষ দেখিতে সুন্দর ।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর ।।

বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের শেষে সাগর লংঘনের পরামর্শ বৈঠকের উল্লেখ করেছেন কিন্তু কৃত্তিবাস তা করেছেন সুন্দরা কাণ্ডের সূচনে । তবে এখানে কৃত্তিবাস —

পঞ্চ-সৃষ্টী রামায়ণের উল্লেখ করেছেন –

আদ্য কাণ্ডে রাম জন্ম বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্য ভার ।।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয় ।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটক সঞ্চয় ।।
সুন্দরা কাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার ।
লংকাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ।।
কথা সাত কাণ্ডের উত্তরাকাণ্ডে পড়ে ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিঙরে ।।
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান ।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ।।

সুন্দর কাণ্ডের মূলকথা 'হনুমানের লংকা গমন এবং লংকা দহন ও সীতার বার্তা নিয়ে রামের কাছে প্রত্যাবর্তন ।' বাল্মীকি ৬৮টি সর্গে সুন্দরকাণ্ড রচনা করেছেন । কৃত্তিবাসের সুন্দরাকাণ্ডের বিষয় বাল্মীকি অপেক্ষা খানিকটা বিস্তৃত । তার মধ্যে বাল্মীকির কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের শেষের খানিকটা - বানরদের সমুদ্র লংঘনের উদ্যম এবং লংকা কাণ্ডের প্রথমের খানিকটা সমুদ্র সেতুবন্ধন, বিভীষণের রামের শিবিরে যোগদানাদি – বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে । কাণ্ডানুসারী বিষয় বিভাগে খানিকটা ভিন্ন হলেও বিষয়ের দিক থেকে ধারাবাহিকতা খণ্ডিত হয় নি ।

কে সাগর লংঘন করে লংকায় গিয়ে সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম এ নিয়ে বানরদের মধ্যে আলোচনা । জাম্বুমান হনুমানের জন্মকথা ও দক্ষতার কথা বলেন । বিবরণে একটু পার্থক্য আছে । মূল রামায়ণের মতে পুঞ্জিকস্থল্য নামে এক অপ্সরা অভিশপ্তা হয়ে কুঞ্জর বানরের কন্যা অঞ্জনা রূপে জন্মগ্রহণ করেন । তার বিবাহ হয় কেশরী বানরের সঙ্গে । বায়ুদেবতার সংযোগে তার এক পুত্র হয় – হনুমান । কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা –

কুঞ্জর তনয় নামে ছিল বিদ্যাধরী ।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ।।
সেই বানরীর এক হইল কুমারী ।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ।।
মলয় পর্বতে বায়ুদেব অধিষ্ঠান ।
কৃপা করি অঞ্জনারে দিল বরদান ।।
মহাবীর হবে এক উদরে তোমার ।।

আর একটি খবর দিয়েছেন কৃত্তিবাস - হনুমানের জবানী । একবার তার পিতা কেশরী হস্তীর আক্রমণ থেকে ভরদ্বাজ ঋষিকে রক্ষা করেন । মুনি বর দিতে চাইলে —

কেশরী বলেন যদি বর দিতে হয় ।
তবে যেন পাই এক উত্তম তনয় ।।
মুনিরাজ বলে তুমি চাহিলা যে বর ।
ত্রৈলোক্য বিজয়ী হবে তোমার কোঙর ।।
পাইয়া মুনি রাজে করি নমস্কার ।
মলয় পর্বতে গেল যথা পরিবার ।।
পবনের বরে মাতা করে জন্মদান ।
সেই সে কারণে আমি পবন নন্দন ।।

লংকাযাত্রার পূর্বে হনুমান পূর্বমুখ হয়ে বসে "গণেশাদি পঞ্চ দিকপালের পূজা করে, পিতার আশীর্বাদ নিয়ে রামের স্তব করলেন —

তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয় ।
তবে পিপীলিকা যের তুলিতে পারয় ।।
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন ।
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লংঘন ।।

লম্ফ দিলেন হনুমান । সুরসার কাহিনী, মৈনাক পর্বত সম্ভাষণ এবং সিংহিকা বধের বিবরণ আছে । লংকায় চামুণ্ডার সাক্ষাৎ হল । তারপর লংকা দর্শন ও সীতা অনুসন্ধান ।

শেষে অশোক বনে সীতা দর্শন । পাঁচটি পয়ারের শিকনি দিয়েছেন হনুমানের মুখে কৃত্তিবাস । ঠিক রূপের বর্ণনা নয় শক্তি ও ঐশ্বর্যের অনুভূতি –

ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত ।
ইহা লাগি শূর্পনখার নাক কান হত ॥
ইহা লাগি চতুর্দশ সহস্র রক্ষ মরে ।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে ॥ ইত্যাদি

তারপর হনুমান শুনলেন রাবণ-সীতার বাক্যালাপ । মূল রামায়ণে আছে সীতার কর্কশ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বধ করতে চাইলে ধান্যমালিনী নামে এক পত্নী জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যান রাবণকে । কিন্তু কৃত্তিবাস এখানে মন্দোদরীকে এনেছেন।রাবণের কামনার উত্তরে সীতা বলেন –

শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর ।
রাম সিংহ তোরে দেখি যেমন কুক্কুর ॥

রাবণ খাঁড়া তুললেন সীতাকে বধ করতে, মন্দোদরী খড়্গ কেড়ে নিলেন ।

রাবণ সীতারে দেখি উন্মত্ত যেমন ।
খান্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন ॥

মন্দোদরী স্মরণ করালেন –

নল কুবেরের শাপ পাশরিলে মনে ।
নারীরে ধরিলে বলে মরিবে পরাণে ॥

এই শাপের কথা বাল্মীকিতে আছে এবং এসম্বন্ধে বাল্মীকির রাবণ খুব সচেতন । মন্ত্রীদের উৎসাহ উত্তেজনাতে-ও সীতাকে ধর্ষণ করতে সাহস করেন নি । কৃত্তিবাস একটি নূতন মাত্রা দিয়েছেন ।

ত্রিজটার দুঃস্বপ্নের কাহিনী শুনে চেড়ীরা নিরস্ত হয়ে প্রস্থান করলে হনুমানের সঙ্গে সীতার সাক্ষাৎ হল । রামের অঙ্গুরী দান এবং সীতার শিরোমণি গ্রহণ করলেন হনুমান । জয়ন্ত কাকের চক্ষু বিদ্ধ করার অভিজ্ঞান কাহিনীও শোনালেন সীতা । তারপর আম্রবন ভঞ্জন, রক্ষী রাক্ষস ও অক্ষকুমার বধ, ইন্দ্রজিতের হাতে হনুমানের

বন্দী হওয়া, রাবণের কাছে পরিচয় প্রদান, রাবণের ভ্রাতৃবধূ, দূত অবধ্য এই যুক্তিতে লেজে আগুন দেওয়া ইত্যাদি কাহিনী মূলানুগ - তবে কিছু নতুন রং চাপান আছে। হনুমানের লেজে আগুন দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকির সীতার মতো কৃত্তিবাসের সীতা-ও অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেছেন —

কায় মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাই হনু পাবে অব্যাহতি॥

লংকা দাহ করে হনুমানের উদ্বেগ হল — সীতা-ও এ আগুনে পুড়ে গেলেন না তো? বাল্মীকির রামায়ণে আছে যে অধিবাসীদের বিলাপ ও কথা থেকে হনুমান জেনেছিলেন অশোকবন দগ্ধ হয় নি। আর কৃত্তিবাসে —

দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে॥

এই বৃত্তান্তে কৃত্তিবাস আর একটি কৌতুককর লোকপ্রবাদের হেতু যুক্ত করেছেন। বাল্মীকির হনুমান সাগরের জলে নেজের আগুন নিভিয়েছিলেন — কিন্তু কৃত্তিবাসের হনুমান তা পারলেন না। সীতা বললেন 'মুখামৃত' দিতে। হনুমান জলন্ত লেজ মুখের মধ্যে দিলে মুখ-ই পুড়ে গেল। হনুমান বিমর্ষ হলেন। এ পোড়া-মুখ জাতিবর্গের কাছে দেখাবেন কী করে হনুমান?

সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া॥

তারপর হনুমানের প্রত্যাবর্তন। বানরগণের আনন্দ, কিষ্কিন্ধ্যায় মধুবন ভঙ্গ, রামের কাছে সীতার বার্তা ও শিরোমণি প্রদান। এবং বানর বাহিনী নিয়ে রামের সমুদ্রতীরে গমন মূলানুগ বিবরণ। এইখানে-ই মূল রামায়ণের সুন্দর কান্ড শেষ। কিন্তু কৃত্তিবাস আরো খানিকটা বলেছেন। লংকায় বিভীষণ রাবণকে পরামর্শ দিলে - রাবণ তাকে পদাঘাত করেন। বিভীষণ চারজন অনুচর সহ রামের শরণাগত হলেন। রামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ব্যাপারে বিভীষণ কৌতুক, তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি দিব্বি বা শপথ করেছিলেন —

ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে যায় মন ।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ।।
হইব কলির রাজা সহস্র তনয় ।
এই তিন দিব্য প্রভু করিনু নিশ্চয় ।।

কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা আর সহস্র সন্তানের পিতা হবার দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা উল্লেখ । সমুদ্রে সেতুবন্ধন সমুদ্রে বৃত্তান্ত মূলানুগ । সুন্দরাকান্ড শেষ করেছেন কৃত্তিবাস দুটি মৌলিক বৃত্তান্ত দিয়ে । একটি রামচন্দ্রের শিবপূজো অপরটি ভস্মলোচন বধ । রামের আরাধনায় শিব এলেন কৈলাশ থেকে ।

মহেশ বলেন প্রভু পূজো কর কার ।
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ।।
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও ।
রাবণ বধিতে তুমি পুণ্য জন লও ।।
শিব বলেন আমার সেবক দশানন ।
সীতা চুরি কৈল তার হউক মরণ ।।

ভস্মলোচন কাহিনী এইরকম । রাম সসৈন্যে লংকায় প্রবেশ করেছেন । রাবণ ভস্মলোচনকে পাঠালেন । চোখে ঠুলি বাঁধা ভস্মলোচন যার দিকে তাকাবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে । বিভীষণ রামকে বললেন – সকলের মুখে দর্পণ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে । রাম ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে কোটি কোটি দর্পণ সৃষ্টি করলেন সকলের মুখে । ভস্মলোচন চোখের ঠুলি খুলে তাকান –

আপনার মুখ দেখি দর্পণ ভিতর ।
ভস্ম হয়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ।।

লংকাকান্ড – বাল্মীকির পরিভাষায় যুদ্ধকান্ড সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ১২৮টি সর্গে এটি রচনা করেছেন আদিকবি । যুদ্ধকান্ড তথা কৃত্তিবাসের লংকাকান্ড-ও আয়তনে অন্যান্য কান্ড থেকে আরো বড় ।

কৃত্তিবাসের লংকাকান্ড সুরু রাবণের চর শুক সারণের রাম শিবিরে প্রবেশ, বন্দী হওয়া, রাম কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন ও মুক্তি বৃত্তান্ত দিয়ে । রাবণ শুক সারণের

সাহায্যে রামসৈন্যদের দেখেন এবং রাম কর্তৃক শর সন্ধানে নিরীক্ষণ করেন। শুক সারণের রামের প্রশংসা করায় রাবণের ভর্ৎসনা এবং শার্দূল গুপ্তচরকে প্রেরণ। সেও ধরা পড়ে মুক্তি পেল এবং শুক সারণের মত হিত উপদেশ দিল। এসব-ই মূলানুগত। তারপর বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়ে রামের কাটা মুণ্ড ও ধনুক বানিয়ে নিয়ে গেল সীতাকে দেখাতে অশোক বনে। সীতা রোদন করতে থাকেন। এমন সময় –

রাম জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী॥
মুণ্ড লইয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী।

মূলে কাহিনীটি একটু অন্যভাবে বর্ণিত। সরমা এল। সান্ত্বনা দিল সীতাকে। রাবণের মন্ত্রণা শুনতে ইচ্ছা হল সীতার।

সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দিক দেখি॥

বাল্মীকির সরমা বলেছিল যে সে প্রচ্ছন্নভাবে আকাশ মার্গে সব খবর আনতে পারে। যাহোক সরমা খানিক পড়ে এসে খবর দিল যে রাবণের মাতা ও মাতামহ মাল্যবান রাবণকে সীতা ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে সন্ধি করবার উপদেশ দিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন। রাবণ সৈন্য সজ্জা করছেন। মহোদর দক্ষিণে, ইন্দ্রজিত পশ্চিমে, পূর্ব দ্বারে প্রহস্ত, উত্তর দ্বারে স্বয়ং রাবণ। মূল রামায়ণের অনুরূপ। অন্য দিকে রামের নির্দেশে সুগ্রীব সৈন্যসজ্জা করলেন – পূর্ব দ্বারে নীল, অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে, হনুমান পশ্চিম দ্বারে – সেখানে রামলক্ষ্মণও থাকবেন আর উত্তরে সুগ্রীব। মূল রামায়ণের সঙ্গে পার্থক্য সামান্য। সেখানে রাম নিজেই নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং উত্তর দ্বারে থাকেন।

এখানে কৃত্তিবাস একটি মৌলিক কৌতুক দৃশ্যের সংযোজন করেছেন। রাম রাবণের যুদ্ধ দেখতে দেবতারা আকাশে সমবেত। দেবী পার্বতী মহাদেবকে তিরস্কার করে বললেন যে রাবণ তাঁর ভক্ত অথচ রাবণকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করছেন না শিব। আর কি জগতে কেউ শিবকে ভক্তি করবে? শিব বললেন রাবণের রক্ষার নেই, বিধির নির্বন্ধ।

বামা জাতি তোমার তিলেক নাই শঙ্কা ।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥

বাল্মীকি প্রথম দিনের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন । রাবণকে দেখে তীব্র উত্তেজনায় সুগ্রীব তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন । দুজনে যুদ্ধ হল । রাবণের মাথার মুকুট কেড়ে নিলেন সুগ্রীব – তারপর লাফ দিয়ে চলে এলেন । রাম সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেন সুগ্রীবকে এই হঠকারিতার জন্য । উভয় পক্ষের প্রথম যুদ্ধ হল । পরে রামচন্দ্র যুদ্ধরীতি অনুসারে অঙ্গদকে দূত করে পাঠালেন রাবণের সভায় । আকাশ পথে গিয়ে অঙ্গদ রাবণকে চরম হুঁশিয়ারী দিলেন – সসম্মানভাবে সীতা প্রত্যর্পণ না করলে তার মৃত্যু হবে, বিভীষণকে করা হবে লঙ্কার রাজা । রাবণ দূতকে বন্দী করার আদেশ দিলে – সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে অঙ্গদ রাবণের প্রাসাদচূড়া ভেঙ্গে নিজের নাম ঘোষণা করে ফিরে এলেন । বাল্মীকি একটি সর্গে সংক্ষেপে এই বর্ণনা করেছেন । তিনি যুদ্ধ ও সুগ্রীব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি । কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা এইরূপ —

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ ॥

কাজেই অঙ্গদকে পাঠানো হল রাবণের কাছে । অঙ্গদ রায় বার কৌতুক রসের একটি বিশেষ নিদর্শন কৃত্তিবাসী রামায়ণে । কবিয়ালের সওয়ালের মতো অনেক সরস বাক্যালাপ আছে – বিচিত্র ঘটনাও আছে । সবটাই কৃত্তিবাসের নিজস্ব রস সৃষ্টির প্রয়াস ।

অঙ্গদকে দেখি রাবণ ছলে মায়া পাতে ।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে ॥
সবাই রাবণ ভেদ - নাই এক জনে ।
অঙ্গদ করেন কথা কোন রাবণ সনে ॥

কেবল ইন্দ্রজিত ছিলেন নিজের স্বরূপে কাজেই তাকে সম্বোধন করেই রায়বার সুরু হল –

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা ।
এই যত বসি আছে সবি কি তোর পিতা ॥

ইত্যাদি সরস উক্তি প্রত্যুক্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে । শেষে রাবণের মুকুট কেড়ে নিয়ে অঙ্গদের প্রত্যাবর্তন ।

তারপর ইন্দ্রজিতের প্রথম যুদ্ধ – রাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন – সীতাকে তা দেখানো, সীতার বিলাপ, ত্রিজটার সান্ত্বনা – গরুড় আগমনে নাগপাশ মুক্তি কাহিনী মূলানুগ। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত গরুড় যে রামচন্দ্র তার ইষ্টরূপ - শ্রীকৃষ্ণ রূপ – দেখিয়েছিলেন এটি কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

রাম প্রথমটা রাজী হলেন না এ অবতার ধনুর্বাণধারী, বংশীধারী হওয়া সম্ভব নয় – 'সে রূপ দেখিলে কি বলিবে কপি গণে।' গরুড় বলল – কেউ দেখবে না পাখার আড়াল করে রাখবে সে।

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতা নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিল রূপ ধরে॥

হনুমান লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। শোধ তুলবার সংকল্প নিলেন রামভক্ত মহাবীর।

বাঁশী ঘসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥

যা হোক তারপর যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু হল ধূম্রাক্ষ, অকম্পনের বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্তেরও মৃত্যু হল। তারপর রাবণ এলেন যুদ্ধে। প্রথম দিনের যুদ্ধ। লক্ষ্মণকে ব্রহ্মা দত্ত শেল নিক্ষেপ করে মূর্চ্ছিত করেন রাবণ ও তাঁর অচেতন দেহ তুলে নিতে চেষ্টা করেন। তখন হনুমান —

রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড়॥

লক্ষণীয় যে অস্ত্রযুদ্ধ থেকে কৃত্তিবাসে বাক্‌যুদ্ধ অধিকতর শাণিত ও কৌতুকাবহ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধ ও মৃত্যু কাহিনী মূলানুগ ভাবেই কৃত্তিবাসে বর্ণিত – তবে রাবণ-কুম্ভকর্ণের সলাপ-টি কৃত্তিবাসের হাতে নতুন রূপ পেয়েছে। এই অদ্ভুতকর্মা রামের আসল পরিচয় কী – তা নিয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণের আলাপটি মজার নমুনা —

কুম্ভকর্ণ বলে হেন নয় মম মন ।
মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ ।।
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ।। –

এই ধরণের শিকলি পয়ার আছে দশ-বারটি ।

কুম্ভকর্ণের পতনের পর ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, মহীপাল, মহোদরের যুদ্ধ ও মৃত্যু মূলানুগ বর্ণনা । কৃত্তিবাস যুদ্ধ গমনোদ্যত চার রাবণ-নন্দনের জননীদের স্নেহপ্রবণ - বাঙালী মায়ের আদর্শে যে চিত্র এঁকেছেন – তা উল্লেখযোগ্য । পুত্রদের প্রাণ রক্ষার পরামর্শ দিলেন রাবণের চার পত্নী ।

চারি ভাই চতুর্দোলে লহ স্কন্ধে করি ।
শ্রীরামের দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী ।।
হেন কর্ম করিবে যদ্যপি রাজা রোষে ।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্বত কৈলাসে ।।
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর ।
সেবি তাঁকে পুত্র সব থাক তার ঘর ।।

শোকার্ত রাবণকে আশ্বস্ত করে দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করলেন ইন্দ্রজিত । কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল মায়ের কথা –

মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধ যাত্রা করি ।
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ।।

আর একটি বাঙালী মা ও বাঙালী অ-ত:পুরিকাদের নিখুঁত ছবি অংকন করেছেন কৃত্তিবাস । পুত্রের কল্যাণে হরপার্বতীর পূজা করছেন মন্দোদরী ।

কিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী ।
দশহাজার সতিনী সহ মন্দোদরী ।।
ন হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী ।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী ।।

মন্দোদরী লক্ষ লক্ষ চুম্বন দিলেন পুত্রকে জড়িয়ে ধরে। তিনিও বললেন —

সীতাকে রামেরে দেহ করহ পিরীতি।
মজিল কনক লঙ্কা নাহি অব্যাহতি॥

আরও বললেন —

তোমাকে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর বানরের যুদ্ধে না যাইব দিতে॥

ইন্দ্রজিত অবশ্য পিতাকে সমর্থন করলেন।

তখন দুই লক্ষ রাক্ষী - যাদের স্বামী যুদ্ধে মরেছে নালিশ জানালো — গাল দিল শূর্পনখাকে। নিত্য দ্বিপ্রহরে হবিষ্য, নিত্য হাঁড়ি ফেলার বেদনা জানাল।

যাহোক যথাবিধি যজ্ঞ করে যুদ্ধে গেলেন ইন্দ্রজিত। রাম লক্ষ্মণ মূর্ছিত হলেন। হনুমান ঋষ্যমূক পর্বত থেকে ওষুধ এনে তাঁদের চেতনা সম্পাদন করালো। তখন নবশক্তিতে বলীয়ান বানরসৈন্য লঙ্কা আক্রমণ করল ও দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন হল। এবার যুদ্ধে গেল 'কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।' তারা দুজন ও পরে মকরাক্ষ যুদ্ধে হত হল। এদের কথা মূল রামায়ণে আছে। কিন্তু কৃত্তিবাস তরণী সেনের উল্লেখ করেছেন — সেটা মৌলিক। তরণী সেন বিভীষণ-সরমার পুত্র। এই পালায় কৃত্তিবাস ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তরণী মায়ের কাছে যুদ্ধে যাবার বাসনা প্রকাশ করলে — সরমা বলেন রাম বিষ্ণু অবতার। পুত্র যুক্তি দেয় "মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস।" তাছাড়া —

কে পারে বধিতে কারে কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥

যুদ্ধে চলল তরণী। তার রথধ্বজে রাম নাম লেখা। 'অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে।' সকলকে পরাজিত করে তরণী রামচন্দ্রের মুখোমুখি হল। রামের সর্বাঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করে তরণী — 'অষ্টাঙ্গ লুটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।' স্তব করতে লাগল। ভক্তের অধীন ভগবান রাম — ধনুঃশর ত্যাগ করলেন। ভক্তের অঙ্গে বাণ মারা অসম্ভব।

কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে ।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ।।

তরণী বুঝল যে ভক্তকে আঘাত করবেন না রাম – রামহস্তে মৃত্যুবরণ করে বৈকুণ্ঠ-লাভ হবে না – তখন স্তব বন্ধ করে ধনুঃশর হাতে তুলে গালাগাল দিতে লাগল । রামও ধনুক তুললেন এবং বিভীষণের বুদ্ধিমতো ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তরণীকে বধ করলেন –

দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
তরণীর কাটা মুণ্ডে রাম রাম বলে ।।

বিভীষণের কান্না দেখে রাম তরণীর পরিচয় পেয়ে ব্যথিত হলেন ।

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ।।
ব্রহ্মা অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলা কানে ।
আপনি করিলা বধ আপন সন্তানে ।।

বিভীষণের উত্তর – রামের হাতে প্রাণ দিয়ে পুত্র ধন্য হল বৈকুণ্ঠ লাভ করল । বন্ধুভাবে সেবা থেকে শত্রুভাবে সেবায় – রামের বাণে নিহত হলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ লাভ হোতো অতিকায় কুম্ভকর্ণের মতো ।

শত্রুভাব করি সবে পাইল উদ্ধার ।
শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার ।।

তাছাড়া ব্রহ্মার বরে বিভীষণ অমর – তার বৈকুণ্ঠ লাভ আর হবে না । রামচন্দ্র বললেন –

যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন ।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ।।
যতদিন রবে তুমি অবনী ভিতরে ।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ।।

যাহোক তারপর বীরবাহু, ভস্মাক্ষ, ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন । কৃত্তিবাস বাল্মীকি কথিত কম্পন, প্রজঙ্ঘ শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ নামগুলি করেন নি । পক্ষান্তরে ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষর নাম করেছেন ।

তৃতীয় বার যুদ্ধে যাত্রা করলেন - ইন্দ্রজিত — প্রথমে-ই মায়াসীতা বধ করলেন। সীতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বিহ্বল হলেন রাম। নিরস্ত হল রামসৈন্য। বিভীষণ এসে বুঝালেন যে আসল সীতা নয় — মায়া সীতা। প্রধান যুক্তি রাবণ কদাচ সীতাকে বধ করতে দেবেন না। কৃত্তিবাসের বিভীষণ-ও তাই বলেছেন —

সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিত হেন সীতা পাইবে কেমনে ॥

একটু বেশি বলেছেন — হনুমান গিয়ে দেখে আসুক সীতাকে।

অশোকের বনে হনু হল উপনীত ॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।

বাল্মীকির বিভীষণ-ও বলেছিলেন — এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করছে — তা সম্পূর্ণ করলে অজেয় হবে। কাজেই এক্ষুনি যজ্ঞাগারে আক্রমণ করতে হবে। এ কথা কৃত্তিবাসের বিভীষণ-ও বলেছেন রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে।

মায়া সীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥

ইন্দ্রজিত বধ কাহিনী - মোটামুটি মূলানুগ। তবে বর্ণনার রং ও মেজাজ বাঙ্গালী। যেমন

যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফল ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥

আবার শ্লোকের অনুবাদ-ও আছে --

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃশ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ (লঙ্কা ৮৭। ১৫)

নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥

ইন্দ্রজিতকে বধ করতে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগের সময় এই শপথ মাত্র উচ্চারণ করেছিলেন লক্ষ্মণ —

লক্ষ্মণ –

ধর্মাত্মা সত্য রামো দাশরথি যদি ।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহিরাবনিম্ ॥ (লঙ্কা ৯০। ৬৯)

কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের উক্তি –

বানেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিল সৃজন ॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু অবতার ।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥

শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত হলে অমাত্য সুপার্শ্ব স্ত্রীহত্যা করতে নিষেধ করে এবং রামকে বধ করে মৈথিলী লাভের উৎসাহ দেয় । তাতে বাল্মীকির রাবণ নিরস্ত হন । কিন্তু কৃত্তিবাসের রাবণকে বাধা দেন মন্দোদরী ।

উচ্চৈ:স্বরে সীতাদেবী করেন রোদন ।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী ।
ছি ছি মহারাজ বধ করো নাহে নারী ॥

তারপর রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা ও লক্ষ্মণ শক্তিশেল এবং হনুমানের গন্ধমাদন থেকে ঔষধ আনয়ন এবং লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ কাহিনীর বিবরণ ।

গন্ধমাদন পর্বত আনবার *পথে* বিস্তর বাধা ও অন্যান্য কৌতুককর বিষয়ের অবতারণা করেছেন কৃত্তিবাস । রাবণের কূট বুদ্ধিতে কালনেমি – গন্ধ-মাদনের পাশে সরোবর তীরে সাধু সেজে ছিল । সরোবরে ছিল গন্ধকালী কুমীর হয়ে । হনুমান সাধু দেখে তার উপদেশে স্নান করতে নামে ও কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হয় । কুম্ভীর বধ করে গন্ধকালীকে শাপমুক্ত করেন । গন্ধকালী কালনেমির আসল পরিচয় জানিয়ে দিলে – কালনেমিকে বধ করেন হনুমান । দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র করলেন রাবণ । রাত্রির মধ্যে বিশল্যকরণী আনতে না পারলে লক্ষ্মণের মৃত্যু নিশ্চিত । রাবণ সূর্যদেবকে আদেশ দিলেন উদয় হতে । সূর্যরথ আটকে দিলেন হনুমান । হনু-ভানুতে কথা হল - মিতালি ।

সূর্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি ।
সাপটিয়া সূর্যেরে সে পুরে কক্ষ তলি ॥

মহাতেজময় সূর্য রাখিতে কে পারে ।
আপনি হইল বন্দী লক্ষ্মণের তরে ।।

তৃতীয় বাধা গন্ধমাদনে গন্ধর্বরা রাত্রে নৃত্যগীত করে । হনুমান রামের কাহিনী বলে প্রার্থনা করলেন নৃত্যগীত বন্ধ করতে । কাজেই যুদ্ধ । গন্ধর্বদের নিধন করে চৌষট্টি যোজন পর্বত গোটাটা মাথায় নিয়ে চললেন হনুমান । দক্ষিণে চলতে ভরতের কথা মনে পড়ল । রামচন্দ্র ভরতের প্রশংসা করেন । তাঁকে দেখা দরকার । "রামের ভাই ভরতের বুঝে যায় বল ।"

হনুমান পর্বত নিয়ে একা নন্দীগ্রামের আকাশে । রামের পাদুকা লক্ষ্মন কারীকে শাস্তি দিতে বাটুল নিক্ষেপ করলেন ভরত — হনুমান মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । তাঁর মুখে রাম নাম শুনে ছুটে এল দুভাই । ব্রহ্মমন্ত্রে বশিষ্ঠ হনুমানের জ্ঞান ফেরালেন । হনুমান তখন সীতাহরণ-যুদ্ধ-লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা বললেন । কাঁদতে লাগলেন দু ভাই । ভরত যেতে চাইলেন লঙ্কায় । কিন্তু রামচন্দ্রের নির্দেশ নেই অথচ রাত্রের মধ্যেই যেতে হবে । ভরত বাণ দিয়ে সপর্বত হনুমানকে শূন্যে তুলে দিলেন । হনুমান লঙ্কায় এলে ওষুধ গুণে লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তি ঘটল । তারপর আবার পর্বতটিকে যথাস্থানে রেখে আসতে আকাশে উঠলেন হনুমান । রাবণ দেখলেন । সাতটা রাক্ষসকে পাঠালেন হনুমানকে মারতে । তারা আক্রমণ করল ।

হাত নাহি নাড়ে বীর পর্বত না ফেলে ।
পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে ।।

একজন কোনরকমে বেঁচে রাবণকে খবর দিল । হনুমান যথাস্থানে পর্বত রেখে — যে ওষুধে লক্ষ্মণ বেঁচেছেন সেই ওষুধ দিয়ে গন্ধর্বদের বাঁচিয়ে দিলেন । তারপর হনুমানের বগলে সূর্যকে দেখে রাম বিবরণ জানতে চাইলেন । হনুমান সব বিবরণ দিলে সূর্যকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হল । রাম সস্নেহে হনুমানকে আলিঙ্গন দিলেন — আর

এবারে আর একটি নতুন কাহিনী বললেন - কৃত্তিবাস মহীরাবণের। জননী নিকষা মহীরাবণের কথা মনে করালেন। পাতালে থাকেন পুত্র। স্মরণ করলেন রাবণ মহীরাবণকে। মহীরাবণ রামলক্ষ্মণকে হরণ করবেন ঠিক হল। বিভীষণ পরামর্শ শুনে রামলক্ষ্মণকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সবার চেষ্টা ব্যর্থ করে মহীরাবণ দুই ভাইকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গেলেন। শেষে হনুমান গিয়ে কৌশলে মহীরাবণ ও তার ছেলে অহিরাবণকে বধ করে লংকাতে নিয়ে এলেন রাম লক্ষ্মণকে । বিস্তৃত কৌতুকপ্রদ কাহিনী।

রাবণ তৃতীয়বার যুদ্ধে গেলেন। কৃত্তিবাসে বর্ণনা মূলানুগ। ইন্দ্রের রথে চেপে যুদ্ধ করলেন রাম। ভয়াবহ যুদ্ধের নিপুণ বর্ণনা দিতে গিয়ে নতুন কথা বললেন কৃত্তিবাস। রামের বাণাহত রাবণ – যোড় হাতে রামের স্তব করতে থাকলেন – "তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি –

জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
অপরাধ করিয়াছি সংখ্যা নাহি তার ॥
অপরাধ মার্জনা হে কর দয়াময়।

ভক্তবৎসল রাম - কি করবেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন – ভক্তকে মারা অসম্ভব। সীতা উদ্ধার হল না।

দেবগণ বিপন্ন হয়ে গেলেন সরস্বতীর কাছে। সরস্বতী রাবণের কণ্ঠে বসলেন। সুর পালটে গেল রাবণের। রামকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হল।

কিন্তু রাবণকে যে মারা যায় না।

শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিয়া মাত্রই ওঠে তিল নাহি বাধা ॥

তারপর ভয়ংকর যুদ্ধে - রাবণ চণ্ডিকাস্তব করলেন। অভয় দিলেন দেবী। দেবীকে রাবণের রথে দেখে হতাশ হলেন রাম। শেষে ব্রহ্মা অকালবোধন করে দেবীর পূজার নির্দেশ দিলেন রামকে। শারদীয়া নবমীতে অষ্টোত্তর শত নীলোৎপলে দেবীর অর্চনা করতে হবে। রাম দেবীর স্তব করলেন। দেবীদহ থেকে নীলপদ্ম আনা হল। কিন্তু দেবী একটি হরণ করলেন। তখন কমল লোচন রাম

নিজের একটি চক্ষু দিয়ে পদ্মসংখ্যা পূরণ করতে গেলে দেবী প্রসন্ন হয়ে বর দিলেন রামকে ।

কিন্তু রাবণের পূজাতে যাতে চন্ডীপাঠ শুদ্ধ না হয় তার চেষ্টাও দেখতে হবে । বৃহস্পতি চন্ডীপাঠ করছেন রাবণের পূজাতে । হনুমান মক্ষিকা হয়ে চেটে নিলেন কয়েকটা অক্ষর । অভ্যাস মতে পড়ে গেলেন বৃহস্পতি । তখন নিজরূপ ধরে পুথি কেড়ে নিলেন হনুমান ।

প্রথম মাহাত্ম্য স্তোত্র, মুছে ফেলে তিন শ্লোক
চন্ডী হইল অশুদ্ধ তখন ।

তারপর আরও কঠিন সমস্যা বিভীষণ জানালেন যে ব্রহ্মা রাবণকে একটি মৃত্যুবাণ দিয়েছিলেন তপস্যার কালে । সে বাণটি রাবণ রেখেছেন মন্দোদরীর জিম্মায় । সেটি না হলে রাবণবধ অসম্ভব । কে আনবে সে বাণ ? হনুমান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে মন্দোদরীকে প্রতারণা করে নিয়ে এলেন মৃত্যুবাণ । এবার রাবণ বধ হল । এই কাহিনী কৃত্তিবাসের । বাল্মীকিতে আছে অগস্ত্য আদিত্য হৃদয় স্তব শিখিয়ে দেন রামকে । রাম সেই স্তব করে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাবণ বধ করেন ।

মৃত্যুর পূর্বে রাবণ রামচন্দ্রকে যে রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন – সেটিও কৃত্তিবাসী কাব্য । দুইটি উপদেশ –

করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে ।
অনস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ।

রাবণ নরককুন্ড বন্ধ করা, স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করা আর লবণ সাগরকে ক্ষীরোদ সমুদ্রে পরিণত করা – এই তিনটি শুভকাজ করে উঠতে পারেন নি । আবার পাপ-কর্ম সীতাহরণ বিচার না করে বালবিলম্ব না করে করেছেন । আসলে এই কথা প্রাচীন নীতিরই উপস্থাপন –

'শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণম্ ।'

রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের এবং মন্দোদরী প্রমুখ রাণীদের শোক । রাবণের অন্তিম সংস্কার, বিভীষণের অভিষেকাদি ও সীতার অগ্নিপরীক্ষাদি বৃত্তান্ত মূলানুগ ।

কেবল কিছু নূতনত্ব দিয়েছেন কৃত্তিবাস – দু' একটি স্থানে। যেমন – রামকে প্রণাম করলেন মন্দোদরী।

সীতা বলি রামচন্দ্র ডাকিয়া তাহারে।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্বাদ করে॥

কিন্তু রাবণ তো মৃত - কীভাবে আয়ুষ্মতী থাকবেন মন্দোদরী ? মীমাংসা –

রাবণের চিতা বহিবে সর্বথা
চিরকাল রবে আয়াতে।

চিতা না নিভানো পর্যন্ত পত্নীর বৈধব্য হয় না। এই প্রসঙ্গে রাবণের চিতা এই বাগ্ বিধিটিও স্মরণীয়।

পরবর্তী কাহিনী সীতার অগ্নিপরীক্ষা মোটামুটি মূলানুগ বর্ণনা কেবল একটি স্থলে ছাড়া। কৃত্তিবাসের মন্দোদরী পতি দর্শনে যাবার পথে সীতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন —

মন্দোদরী বলে শুন জনক নন্দিনী
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।
পুত্রসহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে।
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ হবেনা লঙ্ঘন॥

সীতার অগ্নি প্রবেশের পর বাল্মীকির রাম বাহ্যিক কোন আর্তি প্রকাশ করেন নি - কৃত্তিবাসের রাম শেষে "ভূমি পড়াপড়ি যান হইয়া বিকল।"

মহাদেবাদি দেবগণের আবির্ভাব এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা। শেষে ইন্দ্রপুর থেকে দশরথের আগমনাদি বিবরণ। রামের প্রার্থনায় মৃত বানর ভল্লুকদের বাঁচিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্ত মূলানুগ কিন্তু এখানেও একটি কৃত্তিবাস-কূট আছে। ইন্দ্র সুধাবৃষ্টি করেছিলেন সকল মৃত বানর-রাক্ষসদের উপর।

বানরেরা বেঁচে উঠল – রাক্ষসরা প্রাণ পেল না কেন ? কৃত্তিবাস বলেছেন মৃত্যুকালে ভগবানের নামকীর্তনে স্মরণে স্বর্গবাস হয় । বানররা 'রাবণকে মার' এই শব্দ বলে মরেছে । তাই মুক্তি পায়নি কিন্তু –

রাম মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস ।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ।।

নাম মহিমা কীর্তনের কোন সুযোগ কৃত্তিবাস ব্যর্থ হতে দেন নি ।

তারপর রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও অভিষেকাদি বর্ণনা । বাল্মীকির কাঠামোটা ঠিক থাকলেও ব্যতিক্রম ও কৃত্তিবাসের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় । পুষ্পক রথে চেপে যাত্রা করেছিলেন সবাই – সীতাকে রামচন্দ্র বিভিন্ন স্থানগুলি দেখালেন । কৃত্তিবাস রামের লঙ্কাত্যাগের পূর্বে বিভীষণ কর্তৃক বানরগণের আপ্যায়ণ ও মহাভোজের এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন । রামের শিবপুজা, লক্ষ্মণ কর্তৃক লঙ্কাসেতু ভঙ্গ কৃত্তিবাসের কথা । প্রত্যাগমন পথে বাল্মীকি বলেছেন সীতার ইচ্ছায় কিষ্কিন্ধ্যা থেকে সুগ্রীবের পত্নীদিগকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং ভরদ্বাজাশ্রমে এসে ভরতের মন অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব করে রাজপদের প্রতি আসক্তি এসেছে কিনা গোপনে তা জানবার জন্য ছদ্মবেশে হনুমানকে পাঠাবার কথা আছে । কৃত্তিবাস তা বলেন নি । ভরদ্বাজাশ্রমের ভোজের কথা আছে হনুমানের দৌত্যের কথাও আছে - তবে সেটা রামায়ণ বর্ণনা । কৃত্তিবাস কৈকেয়ী প্রসঙ্গে বলেছেন । অনুতপ্তা কৈকেয়ী মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে যদি রাম আগের মতো মা বলে না ডাকে তবে তিনি দেহত্যাগ করবেন বিষপানে । রাম তাই প্রথম এসেই কৈকেয়ীর কাছে যান । কৈকেয়ীর অভিযোগ –

বনে গেলে দেবতার অর্থসিদ্ধি লাগি ।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ।।

কৃত্তিবাস বানরগণের সীতারাম কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ ও ভোজন হনুমানের রামনাম প্রদর্শনের বর্ণনা করেছেন ।

সীতা নিজের হারটি হনুমানের গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেন –

সীতা বলে যত কাল থাকিবে পৃথিবী ।
রোগ পীড়াহীন বাপু হও চিরজীবী ।।
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্যের প্রভার ।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ।।
তাবৎ হও হে তুমি অক্ষয় অমর ।

হারটি কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেন হনুমান । লক্ষ্মণ পরিহাস করলেন বানরের গলায় রত্নহার । হনুমান বললেন যাতে রামনাম নাই তা বর্জনীয় । লক্ষ্মণ বললেন তাহলে তো হনুমানের দেহত্যাগ করতে হয় – দেহে কি রামনাম আছে ?

এতেক শুনিয়া তবে পবন কুমার ।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার ।।
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ ।।

উত্তর কান্ড : – বাল্মীকির উত্তর কান্ডের সর্গ সংখ্যা ১১১ । বিভিন্ন কান্ডের সর্গসংখ্যার বিচারে উত্তরকান্ডের স্থান তৃতীয় । আয়তনের দিক থেকে কৃত্তিবাস উত্তরাকান্ডের সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন – লঙ্কাকান্ডের পরই উত্তরাকান্ডের স্থান । উত্তর কান্ডের বিষয়বস্তুর দুটি ভাগ – একটি পূর্বকথা - রাক্ষসাদির জন্ম - কর্ম - ধর্ম , অপরটি রামকথার উপসংহার, সীতার বনবাস - পাতাল প্রবেশ ও রাঘব ভ্রাতৃচতুষ্টগণের পার্থিব লীলাবসান ।

রাম রাজার সভাতে অগস্ত্যাদি মুনিরা সমবেত হলেন এবং রাবণাদি বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য বিশেষ প্রশংসা করলেন । রাক্ষসাদির উদ্ভব রাবণাদির জন্ম তপস্যা বরলাভ দিগ্বিজয়, কুবের বিজয়, বেদবতী উপাখ্যানের প্রসঙ্গ অনরণ্য, যম, নিপাত কবচ, বরুণ, বলি, সূর্যলোক, কৈলাস, ইন্দ্র, কার্তবীর্যার্জুন, বালি ও মান্ধাতার ও বলির কাছে রাবণের পরাজয় হয়েছিল । অকামা নারীকে রাবণ ধর্ষণ করলেই মৃত্যু হবে রাবণের এই অভিশাপের কথা, হনুমান, বালী সুগ্রীবের বৃত্তান্ত – এই অংশ পূর্বকথা । দ্বিতীয়াংশ সীতার গর্ভলক্ষণ বনবাস বাল্মীকির আশ্রমে কুশ - লবের জন্ম ও শিক্ষালাভ । শত্রুঘ্নের লবণাসুর বধ । শম্বুকের

শিরশ্ছেদ, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, কুশলবের রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন, রামের মহাপ্রস্থান। অবশ্য এই অংশে-ও পূর্বকথা না হলে-ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক রূপকথা – গৃধ্র ও উলূকের কাহিনী, সৌদাস কাহিনী, অগস্ত্যের কথা, সূদেবপুত্র শ্বেতের উপাখ্যান - দণ্ডকারণ্য কথা ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ড-ও মূলগ্রন্থের আদর্শে ও ক্রমে রচিত। প্রথমাংশে পূর্বকথায় রাক্ষসগণের জন্ম ও রাবণের জয় পরাজয় - বর ও শাপ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত ও হনুমানের কথা এবং দ্বিতীয়াংশে রামকথার উপসংহার, সীতার বনবাস, লবকুশের জন্ম – রাম রাজত্ব শম্বুক বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, স্বর্ণসীতা নির্মাণ, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন ও তিন ভ্রাতার মহাপ্রস্থান। অবশ্য এই অংশে-ও কৃত্তিবাসের নিজস্বতা – কি কাহিনী উদ্ভাবনে কি বর্ণনায় ও বিন্যাসে উপভোগ্য।

অগস্ত্যাদি মহর্ষিরা রামের সভায় এসেছেন। ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ বধ করেছেন কাজেই "কাজেই লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবন"। কারণ ইন্দ্রজিত বধ এক অসাধ্য সাধন।

চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দ বর্ষ স্ত্রী মুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দ বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেইজন পারে ॥

রাম বিস্মিত হলেন লক্ষ্মণ কি এইসব ব্রত করেছেন ? এবার লক্ষ্মণ জবাব দিলেন – সীতা-রামের সঙ্গে একত্র বাস করে-ও লক্ষ্মণ কখনো সীতার মুখের দিকে তাকান নি – পায়ের দিকে চোখ রেখেছেন। প্রমাণ ? ঋষ্যমূক পর্বতে সীতার পরিত্যক্ত আভরণ-গুলি দেখিয়ে –

সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি চিনহ লক্ষ্মণ ॥
আমি না চিনিনু তাঁর হার কি কেয়ূর।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর ॥

নিদ্রা ? — রাম সীতা কুটিরে থাকতেন । সারা রাত ধনুর্বাণ হাতে কুটির দ্বারে জেগে থাকতেন লক্ষ্মণ —

আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে ।
ভেদিব করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥
কহি শুন নিদ্রা দেবি আমার উত্তর ।
এসো না মোর কাছে এ চৌদ্দ বৎসর ॥

আর আহার ? রাম তো নিজের হাতে লক্ষ্মণকে ফল দিয়েছেন প্রতিদিন —

পড়ে কিনা পড়ে মনে রাজীব লোচন ।
আমাকে কহিতে ফল ধররে লক্ষ্মণ ॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটিরেতে আনি ।
খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমণি ॥

তূনীরের মধ্যে ফল আছে । এখানে আরও কৌতুক সৃষ্টি করেছেন কৃত্তিবাস । হনুমানকে পাঠানো হল । সামান্য হালকা তূণ । এ এ কাজে হনুমানকে পাঠানো হল ? অহংকার হল হনুমানের । কাজেই তূণীর এত ভার হল যে হনুমান তুলতে পারল না । শেষে লক্ষ্মণ বাঁ হাতে তুলে আনলেন তূণীর । গণনা করা হল — ৭টি ফল কম । লক্ষ্মণ হিসাব দিলেন — বাবার মৃত্যুসংবাদের দিন, সীতাহরণের দিন, নাগপাশে বন্ধনের দিন, মায়াসীতা বধের দিন, মহীরাবণের পাতালে একদিন, শক্তিশেলের দিন — আর রাবণ বধের আনন্দের দিন - সাতদিন ফল আনা হয়নি ।

কাহিনী বর্ণনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির ক্রমভঙ্গ করেছেন । আদি কবি আগে কুবেরের ওপরে রাক্ষসকে জন্মকথা বলেছেন—কৃত্তিবাস বলেছেন আগে রাক্ষসদের । গজকচ্ছপের কাহিনীটি কৃত্তিবাসের সংযোজন । আদি রামায়ণে নাই । তবে মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে আছে । মালী প্রভৃতির কাহিনী মোটামুটি এক । কোথাও নামের পার্থক্য আছে । কুবেরের মাতার নাম বাল্মীকি বলেছেন দেববর্ণিনী কৃত্তিবাসের মতে লতা । ঘাল্যবান রূপবতী কন্যা নিকষাকে (বাল্মীকি কৈকেসী বলেছেন) বিশ্রবা মুনির কাছে পাঠালেন পুত্রবরের জন্য । তার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও

শূর্পনখার জন্ম হল । তারপর তিন ভ্রাতার কঠোর তপস্যার বর্ণনা । রাবণ বর পেলেন নর বানর ছাড়া সকলের অবধ্য, বিভীষণ হলেন অক্ষয় অমর । কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে সরস্বতী ভর করে বলালেন –

'কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর ।'

তারপর রাবণ কুবেরকে লংকা থেকে বিতাড়িত করে পুষ্পক বিমান দখল করলেন । রাবণাদির বিবাহ । মেঘনাদের জন্ম, কৈলাসে নন্দীর বানরমুখ দেখে উপহাস । নন্দীর অভিশাপ --

দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস ।
এ বানর করিবে তোর সর্বনাশ ।।

তারপর বেদবতীর কাহিনী ও অভিশাপ । বেদবতীকে কেশে ধরে অপমান করার ফলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিল বেদবতী –

নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে ।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ।।

বেদবতী সীতা হয়ে জন্মালেন । তারপর মরুত্ত রাজার যজ্ঞস্থলে এসে হামলা করলেন । মরুত্ত যুদ্ধ করলেন না । কাজেই জয়ী ঘোষণা করলেন রাবণ । দেবতারা রাবণের ভয়ে আত্মগোপন করলেন –

ইন্দ্র হল ময়ূর, কুবের কাকলাস ।
যম কাক রূপ হয় বরুণ সে হাঁস ।।

বাল্মীকি সম্মত অনুবাদ । অনরণ্য রাবণকে শাপ দিলেন যে তাঁর বংশধরের হাতে রাবণের মৃত্যু । রামচন্দ্র এই বংশের সন্তান । তারপর কার্তবীর্যার্জুন ও বালির কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হলেন রাবণ । যাহোক ইন্দ্রজিতের সাহায্যে স্বর্গ বিজয় দিয়ে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনা শেষ করেছেন কৃত্তিবাস । ইন্দ্রের কোন পাপে পরাজয় ? ব্রহ্মা বললেন – 'অহল্যা ধর্ষণ ।' কী সে মুক্তি হবে পাপ থেকে ?

বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কানে ।
রামনাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রি দিনে ।।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার ।
রামনামে হয় সর্ব পাপের সংহার ।।

তারপর অগস্ত্য হনুমানের জন্মকথা বলেন । এই সঙ্গে পুরা কথার শেষ । বাল্মীকি অবশ্য বালি সুগ্রীবের জন্মকথা-ও বলেছেন ।

এবারে রামকথার প্রারম্ভে কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন বিশ্বকর্মা নির্মিত অযোধ্যায় অশোক কানন যুক্ত বিলাস ভবনে রামসীতার বিহার । সীতার গর্ভধারণ । গঙ্গাতীরে ঋষিদের সঙ্গে এক রাত্রে বাসের সাধ করেছিলেন সীতা । রাম-ও কথা দিয়েছিলেন — কাল তাঁকে পাঠাবেন । কৃত্তিবাসের রাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "কোন দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ ।" সীতা বলেন যমুনাতে দত্ত শুদ্ধ পিণ্ড খেতে সাধ । এক মুনিপত্নীকে সীতা কথা দিয়েছিলেন । তার সঙ্গে দেখা করবেন ।

এই সত্য পালি পরে দেহত মেলানি ।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ।।
বিস্ময় মানিয়া রাম কহেন তখন ।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন ।।

পরদিন সকালে-ই ভদ্র নামক গুপ্তচরের মুখে সীতার অপবাদ শোনেন এবং ভাইকে ডেকে সীতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । কৃত্তিবাসের বিবরণে আছে — আরো

এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্মুখ ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ।।

তারপর রাম যান স্নান করতে পুকুরে সেখানে রজকদের কলহে শোনেন —

পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ।।   ইত্যাদি

এই রজক প্রসঙ্গ রামায়ণে নাই আছে জৈমিনী ভারতে । বিমর্ষ রাম ঘরে এসে দেখেন আর একটি চিত্র । রাবণের চিত্র আঁকা মেজেতে আর সীতা তার পাশে শুয়ে আছেন । সখীদের অনুরোধে রাবণ দেখতে কেমন তা দেখাতে —

হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ ।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ ।।

তারপর অন্তঃসত্তার আনন্দে হাই তুলে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েন সেখানে । মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের চিত্র । রাম সীতা সম্মুখে সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে তাঁকে বিসর্জন দেন । সীতার বনবাস, লবণ দৈত্যবধ, শম্বুক বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞকথা, স্বর্ণসীতা ইত্যাদি কাহিনী মূলানুগ তবে বর্ণনার মধ্যে কৃত্তিবাসী বৈশিষ্ট্য আছে ।

মথুরায় লবণ দৈত্য বধ করার পথে শত্রুঘ্ন যে রাত্রে বাল্মীকি আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন — তখনই সীতার যমজ পুত্র হয় —

লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে ।
লব দেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ॥

শম্বুক বধের পর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন । স্বর্ণসীতা তৈরী করেছিলেন । এই অনুষ্ঠানে বাল্মীকি লবকুশকে নিয়ে এসে রামায়ণ গান শোনান । সীতার পুত্র লবকুশ । সীতাকে আনেন বাল্মীকি । রাজসভাতে সীতা এনে বাল্মীকি তাঁর পবিত্রতা সম্মুখে সাক্ষ্য দিলেও রাম সীতাকে লোকাপবাদ ভয়ে আবার পরীক্ষার কথা বলেন । সীতা তখন শপথ বাক্য উচ্চারণ করে পাতাল প্রবেশ করেন ।

মূল রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণের পার্থক্য আছে । কৃত্তিবাস অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া - লবকুশ কর্তৃক বন্ধন এবং শত্রুঘ্ন ভরত লক্ষ্মণ, পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ এবং হনুমান জাম্বুমান সহ রামচন্দ্রের মূর্ছা । লবকুশের কাছে রামের অলংকার ও হনুমান জাম্বুমানকে দেখে সীতা রণক্ষেত্রে রামচন্দ্র নিহত হয়েছেন ভেবে দুই পুত্রসহ অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করছেন এমন সময় বাল্মীকি এসে সকলকে বাঁচিয়ে দেন — এই কাহিনী আছে জৈমিনী ভারতে (২৫ - ৩৬ অধ্যায়) এবং পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে । কৃত্তিবাস জৈমিনী ভারত থেকেই গ্রহণ করেছিলেন । লবকুশের যুদ্ধ বর্ণনা শেষ করে লিখেছেন —

এ সব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে ।
সম্প্রতি যে কিছু নাই বাল্মীকির মতে ॥

যজ্ঞস্থলে বাল্মীকির সঙ্গে এসে লব কুশের রামায়ণ গান থেকে অবশিষ্ট অংশে মূল রামায়ণ অনুসৃত হয়েছে তবে মধ্যে মধ্যে কৃত্তিবাস নিজের কল্পনার স্পর্শ দিয়েছেন যেমন সীতার আর পরীক্ষা না নিবার জন্য —

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী ।
রামেরে বাখান তিন রাজার গৃহিণী ॥

ইত্যাদি বিবরণ । বাল্মীকির রামায়ণে পাতাল প্রবেশের মুখে সীতা যে ত্রিসত্য উচ্চারণ করেছিলেন – তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অসাধারণ –

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি ॥
মনসাকর্মনাবাচা যথা রামং সমর্চয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মিরামাৎ পরং ন চ ।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ (উত্তর ৯৭।১৪-১৬)

সীতার শপথ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে নাগবাহিত রথে এলেন পৃথিবী, সীতাকে বুকে তুলে নিয়ে – পাতালে অন্তর্হিত হলেন । এর তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনার কোন তুলনাই চলে না । বাঙালী ললনার সাভিমান করুণ কণ্ঠে সীতার ১৮টি পয়ারে সীতার শেষ উক্তির কিছু অংশ এই রকম –

পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব বিদ্যমানে ।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলা আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস ।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
মহাদেবী হইতে মুনির ঘরে বসি ।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান ।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥
*** *** ***
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে ।

সভায় পরীক্ষা দিতে আমি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি ।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥
*** *** ***
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ ।
কন্যার হইলে লজ্জা তোমার যে লাজ ॥
*** *** ***
উদরে ধরিলে মোরে তাকি মনে নাই ।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাই ॥

মূর্তিমতী পৃথিবী সুবর্ণ সিংহাসন সহ আবির্ভূত হয়ে সীতাকে কোলে নিলেন – বললেন জামাই-এর উদ্দেশে –

পরীক্ষা করিতে চান্ লোকের কথায় ।
লোক লইয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥
মায়ে-ঝিয়ে দুইজন থাকিব পাতালে ॥

সীতা পুত্রদের দিকে তাকালেন না। রামের দিকে তাকিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন –

পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে ।
হস্তে চুল মুঠা রৈল সীতা গেল তলে ॥

তারপর লক্ষ্মণ বর্জনাদি এবং রামচন্দ্রের ভরত শত্রুঘ্ন সহ মহাপ্রস্থান বর্ণনা মোটামুটি মূলানুগ ।

বাল্মীকি রামায়ণ মাহাত্ম্য দিয়ে উত্তরকান্ড তথা রামায়ণ শেষ করেছেন । কৃত্তিবাসও রাম মহিমার কথা বলেছেন – কিন্তু তার আগে একটি কাব্যপূর্ণ তাৎপর্য উল্লেখ করা যাক । আদিকান্ডে রামায়ণ সুরু হয়েছিল নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশের মধ্য দিয়ে – উত্তর কান্ডে সেই চারকে এক বিষ্ণু দেহে লীন করেছেন কৃত্তিবাস –

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন ।
মিলি হইলেন এক দেহ নারায়ণ ॥

সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে ।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥

তারপর রামনাম মহিমা –

চারি বেদ সহস্র নামে যত ফল হয় ।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয় ॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ ।
সর্ব পাপ মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্র ফল ।
সপ্ত কান্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥

চরিত্র বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে – রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য ।" (খ) ভারতবর্ষের পটভূমিকায় রামায়ণের যে আলোচনা ও বিচার তা বাল্মীকির রামায়ণ । চরিত্রগুলির বিচার বিশ্লেষণও মূল রামায়ণের ভিত্তিতেই কৃত । তা নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথা, সুখময় ভট্টাচার্যের রামায়ণের চরিতাবলী, অমলেশ ভট্টাচার্যের রামায়ণকথা প্রমুখ অনেক গ্রন্থ বাংলাতে রচিত হয়েছে – তার আধারও বাল্মীকি রামায়ণ । কৃত্তিবাসী রামায়ণের তথা প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থের চরিতাবলী নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ রচনার গ্রন্থ খুব একটা চোখে পড়েনি । তার প্রথম কারণ - গ্রন্থগুলি অনুবাদ কাহিনীর মতো - চরিত্রগুলিও মূল চরিত্রের আধারে বর্ণিত । তবে কবির মানসিকতা ও দক্ষতা ভেদে চরিত্রগুলির মধ্যে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় । কবি-মানস স্থান কালের অধীন – এবং মূলতঃ জাতীয় তথা আঞ্চলিক ও লৌকিক সংস্কারও সংস্কৃতি দ্বারা অভিষিক্ত । কাহিনী বিন্যাসে অভিনবত্ব আঞ্চলিক কবিরা সৃষ্টি করে থাকেন, চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে । কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর রামায়ণ । তার মধ্যে বাঙালীর সমাজ প্রতিফলিত চরিত্রগুলির মধ্যেও বাঙালী আবেগ ও আচরণাদি প্রতিবিম্বিত । এই সূত্র অবলম্বন করেই কৃত্তিবাসের কলমে বাল্মীকি চিত্রিত চরিত্রের

যে অভিনব ব্যঞ্জনা রূপায়িত হয়েছে তার পর্যালোচনা করা যায়।

দশরথ - প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তৎকালীন জীবনবোধ অনুসারে রাজধর্ম পালন বশ মর্যাদা রক্ষা, বহুপত্নী ও ভোগের মধ্যে জীবনযাপন তৎকালের বিশ্বাসানুযায়ী সামাজিক দায়িত্ব পালন করে দেহত্যাগ করা – এই ছিল আদর্শ। বহুমহিষীর মধ্যে তরুণী তথা সুন্দরী কৈকেয়ীর দশরথের প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি-বিশেষ আনুগত্য। নিঃসন্তান রাজা যথাযথ ধর্মানুসরণ করে পুত্র লাভ করলেন দৈব কৃপায়। প্রধানা তিন স্ত্রীকে পুত্রবতী করার জন্য যজ্ঞলব্ধ পায়েস বা চরু ভাগ করে দিলেন। বাল্মীকির দশরথের সঙ্গে কৃত্তিবাসের দশরথের এই চার ভাগ করা ব্যাপারে অনৈক্য আছে। মূল রামায়ণের দশরথ পায়েসের অর্ধেক দিয়েছিলেন কৌশল্যাকে, বাকি অর্ধেকের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে, এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশের অর্ধেকটা কৈকেয়ীকে এবং বাকি অর্ধেক আবার সুমিত্রাকে দিলেন। অর্থাৎ ষোল আনার মধ্যে কৌশল্যা পেলেন আট আনা, সুমিত্রা চার + দুই = ছয় আনা, আর কৈকেয়ী দুই আনা।(দ) কৃত্তিবাস লিখেছেন –

কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁর মধ্যা দুইরানী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলা দশরথে।
হেন কালে সুমিত্রা সে লাগিল কাঁদিতে॥

দয়াবতী কৌশল্যা তাঁর ভাগ থেকে অর্ধেক দিলেন সুমিত্রাকে, শর্ত – সুমিত্রার সন্তান "আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন।" দেখাদেখি কৈকেয়ী-ও অনুরূপ শর্তে সুমিত্রাকে চারের অর্ধাংশ দিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী এক চতুর্থাংশ করে আর সুমিত্রা পেলেন দুইভাগের অর্ধাংশ।

দশরথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ছিলেন রাম। এই প্রিয়ত্বের পক্ষপাতিত্ব দেখাতে কৃত্তিবাস একটি নতুন কাহিনী তৈরী করেছেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষস নিধনের জন্য রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করতে এলে দশরথ রামকে লুকিয়ে রেখে ভরত শত্রুঘ্নকে

পাঠিয়েছিলেন । দশরথের মনোভাব —

প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি ।
এক দন্ড রামচন্দ্র না দেখিলে মরি ।।

আদি রামায়ণের দশরথও রামান্ত প্রাণ [redacted] কৃত্তিবাসের এই রামায়ণের দশরথও রামান্ত প্রাণ, কিন্তু কৃত্তিবাসের এই বিশ্বামিত্র প্রতারণা কাহিনী তাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে । তাছাড়া কৈকেয়ী রূপমুগ্ধ, পুত্রগত প্রাণ, সত্যনিষ্ঠ রাজার যে চরিত্র বাল্মীকি এঁকেছেন – কৃত্তিবাস তার সার্থক অনুসরণ করেছেন ।

কৌশল্যা – প্রধানা মহিষী, গুণবতী । কৈকেয়ীর রূপযৌবনাধীন হলেও দশরথের অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি ছিল কৌশল্যার প্রতি অটুট । কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় প্রথমেই দশরথের মনে পড়েছিল কৌশল্যার কথা । কৌশল্যা যে একাধারে রাজার দাসী, সখী, ভার্যা, ভগিনী ও মায়ের মতো –

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ ।
ভার্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি ।। (ধ)

কৃত্তিবাসেও এই মর্যাদা যথার্থ রূপায়িত হয়েছে । স্বামীর অনিবার সান্নিধ্য না পেলেও কৈকেয়ীর প্রতি স্বামীর প্রবল আসক্তি জেনেও, তিনি প্রধানা পত্নী হিসাবে কোন হীন চাঞ্চল্য দেখাননি, পত্নীর দায়িত্ব পালন করেছেন । রামের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার আনন্দ ও বনবাসের বিষাদ – একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়ার ফলে যে কর্তব্য-সংকট, যে আর্তি মৃত্যুর মতই এসেছিল কৌশল্যার জীবনে বাল্মীকি তার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন – কৃত্তিবাসও তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন । সব মায়ের চরিত্র-ই এক ছাঁচে ঢালা – তবু দেশ ও জাতি ভেদে তার প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য থাকে । বনগমনকালে কৃত্তিবাসের কৌশল্যার পুত্রের জন্য কাতর প্রার্থনা বাঙালীমনের দরদে ভরা ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্তিক গণপতি ।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ।।
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি ।
জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুণ পৃথিবী ।।

কৈকেয়ী — রামায়ণে নিন্দিত চরিত্র । কিন্তু মানবিকতা গুণহীনা নয় । রূপযৌবনের দাক্ষিণ্যে কৈকেয়ী স্বামীর প্রিয়তমা, তবু সমগ্র অন্তঃপুরের মহিষী হিসাবে কৌশল্যাকে শ্রদ্ধা করে । এইখানে কৈকেয়ীর কোন স্থান নাই, কিন্তু তার জন্য প্রবল আকাঙ্খা আছে । এইটা তাঁর গভীর ঈর্ষার উৎস । মন্থরা এইখানে যোগ দিয়েই কৈকেয়ীকে কাবু করেছিল — রাজমাতা কৌশল্যার অধীনে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব । কাজেই রামকে রাজা হতে দেওয়া যায় না — এইজন্য যা কিছু করা দরকার কৈকেয়ী তা সব করেছেন । অটল ভাবে নির্মমভাবে অন্যকিছু বিবেচনা না করে । বাল্মীকির হাতে কৈকেয়ী নিষ্ঠুরতারও স্বার্থপরায়ণার নিখুঁত চিত্র । কৃত্তিবাস তার অনুসরণ করেছেন মাত্র । পিতার মৃত্যুর পর ভরতের অযোধ্যা আগমন ও সবকিছু শুনে ... কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনার পর কৈকেয়ী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন - বাল্মীকি অঙ্গুলি সংকেতে তাঁকে দেখিয়েছেন মাত্র । রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভরত যখন যাত্রা করেন তখন কৌশল্যা সুমিত্রার সঙ্গে কৈকেয়ীও গিয়েছিলেন । ভরত ফোডের সহিত তার পরিচয় জানিয়েছিলেন রূপগর্বিতা, ধনগর্বিতা নিষ্ঠুরা দুর্ভাগিনী জননী — বলে সকলের সঙ্গে । কৃত্তিবাস এই অমর্যাদা থেকে কৈকেয়ীকে রক্ষা করেছেন । কৃত্তিবাসের রচনায় কৈকেয়ী যান নি ভরতের সঙ্গে —

কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে ।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে ।।

আরও সহানুভূতি দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস । বনবাস থেকে রাম যখন ফিরেছেন অনুতপ্তা কৈকেয়ী তখন নির্জনে অন্তঃপুরে বসে ভাবছেন —

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে ।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষ পান করে ।।

রাম এসে প্রথমেই কৈকেয়ীকে প্রণাম করছেন । লীলাবাদে বিশ্বাসী ভক্ত কবি কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী বলেছেন —

বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি ।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ।।

সীতা – চরিত্র ভারত নারীর – পতিপ্রাণতার, পাতিব্রাত্যের সর্বাতিশায়ী দাম্পত্য প্রেমের চির-তন আদর্শ । যুগভেদে এই চরিত্রের বিশ্লেষণ বিচারে ও মূল্যায়নে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু রামায়ণে এবং তার অনুবাদ সাহিত্যে – তাঁর রূপের কোন পরিবর্তন বা নবায়নের সুযোগ নেই, তবে তার চরিত্রানুগ স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যাখ্যা সূত্রে – কিছু বিস্তার করা মাত্র সম্ভব । কৃত্তিবাসে সীতার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন – শ্রীরামের রূপমুগ্ধ সীতা –

দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে ।
স্বামী করে দেহ রাম কমল লোচনে ॥

সীতাচরিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুহূর্ত সমূহকে পাঁচটি অংকে ভাগ করা যায় – রামের সঙ্গে বনগমন সংকল্প, মায়ামৃগ প্রসঙ্গে ও সীতাহরণ, অশোকনে, অগ্নি পরীক্ষা, বনবাস ও পাতাল প্রবেশ । বাল্মীকি এই নাটকীয় মুহূর্তগুলি অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্যে মন্ডিত করেছেন – কৃত্তিবাস ঘটনাগুলির সার্থক অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু তার গাম্ভীর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারেন নি । সবকিছুর মধ্যেই সীতা বাঙালী বধূ – স্বামী সোহাগিনী, অভিমানিনী, একান্ত পতিগত প্রাণা নারীরূপে চিত্রিতা । মাটির মেয়ে জানকী স্বামীর সব কথা, আচরণ, ব্যবহার নির্বিবাদে গভীর ধৈর্যের ও বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন । এটাই তাঁর গৌরব ও একমাত্র ধর্ম । এই সর্বংসহা সহধর্মিণীর আদর্শ-ই সীতাচরিত্রে প্রতিষ্ঠিত । মাঝেমধ্যে কেবল বাঙালী নারীর বা বধূজনোচিত ভাষা সংস্কার আবেগ-আচরণাদিতে কৃত্তিবাস কিছু অভিনবত্বের তথা বাঙ্গালীত্বের রং দিয়েছেন । সর্বত্রই বাল্মীকির প্রতিধ্বনি, তবে ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা অন্য সুর যেমন – লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করতে অরণ্যকান্ডে উক্তি –

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন ।

অগ্নি পরীক্ষার পূর্বে লঙ্কাকান্ডে —

বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে ।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥

পাতাল প্রবেশের পূর্বে –

আজ হইতে তোমার ঘুচুক লাজ দুখ ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥

জন্মে জন্মে প্রভু তুমি হয়ো মোর পতি ।
আর কোন জন্মে মোর কোরো না দুর্গতি ॥

নারী চরিত্রের মধ্যে তারা ও মন্দোদরী এই দুইজনের চরিত্র আলোচ্য । তারা বালীর পত্নী – বানর রাজ্যের রাণী এবং রাজপুত্র অঙ্গদের জননী । মায়াবী দানবের হাতে বালী নিহত হয়েছে এই সিদ্ধান্তের পর সুগ্রীব যখন কিষ্কিন্ধ্যাতে সিংহাসনে বসেছেন – তখন তারা রাজরাণী হতে দ্বিধা করেন নি । আবার যখন বালী এসে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে সিংহাসনে বসলেন – তখন তারা সহজেই বালীর প্রিয়তমা পত্নী হলেন । শেষে বালীর মৃত্যুতে তিনি এতটা শোককাতর হলেন যে, সহমরণ বাসনাও করেছিলেন । কিন্তু অল্পকাল পরে বালীর মৃত্যুর দুমাসের মধ্যেই আবার সুগ্রীবের অঙ্কলক্ষ্মী হলেন । এই দিক থেকে তারা রহস্যময়ী । সুগ্রীবের তাঁর প্রিয় সম্বন্ধ ছিল । ভালবাসতেন তাঁকে । অনার্য সমাজে দেবর পতি হওয়ায় নিন্দা নেই । বিধি আছে, কাজেই সুগ্রীবকে স্বামী হিসাবে গ্রহণের মধ্যে কোন অসামাজিকতা নেই । যদিও পুত্র অঙ্গদের ভাল লাগেনি, বোধ হয় কোন পুত্রের-ই লাগে না । তারা স্বামীকেও ভালবাসতেন, তার মঙ্গলের জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন, রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সঙ্গে বিবাদ না করতে বলেছেন । মনে হয় এতে ছলনা নেই, সবই অকপট । কৃত্তিবাস বাল্মীকির সূত্র ধরেই তারা চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু একটি বিশেষত্ব দিয়েছেন তা রামের প্রতি তারার অভিশাপ ।

আমি অভাগী দিনান্ত না হইবে খণ্ডন ।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥
সীতার কারণে তুমি হারাইবে প্রাণ ।
এ জন্মের মতো দুঃখে না পাইবে ত্রাণ ॥
*** *** ***
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে ।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন ।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥

মন্দোদরীর যে পরিচয় দিয়েছেন বাল্মীকি, তা এই দানবময় ও হেমা অপ্সরার রূপবতী কন্যা মন্দোদরী রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইন্দ্রজিত তাঁর পুত্র। সীতাহরণকে মন্দোদরী সমর্থন করেন নি। সীতাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর শোকার্তা মন্দোদরীর বিলাপের মধ্যে এটি পাওয়া যায়। স্বামীর বহু নারী কামনা ও লাম্পট্য সম্বন্ধেও বিলাপ, বহু সতী নারীকে বিধবা ও নির্যাতনের জন্য যে অভিশাপ সঞ্চিত হয়েছিল, তাতেই রাবণের মৃত্যু।

কৃত্তিবাস মন্দোদরীকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে রাবণের দুষ্কার্যে বাধা দিতে দেখা যায় মন্দোদরীকে। সর্বাপেক্ষা দুটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সীতার প্রতি অভিশাপ ও রামের কাছে অবৈধব্য বরলাভ। সীতা স্বামীদর্শনে যাচ্ছেন। সকলে প্রণাম করছে তাঁকে, শোকার্তা মন্দোদরীও প্রণাম করে অভিশাপ দিলেন –

মন্দোদরী বলে শুন জনক নন্দিনি।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥
পুরী সহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে ॥
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টে তোমাকে দেখিবে রঘুনাথ ॥
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ হবে না খণ্ডন ॥

সীতাহরণে দুঃখিতা এই মহীয়সী নারীর এমন কঠোর শাপ বিনাপরাধে সীতাকে দেওয়ার মধ্যে যদিও হীনতা আছে ও সর্বাংশে বেমানান - তবু অস্বাভাবিক নয়, শোকার্তা নারী শোকের হেতুর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। নিজের সৌভাগ্যের অবসান ও অপরের সৌভাগ্যের উদয় – সম্বন্ধে ঈর্ষাতুর হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। মনে হয় এই অভিশাপের আরও একটা হেতু আছে। রামভক্ত কবি কৃত্তিবাস - রামচন্দ্র সীতাকে যে কঠোর নিষ্ঠুর অমানবিক ভর্ৎসনা এবং চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে পরিত্যাগের ঘোষণা করেছিলেন, রাম চরিত্রের এই কলঙ্ক মোচনে - সতী মন্দোদরীর অভিশাপ একটি বিশেষ হেতু [illegible] করে থাকবেন কৃত্তিবাস – এমন অনুমান করা যায় না কি ?

রাবণ বধের পর মন্দোদরী রামচন্দ্রকে প্রণাম করলে তাকে ঠিক চিনতে না পেরে

সীতা বলি রামচন্দ্র ভাবিয়া তাহারে ।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্বাদ করে ।।
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ ।
হেন বর দিলে কেন কমল লোচন ।।
চন্দ্র সূর্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে ।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ।।

তাহলে মন্দোদরীর বৈধব্য বিমোচনের উপায় কী ? উপায় হল । যে পর্যন্ত স্বামীর চিতা নির্বাপিত না হয় সে পর্যন্ত স্ত্রীর বৈধব্য হয় না – এই বিধান । রাবণের চিতা অনির্বাণ । রাম বললেন –

রাবণের চিতা রহিবে সর্বথা
চিরকাল রবে তায়তে ।।

রাবণের চিতা বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে অবৈধব্যের প্রতিশ্রুতি থাকলেও চিরন্তন জ্বালার দিকটি অধিকতর মর্মদাহী ।

রামচন্দ্র রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র । রামকে নিয়েই রামকথা বা রামায়ণ। রামায়ণ গ্রন্থারম্ভে নারদ বাল্মীকি সংবাদে – রামচরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য নারদের মুখে শুনেছিলেন বাল্মীকি – তার মধ্যেই রামচন্দ্রের চরিত্রের মূল তত্ত্ব নিহিত ।

নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান ধৃতীমান বশী ।
বুদ্ধিমান নীতিমান বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রু নিবর্হণ: ।।
*** *** *** ***
ধর্মজ্ঞ: সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রত: ।
যশস্বী জ্ঞান সম্পন্ন: শুচির্বশ্য: সমাধিমান্ ।।
*** *** *** ***
স চ সর্ব গুণোপেত: কৌশল্যানন্দবর্ধন: ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবান ইব ।।

বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শন: ।
কালাগ্নি সদৃশ: ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসম: ।।

(আদি ১।৮-১৮)

বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে এই সর্বগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথাই বিস্তার করেছেন । 'ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ ' রূপটি রামচরিত্রের অক্ষয় বীজ – এই বীজের চরম বিকাশ – রাজা রামের প্রজা হিত ব্রতের মধ্যে । যথা বুদ্ধি যথা শাস্ত্র যাকে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, বুঝেছেন কোন কিছুর বিনিময়ে ভয়ে বা লোভে তা থেকে বিচ্যুত হননি তিনি । তার ফলে রামচরিত্র ঘিরে নানা রহস্য – বিশেষত: বালিবধ, শম্বুক বধ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও সীতা নির্বাসন প্রমুখ ঘটনাবলীর মধ্যে প্রকটিত হয়েছে । তা নানা দিক দিয়ে কেবল বিস্ময়কর নয় বিভ্রান্তিকরও এবং তার সামঞ্জস্য করা কঠিন । সত্য ও ধর্ম বলতে তিনি যে বস্তুকে গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বপুরুষদের অভ্যস্ত বংশ মর্যাদা রক্ষা রাজার কর্তব্য । নিজের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা, এমন কি প্রাণাধিকা সীতা সম্বন্ধেও তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর সত্যনিষ্ঠতা ও প্রজা কল্যাণে তথা নিয়োজিত । রাজার চরিত্র আদর্শ চরিত্র – সর্ব দোষ বর্জিত এমন একটা ধারণা তাঁর প্রতি আচরণে পরিস্ফুট ।

বাল্মীকি যে আদর্শে রামচরিত্র বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস কদাচ সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি । ব্যক্তিগত রুচিতে যা পছন্দ করেনি, কখনো কখনো তার মন্তব্যও দিয়েছেন । কিন্তু বর্ণনার অন্যথা করেন নি যেমন বালি বধের পর –

কৃত্তিবাস পন্ডিতের ঘটিল বিষাদ ।।
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ ।।

রামচরিত্রের বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই বাঙালী চরিত্রের আবেগের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে – শোকে ও বিরহে । সীতাহরণের পর রামের ব্যাকুলতা বর্ষা শরতে বিরহের চিত্র, মায়া সীতা বধের পর বা লক্ষ্মণ শক্তিশেলের পর রামের আর্তি, সীতা বনবাসের পর শোক নির্বেদ সর্বত্রই বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন কৃত্তিবাস – কিন্তু মাত্রা ও রং দিয়েছেন বাঙালী মানসিকতার । সীতা বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলে লক্ষ্মণ শুনেছে রাম তিন দিন রাজকার্য না করে অন্ত:পুরে শোকমগ্ন ছিলেন । লক্ষ্মণ রামকে বললেন – যে লোকপ্রবাদের ভয়ে রাজার কর্তব্যরূপে সীতা বিসর্জন দিলেন তবে এখন যদি ঘরে

বসে রাজকর্তব্য অবহেলা করে কাঁদেন — তাতে সাধুসঙ্কল্প ব্যর্থ হবে ।

কিন্তু কৃত্তিবাসের বর্ণনা অন্যরূপ । লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরলে - রাম শোকে ভেঙে পড়লেন —

শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা ।
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয় ।
বর্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ।।
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি ।
একলা আসিবে বনে কাহার সংহতি ।।
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার ।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ।।

শোকার্ত রামকে জানালেন যে বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে রেখে এসেছেন ।

লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন ।
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন ।।
*** *** ***
যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞাদান ।
রাত্রির ভিতরে আনি সীতা তব স্থান ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে ।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ।।
সীতা না দেখিয়া ভাই পারি না রহিতে ।
কেমনে সীতার শোক পাশরিব চিতে ।।

তখন তিনভাই যুক্তি করে বিশ্বকর্মাকে ডাকালেন । "ক্ষতমন সোনা" দিয়ে স্বর্ণ সীতা বানালেন বিশ্বকর্মা । অবিকল সীতা ।

সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর ।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ।।
এক দৃষ্টে চাহেন সোনার সীতা মুখ ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় দুখ ।।

***   ***   ***

সাত রাত্রি বসি রাম আইলা বাহির ।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ।।

স্বর্ণসীতার কথা বাল্মীকিও বলেছেন । অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্মিনীর সহ সঙ্কল্প করতে হয় — একপত্নী ব্রত, রাম তার জন্য স্বর্ণসীতা নির্মাণ করেন । কিন্ত কৃত্তিবাসের স্বর্ণসীতা রাজকর্মের জন্য নয়, নিজের অন্তরের প্রয়োজনে ।

এই জাতীয় কিছু বাঙালী মানসিকতাজাত অনুরঞ্জন ছাড়া কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামচরিত্রের আদর্শ থেকে কোথাও বিচ্যুত হন নি ।

ভরতচরিত্র এত অসাধারণ যে মর্ত্যমানুষের কাছে কেবল কল্পনা লভ্য । রাজা দশরথ বলেইছিলেন যে রাম থেকেও ভরত অধিকতর ধার্মিক —

রামাদপি হিতং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্ ।   (২।১২।৬১)

বাল্মীকি রামায়ণে এই চরিত্র সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত । রামচরিত্রে কখনো কখনো উষ্মা ও বেদনা আছে । জনপদের বাহিরে প্রথম রাত্রিতে তৃণশয্যায় শুয়ে রাম — দশরথের কামুকতা - কৈকেয়ীর লোভ - ভরতের ভাগ্য ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । আবার চতুর্দশ বৎসরান্তে প্রত্যাবর্তনের পর হনুমানকে পাঠিয়েছিলেন — দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর ভরতের মনে কোন লোভ বা আসক্তি জন্মেছে কি না তা জানতে । অবশ্য লোকচরিত্র অভিজ্ঞ রামের এমন প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় এবং তার উদ্দেশ্যও মহৎ কিন্তু ভরত সম্বন্ধে রামের মনে সামান্য সংশয় যে ছিল না — এসব দ্বারা এই কথাই মনে হয় না কি ?

কিন্তু ভরত চরিত্র সর্বথা এই জাতীয় মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্মল । রামায়ণে কেবল রাময়ণে কেন বিশ্বের যাবতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যও বোধ করি ভরতের মতো এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দ্বিতীয় চরিত্র নেই । বিনা অপরাধে পিতা, মাতা, রাম-লক্ষ্মণ পরিবার পরিজন সর্বসাধারণ সকলের কাছে নিন্দা-সন্দেহ সংশয়ভাজন হয়েছেন । পিতা তাকে পুত্রের পারলৌকিক থেকে বঞ্চিত করেছেন । রামচন্দ্রের বনবাস, রাজ্য ত্যাগের মধ্যে পিতৃসত্য পালনের ধর্মনির্দেশ ছিল, কিন্তু ভরত যে চতুর্দশ বর্ষ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন — সকলের শত অনুরোধেও পিতৃ আদেশে প্রাপ্ত সিংহাসনের

দাবী অগ্রাহ্য করেছিলেন – জ্যেষ্ঠের ন্যাসী হয়ে রাজধানীর বাহিরে থেকে পাদুকা বসিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কেবল আপন বিবেকের নির্দেশে। একমাত্র শত্রুঘ্ন ছাড়া - কৌশল্যা, সীতা, লক্ষ্মণ, রাজন্যবর্গ, প্রজাবর্গ, জনগণ এমন কি রামচন্দ্র তাকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং পলে পলে পদে পদে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তিনি নিজের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভরত চরিত্র অনন্য। পিতা দশরথ তাঁকে রামের অপেক্ষাও ধর্মে বলবত্তর বলেছিলেন। চণ্ডাল রাজসরল চিত্ত গুহক-ও ভরতের কর্ম দেখে বলেছিলেন – ধন্য, ধন্য ভরত - যে রাজ্য লাভের জন্য মানুষ সারা জীবন সংগ্রাম করে, তপস্যা করে সে রাজ্য অযত্নে পেয়েও ভরত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে।

ধন্যস্ত্বং ন তুয়াতুল্য পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নোদাগতং রাজ্যং যস্ত্বংত্যক্তুমিচ্ছতি ॥

মূলানুসরণ করেও কৃত্তিবাস দুইটি স্থলে ভরতের চরিত্রে নতুনত্বের রং দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র রাম তথা রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেছিলেন যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাক্ষস-বধ করতে। দশরথ তাদের বদলে প্রতারণা করে রামলক্ষ্মণ বলে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠিয়েছিলেন। সরযূর তীরে বন। সেখানে এসে বিশ্বামিত্র বললেন যে দুটি পথ আছে তাঁর আশ্রমে যাবার – এক পথে যেতে সময় লাগে তিন প্রহর আর একটিতে তিন দিন। তবে তিন প্রহরের পথে রাক্ষসের ভয় আছে – তাড়কা রাক্ষসী মানুষ খায় –

কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মনে।
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন ॥
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন প্রয়োজন।

কথা শুনেই বিশ্বামিত্র বুঝলেন – এ রাক্ষসত্রাস রাম নয়, সমদর্শন ভরত। ভরতের উত্তর বিবেচনাপ্রসূত কিন্তু প্রত্যাশিত অপরোচিত নয়। রাক্ষস নিধনকারী রামচরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভরতকে যে খানিকটা ছোট করা হল – সেটি বোধ হয় কৃত্তিবাস কবি লক্ষ্য করেন নি।

আর একবার লঙ্কাকাণ্ডে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে মূর্ছিত। হনুমান গন্ধমাদন পর্বত খণ্ড মাথায় করে আসছেন। সূর্যোদয় হলে লক্ষ্মণের বিপদ - কিন্তু তার শঙ্কা নেই কারণ সূর্যকে বগলে আটকে রেখেছেন হনু। রাম মাঝে মধ্যেই ভরতের কথা

বলেন । কী রকম শক্তিমান ভরত তা দেখতে সাধ হল হনুমানের । নন্দীগ্রামের শ্রীরামের পাদুকার উপর ছায়া পড়তেই, ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে বাটুল নিক্ষেপ করলেন আকাশচারীর দিকে – আহত ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন হনুমান, পরিচয় হল । সীতাহরণাদি, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল শুনে কাঁদতে লাগলেন ভরত সসৈন্য সৈন্য নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন - কিন্তু রামের নির্দেশ নেই । পর্বতটা নিয়ে যেতে হবে শীঘ্র কিন্তু হনুমান দুর্বল হয়ে পড়েছেন - তাকে যে আকাশে তুলে দিতে হবে । তৎক্ষণাৎ তীর মেরে ভরত পর্বতসহ আকাশে তুলে দিলেন ।

ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান ।
আমা সহ বাণেতে তুলিনা গিরি খান ।।

লক্ষ্মণচরিত্র রামায়ণে ক্ষাত্রতেজ ও কর্মের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । নিত্য সহচর লক্ষ্মণকে রাম বলতেন "প্রাণ-ইবাপরঃ" – তার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ । বাঙালীর জীবনচর্যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য আদর্শ হিসাবে সীতারাম অপেক্ষা সৌভ্রাত্র বিষয়ে রামলক্ষ্মণ – কথাটি সমধিক প্রচলিত । বস্তুতঃ সীতা ছাড়া রামকে ভাবা যায়, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রাম অকল্পনীয় ।

অন্যায় অধর্ম যেই করুক পিতা হলেও লক্ষ্মণের কাছে অমার্জনীয় । কৈকেয়ীর কাছে সত্যবদ্ধ দশরথের রাম নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যদানের প্রস্তাবে লক্ষ্মণ পিতাকে বন্দী ও হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলেন । "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্ত-মানসম্ ।" (২।২১।১৯) কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি এতো গভীর যে তাঁরই নিষেধে অগ্রসর হতে পারেন নি । কৈকেয়ী দশরথ কারো দোষ দেখেন নি রাম নির্বাসন ব্যাপারে বলেছিলেন 'দৈব' । ষোল আনা ক্ষাত্র শক্তিতে সমুজ্জ্বল পৌরুষের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ উপহাস করে রামকে বলেছিলেন –

বিক্লবোবীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে ।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবংপর্যুপাসতে । (২।২৩।১৬)

যখন রাম ও সীতার বনে যাবার কথা স্থির হল তখন রাম লক্ষ্মণকে বললেন অযোধ্যায় থেকে কৌশল্যা ও সুমিত্রার দেখাশুনা করতে । এবার ভেঙে পড়লেন লক্ষ্মণ কান্নায় । রামের পা জড়িয়ে ধরে বললেন – আমাকে নিয়ে চল দাদা । অনুচর হয়ে সঙ্গে থাকব

তোমাদের । "ঐশ্বর্যং চা পি লোকনাং ন কাময়ে তুয়া বিনা ।"
আর একটি উক্তির কথা মনে পড়ে । রাম-সীতা লক্ষ্মণকে যমুনাতীরে রেখে অযোধ্যা ফিরে যাচ্ছেন অন্যান্য সুমন্ত্র । কার কী বার্তা জানতে চাইলেন তিনি । লক্ষ্মণ বললেন — দশরথের মধ্যে কোন পিতৃত্ব গুণ নেই, আমার ভ্রাতা, ভর্তা বন্ধু সবই রাম —

অহং তাব-মহাপ্রাজ্ঞে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে ।
ভ্রাতা ভর্তা বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥ (২।৫৮।৩১)

সীতাহরণের পরে শোকার্ত রামকে কখনো বন্ধুর মত উৎসাহ দিয়ে কখনো অভিভাবকের মতো জোর করে রক্ষা করেছেন, লঙ্কা সমরেও তার শৌর্য অসাধারণ । সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বিসর্জনের মতো একান্ত অনভিপ্রীত কর্মের ব্যাপারেও গভীর দুঃখের সঙ্গে রামের কঠোর আদেশ নির্বিবাদে পালন করেছেন ।

ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির স্বরূপের পার্থক্য দেখাতে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্যটি করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য — "ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ । কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ ভক্তির অনুব্যঞ্জন জীবিকার সন্ধান ।" (ন)

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণচরিত্র চিত্রণে বাল্মীকির পুরাপুরি অনুসরণ করেছেন — বাংলা ভাষাধ্যমের হেতু অনুবাদের সুর মূলের সমতানে ধ্বনিত না হলেও বিষয়বস্তু সর্বতোভাবে মূলানুগত এবং একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে কোন লক্ষণীয় অতি-রঞ্জন বিহীন কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ চরিত্রই বাল্মীকির সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদ ।

বানর চরিত্রের মধ্যে বালি ও সুগ্রীব চরিত্র মোটামুটি মূলানুগ । অঙ্গদ চরিত্রে রায় বার অংশে অঙ্গদের সাহস, রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সংযোজন করেছেন কৃত্তিবাস ।

হনুমান, কেবল বানর চরিত্রের মধ্যে নয়, বোধ হয় রামায়ণের সব চরিত্রের মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস, শক্তি বুদ্ধি কর্মোদ্যম ও দক্ষতার মূর্ত প্রতীক । দেবারতির এমন বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ চরিত্র, এমন তুল্য বিশ্বাসের জীবন্ত মূর্তি — ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্যে বর্ণিত দাস্যভক্তির সমস্ত চরিত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । বাল্মীকির বর্ণিত

অংশ ছাড়া কৃত্তিবাস যে সব মৌলিক ও বাল্মীকির রচনা ভিন্ন অন্যান্য সূত্র থেকে নানা নতুন সংযোজন করেছেন — তার মধ্যে হনুমানের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ।

রামায়ণ বিশ্লেষণ পর্যায়ে কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের নতুন ও মৌলিক সংযোজন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে গন্ধমাদন পর্বতাদি থেকে বিশল্যকরণী ওষুধ সংগ্রহে, মহীরাবণ বধে, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে, নীলকমল আহরণে, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়নে — সর্বোপরি নিজের বক্ষবিদীর্ণ করে অস্থিতে রামনামের স্বাক্ষর সপ্রমাণে হনুমানের যে চরিত্র কৃত্তিবাস রচনা করেছেন তার চমৎকারিত্ব ও স্বাদুতা, সরসতা ও কৌতুকময়তা অসাধারণ ।

বাল্মীকির রামচন্দ্র হনুমানকে বলেছিলেন — তোমার এক একটি উপকারের জন্য প্রাণ দিতে পারি কিন্তু এত উপকার আর আমার প্রাণ একটি কাজেই ঋণী রইলাম —

> একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামিতে কপে ।
> শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্ ।। (৭।৪০।২৬)

মহাপ্রস্থানের সময় রামচন্দ্র হনুমানকে বলেছিলেন — তুমি চিরজীবী হয়ে আমার কথা প্রচার করবে । হনুমানও বলেছিলেন

> যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী ।
> তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনু-পালয়ম্ ।। (৭।১০৮।৩৫)

কিন্তু কৃত্তিবাসের রামের উক্তি আরও আন্তরিক ও মহত্তর —

> যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে ।
> চন্দ্র সূর্য যতকাল জগতে প্রচারে ।
> তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর ।
> তোমার প্রসাদে মুক্ত হবে চরাচর ।।
> হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গ বাস ।
> তোমার যে গুণ শুনি - এই অভিলাষ ।।
> শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে ।

সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রি দিনে ॥
হনু প্রতি বলেন শ্রীরাম কমল লোচন ।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন ॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির ।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥

রাক্ষসগণের মধ্যে বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিতাদির চরিত্র মূলানুগামী । রাবণ চরিত্রে কৃত্তিবাস নতুন ব্যঞ্জনা এনেছেন । রজস্তম গুণ প্রধান, ব্রহ্মার বরে মহাশক্তিধর রাবণ দিগ্বিজয় করেছেন । অপরিমেয় বাহুবলের সঙ্গে সীমাহীন নারী-ভোগ পিপাসা তার চরিত্রের মূল কেন্দ্রে স্থিত । কৃত্তিবাস নৈপুণ্য ভাবে এই রাবণের বর্ণনা করেছেন — তার শক্তি ও কামচারিতা তৃপ্তিহীন নারীভোগলোলুপতা । তার ঐশ্বর্য, কূট বুদ্ধি, সন্তান স্নেহ, দোষ গুণ সবই বর্ণনা দিয়েছেন । হনুমান লংকায় গিয়ে রাবণের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন — কামুক রাবণের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । অঙ্গদ রায়বারের পর অঙ্গদও একদিনে যেমন রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অপমান করেছিলেন, তেমনি রাবণের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধও হয়েছিলেন । ভক্তিরসাপ্লুত কবি তরণী সেন অতিকায়াদিকে কেবল নয় এ হেন রাবণকেও রামের ভক্তে পরিণত করেছেন । আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বীরবাহুর ভক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করে লিখেছেন — তৎপরে রাবণের মুখে —

জন্মিয়া ভারত ভূমে আমি দুরাচার ।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার ॥
অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময় ।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাবণ এক দৃষ্টে রয় ॥

রামের নিকট এই মিনতি করিলে অনুতপ্ত জগাই-মাধাই এবং নবোত্তী চৈতন্য প্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন — তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক । লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে রাবণের লংকা ভুলিয়া তাহাকে ভারত ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ।[ব] অবশ্য সকল সংস্করণে এই অংশ নেই । কারণ পাঠান্তর বিভিন্ন সংস্করণে বিপুল ।

রাবণ ছিলেন রাজনীতি বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞ ব্যক্তি । ভূপতিত রাবণের কাছে রাম রাজনীতি শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করে লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে ।

লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
কোন নীতি সংসারেতে রাম অগোচর ।।
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে ।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে ।।
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ ।
দয়া করে একবার দিন দরশন ।।
শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান ।।

উপদেশ বিশেষ কিছু নয়, চিরপ্রচলিত দুটি নীতিকথা – শুভস্য শীঘ্রং –

করিতে উত্তমকর্ম বাঞ্ছা যবে হবে ।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ।

আর অশুভস্য কালহরণম্ ।।

শূর্পনখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে ।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ।।
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে ।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ।।
*** *** *** ***
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে ।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ।।

মনে হয় এই অংশটি মহাভারতে শরশয্যায় পতিত যুধিষ্ঠিরাদির উপদেশ অংশ দ্বারা প্রণোদিত । যাহোক ভক্তিবাদের বৈরীভাবের সাধনায় বৈষ্ণবীয় ধারা দ্বারা রাবণ চরিত্র প্লাবিত ।

বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ

প্রাচীন সাহিত্য ছিল হস্তলিখিত পুথি নির্ভর। কাজেই সেখানে পাঠভেদ ও পাঠান্তর একটি অনিবার্য স্বাভাবিক ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম ও গৌড়ীয় – এই তিনটি পাঠে বা পাঠান্তরে বাল্মীকির রামায়ণ বিভক্ত। বাংলা রামায়ণ গৌড়ীয় পাঠ অবলম্বনে রচিত।

কৃত্তিবাসের কোন সঠিক পাঠ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর তো আছেই। শ্রীরামপুরের প্রেসে মুদ্রাংকিত হবার পর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। বটতলার সংস্করণে পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার সংশোধন করেছিলেন, সেই ধারায় বহু লেখক গায়কের সংস্কারে ও সংশোধনে – বর্তমান প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখ্যত, ভাষার দিক থেকে একেবারে আধুনিক রচনা। প্রচলিত সেই সংস্করণকে অবলম্বন করেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের আস্বাদন ও বিচার।

বর্তমান তৃতীয় অধ্যায়ে কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের পার্থক্য কোথায়, আংশিক পরিবর্তন, পরিবর্জন, নতুন সংযোজন কোথায় কিভাবে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা হয়েছে। প্রস্তুত অংশটা প্রধানত: বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সেই বৈসাদৃশ্যের পুনরুক্তি মাত্র।

(১) কান্ডের নামকরণে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর – বাল্মীকি এই কান্ডনামায় কৃত্তিবাস বালকে আদি কান্ড ও যুদ্ধকে লংকাকান্ড করেছেন। তাছাড়া – অন্যান্য কান্ডে একটি 'আ' কার যুক্ত হয়েছে – আরণ্য কান্ড, সুন্দরা কান্ড, উত্তরা কান্ড।

(২) গ্রন্থারম্ভেও উভয় কবির বৈসাদৃশ্য আছে। বাল্মীকি নারদ সংবাদ মূল রামায়ণের আরম্ভ। কৃত্তিবাস সুরু করেছেন বৈকুন্ঠে নারায়ণের চতুরংগ প্রকাশের কথা বলে।

(৩) কৃত্তিবাসের নতুন যেসব কাহিনী সংযোজন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – বাল্মীকির পূর্ব জীবন রত্নাকর কথা, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, অজ বিলাপ, তরণী সেন কাহিনী, মহীরাবণ-অহিরাবণ বৃত্তান্ত

রাবণের চণ্ডীপাঠ, রামের অকাল বোধন, রাবণের মৃত্যুবাণ প্রসঙ্গ, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি।

(৪) প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক নতুন কথা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষ্মণের চতুর্দশ বৎসর অনাহার-অনিদ্রার সাক্ষ্য, শিব বিবাহ, লঙ্কার উৎপত্তি, গরুড় পবনের যুদ্ধ, দেবগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের কালে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব, রামের জন্য অযোধ্যায় বিশ্বকর্মা কৃত অশোকবন নির্মাণ, সীতার পরিবাদ বিষয়ে রজক জামাতার অভিযোগ ও রাবণের চিত্রাঙ্কণ, গন্ধমাদন সহ হনুমানের ভরতের নিকট গমন, সূর্যকে হনুমানের বগল চাপা, সীতার পাতাল প্রবেশের পর শোকার্ত লবকুশকে তিন বুড়ী – কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার ও তিন খুড়ার ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের সান্ত্বনা ইত্যাদি।

(৫) কাহিনী বিন্যাসে ক্রমভঙ্গের নিদর্শন – মূলের কুবেরের বৃত্তান্ত ও পরে রাক্ষসদের বিবরণের পরিবর্তন। রম্ভা রাবণ বৃত্তান্ত মূলে আছে দেবতাগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে কৃত্তিবাস বহু পূর্বে তা বলেছেন।

স্বর্ণসীতা নির্মাণের কথা কৃত্তিবাস বলেছেন সীতা নির্বাসনের ৭ দিন পরে বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে ইত্যাদি।

(৬) নাম বিভ্রাটও আছে – পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা কৃত্তিবাসের কলমে হয়েছে বিশ্রুবা। মূলে বিশ্রবার পত্নীর নাম দেববর্ণিনী – কৃত্তিবাস বলেছেন লতা, মূলে কৈকসী (নিকষা) পিতার নাম সুমালী কৃত্তিবাস লিখেছেন মাল্যবান ইত্যাদি।

(৭) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উভয় কবির মানসিকতার প্রভেদ। কৃত্তিবাসের বাঙালী মনের কোমলতা বাল্মীকির বৈদগ্ধ্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। মহোরস্ক, দীর্ঘবাহু মহেশ্বাস বীর রামচন্দ্র হয়েছেন কৃত্তিবাসের হাতে দুর্বাদল শ্যাম – "নবনী জিনিয়া দেহ অতি সুকোমল।" রাম হয়েছেন ভক্তবৎসল। অতিকায় ও তরণীসেনের যুদ্ধে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন – "রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধকাণ্ডে ঠিক চৈতন্য ও নিত্যানন্দের আদলে গঠিত হইয়াছেন। ... ... পাঠক বাঙালীর যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ বস্তু তাহার নমুনা কোন ইতিহাসেই পাইবেন না। যেমন এইখানে পাইবেন। তারপর

তরণী গুন্ডিচা পার হইয়া প্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন, তাঁহার অঙ্গ কদম্ব কোরকবৎ কন্টকিত হইয়া উঠিল।

রামের সর্বাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে।
ব্রহ্মান্ড এক এক লোমকূপের ভিতর।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী।

বীরবাহু নূপুর পায় দিয়া যুদ্ধে যাইতেছেন। কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে সংকীর্তনে নাচিতে হইবে না। ••• ••• অন্তর তেজের সাক্ষাৎ বিগ্রহ স্বরূপ রাবণের মূর্তি যে ভক্তির উপাদান দিয়া নবীন কোমল ভাবে গঠিত হইতে পারে ইহা কোন কবি শিল্পী বোধহয় ইতিপূর্বে ধারণাও করিতে পারিতেন না। ••• ••• এ যেন কামান ভাঙিয়া ফুল ধনু সৃষ্টি করা হইয়াছে, লৌহদন্ডকে মঞ্জরিত করিয়া সপুষ্প লতিকায় পরিণত করিয়াছে।" (ন)

সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভিন্ন অংশে কাহিনী বিস্তারে, প্রকৃতি বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, সর্বত্র – কবির ভক্তিরসাপ্লুত বাঙালী মন এমন স্বাতন্ত্র্য তথা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে – যাতে বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তরিকতার দিক থেকে বাল্মীকির অনুবাদ অপেক্ষা কৃত্তিবাসের নিজের রচনা বলেই গ্রহণ করা যায়। দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে মূল্যবান – "এ রামায়ণ (কৃত্তিবাসী) ও আদি রামায়ণ, ইহাদের মধ্যে যত প্রভেদ, তাহাতে উভয়কে দুইখানি স্বতন্ত্র বহি বলিয়া গণ্য করিলেও অত্যুক্তি হয় না।" (প)

কৃত্তিবাসের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য বিচার

কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন – "বাঙ্গালায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে, তবে তাহা এই কৃত্তিবাসের তথাকথিত রামায়ণ। আমি মহাকাব্য বলিতে গ্রীক বা সংস্কৃত আলংকারিকদের সংজ্ঞা অনুসরণ করিতেছি না। ইহাতে একটি মহাদেশের, মহাজাতির, মহাপুরুষের মহীয়সী মহিমার ও মহাবীরের জীবনকাহিনী বাণীরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি।" (ফ)

বাঙালীর জীবন-সমাজ-পরিবার, নিসর্গ পরিবেশ, সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ফুল-ফল, বেশভূষা, পূজা পার্বন, ভোজ্য-পানীয়, উৎসব-আমোদ সবকিছু ভাল-মন্দ নিয়েই কবি কৃত্তিবাস তার রামায়ণ কাহিনী রচনা করেছেন।

বাল্মীকির কাহিনীর কাঠামো ও চরিত্রসমূহের অবয়ব পরিবর্তন না করে তার অভ্যন্তরে ও অন্তরে বাঙ্গালীর শোণিত প্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন ভাব-ভাবনা, মায়া-মমতা, হাসিকান্নাদিতে – নতুন প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঙ্গালীর অদৃষ্টবাদ ও দৈব নির্ভরতা। স্বপ্ন মাধ্যমে জীবজন্তুর গতিবিধি, নৈসর্গিক অবস্থাদি বিচার করে শুভাশুভ বিচারাদির অজস্র পরিচয় রামায়ণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

১) সুমিত্রার দুর্ভাগ্যের কারণ - (সংস্কার)

বাসি বিবাহের দিন হয় কাল রাতি।
স্ত্রীপুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি ॥
কাল রাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সে স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন ॥ (আদি)

২) রামচন্দ্রাদির বিবাহে অধিবাস অনুষ্ঠান –

হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে ॥
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।
বান্ধিল মঙ্গল সূত্র তাহাদের করে ॥ (আদি)

৩) দুর্লক্ষণ দর্শন রামচন্দ্রের –

হাতে ধনুর্বাণ রাম আসিলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥
কাল সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। (অরণ্য)

৪) বিবাহ অনুষ্ঠান –

সুবর্ণ আসরে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি।
*** *** ***
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥

অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ ।
সীতারামে পর ।র হৈল দরশন ।।
জলধারা নিয়া তার কন্যা নিল পরে ।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ।। (আদি)

৫) শবদেহ সৎকার –

তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে ।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ।।
শুক্ল বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী ।
সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধী কস্তুরী ।।
নানাবিধ কুসুমের মালা মনোহর ।
যথাস্থানে দিল তার গলার উপর ।।
চিতার উপরে লয়ে করায় শয়ন ।
হেঁটে উর্ধ্বে কাঠ দিল অগুরু চন্দন ।। (অযোধ্যা কান্ড)

৬) দৈবনির্ভরতা বা অদৃষ্টবাদ –

বিধাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী ।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজি ।।
বিধাতা জানেন ভাল আমার চরিত ।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত ।।
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা ।
বিধাতার দোষে তাই আমার দুর্দশা ।। (অযোধ্যা কান্ড)

৭) বধূর বেশভূষা অলংকার —

কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর ।
বাল সূর্য সম তেজে দেখিতে প্রচুর ।।
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে ।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ।।
চক্ষুঞ্চল নয়নে দিল কাজলের রেখা ।

রামের কার্মুকে যেন গুণ যায় দেখা ।।
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি ।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি ।।
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
সুবর্ণের কর্ণ ফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ।।
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কন ।।
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর ।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ।।

বাঙালীর ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় মুখ্যত: শ্যাম শ্যামাকে কেন্দ্র করে । কৃত্তিবাসে সুস্পষ্টত বৈষ্ণব ও শক্তি প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে । হনুমানাদি রামপক্ষ ছাড়াও লঙ্কায় তরণীসেন প্রমুখের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব মনোভাব এবং রাবণের পার্বতী আরাধনা চন্ডীপাঠ এবং রামের অকাল বোধনাদির মধ্যে শাক্ত ধারার প্রকাশ । অবশ্য এই আখ্যান কৃত্তিবাসের মৌলিক নয় জৈমিনি ভারত থেকে সংগৃহীত ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখ্যত: পয়ার ছন্দে রচিত । প্রায় ষোল আনাই ৮ + ৬ এই ১৪ অক্ষরের পয়ার। মাহাত্ম্যাদি ও বিশেষ আবেগ প্রকাশের সময়ে কেবল কয়েকটি স্থানে নাচাড়ি বা ত্রিপদী দেখা যায় । ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী — দুই রকম আছে । যেমন —

১) নমস্তে সর্বানী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া ।
অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া ।।

২) রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি
দন্ড কমন্ডলু করি হাতে ।
স্বর্গে নাচে দেবগণ মর্ত্যে নাচে মর্ত্যজন
হরিষে নাচিছে দশরথে ।।

কৃত্তিবাসের ভাষা যেমন সরল ও অনর্গল তেমনি সহজ সরল যেন স্বত: উৎসারিত তার উপমা । উপমানগুলি কখনো সংস্কৃত বা পূর্বকবিদের ভাণ্ডার থেকে আহৃত কখনো বা কবির অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষতা জাত যেমন –

ক) সীতার রূপ বর্ণনা –

নয়ন খঞ্জন তার দশন মুকুতা ।
গমন মন্থর যেন জিনি গজ মাতা ।।
ভ্রমর জিনিয়া যেন কবরী বিরাজে ।
মল্লিকা মালতী জুতি বেড়া তার পাশে ।।

খ) রাবণের হাসি —

কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখ হাসে ।
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ।

এমন অনেক আছে ।

প্রবাদ, প্রবচন, গূঢ়ার্থক বাক্যগুচ্ছের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার কৃত্তিবাসের রামায়ণ – যেমন – কালনেমির লঙ্কাভাগ, রাবণের চিতা, কাঠবিড়ালীর সাগর বন্ধন, ঘরের শত্রু বিভীষণ, বানরের গলায় মুক্তামালা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, রামে মারিলেও মারিবে- রাবণ মারিলেও মারিবে, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস (রাবণ), রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি রচনা, ধনুর্ভাঙ্গা পণ, দেবর লক্ষ্মণ, খর লক্ষ্মণ, রামরাজত্ব, লঙ্কাকাণ্ড, কোন বুদ্ধি খাটিবে না ঘরপোড়ার কাছে, সুজনের বন্ধু রাম দুর্জনের যম, করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ, মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী, ধন পাইলে তুষ্ট যেন গরীবের মন, পিঁপড়ার পাখা ওঠে পুড়িবার তরে, বামন হইয়া চাঁদে বাড়াইলি হাত, দাঁতে কুটা, গলবস্ত্র, জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালা, সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল ইত্যাদি ।

এ বিষয়ে সংশয় নেই যে প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণটি – কীর্তিবাস কবি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত থাকলেও তাঁর ভাষা, বিষয়বস্তুর বিন্যাস অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রচনার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই । অতি জনপ্রিয়তার খেসারত দিতে দিতে বহু লিপিকার, গায়ন, ও পণ্ডিত জয়গোপালের মত পণ্ডিতের হাতের ছোঁয়ায় একেবারে

নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। শত শত বৎসরের ভক্ত ও রসিক বাঙালীর হৃদয়ের স্পর্শে কল্পনার কলমে, গীতের সুধায় – বর্তমান রামায়ণ একদিক দিয়ে বাঙ্গালী জাতির সমবেত রচনা। গঙ্গার ধারার মধ্যে যেমন নিয়ত বিভিন্ন উপধারার জলস্রোত মিশে গিয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করে, নতুন বাঁক ও তরঙ্গ সৃষ্টি করে কিন্তু তাতে গঙ্গা-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব করে না – কৃত্তিবাসী রামায়ণ গঙ্গাও এমনি সর্বযুগের সকল বাঙালীর মানস রসে পুষ্ট এক অনবদ্য অফুরন্ত পবিত্র ধারা। প্রক্ষেপ, সংযোজনাদি দ্বারাও বাংলা সাহিত্যে – কৃত্তিবাসের রামায়ণ – এই ধারাবাহিকতার অব্যাহত গতির জন্যই বাঙ্গালীর - অনুবাদ সাহিত্যে রামকথা সুরধুনীর চিরন্তন পতিত পাবনী গঙ্গা। বাঙ্গালী হৃদয়ের সহজাত ভক্তির চন্দনে গড়া ভক্তবৎসল রামচরিত কথা।

তথ্যসূত্র *

ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ (উত্তরা কান্ড) - সম্পাদক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।

খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্দ্ধ – সুকুমার সেন ।

গ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৮ ভাগ, প্রথম সংখ্যা (১৩১৮) ।

ঘ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২০ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (১৩২০)

ঙ) সাধনা, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক, ১৩০১, কবি কৃত্তিবাস, সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

চ) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮ ।

ছ) সাহিত্য সংহিতা, ৮ম খন্ড, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৪ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

জ) সাধক, ১ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২০, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঝ) শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঞ) মাসিক বসুমতী, ১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র : ১৩৩৭ ।
কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ট) প্রবাসী, ৬১ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬৮ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ।

ঠ) কৃত্তিবাস ও গৌড়েশ্বর প্রবন্ধ – কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, পৃ: ১৩১ ।

ড) ১৩৭১ সালে ফুলিয়ায় স্মরণোৎসবে সভাপতির ভাষণ । কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, পৃ. ২৬২ ।

ঢ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের যাবতীয় উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত রামায়ণের তৃতীয় মুদ্রণ থেকে ।

ণ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তর কান্ড) - সম্পাদক, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।

* এর সাথে পরিশিষ্ট সংযোজনী পৃষ্ঠা ২০৭ দ্রষ্টব্য ।

ঙ) গ্রন্থান্তরে এই পয়ার পঞ্চকের পাঠান্তরে এই চতুঃশ্লোকী আছে । এটি অধিকতর সংহত ।

আদিকান্ডে রাম জন্ম বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যা কান্ডে রাম যায় ছাড়ি রাজ্য ভার ।।
অরণ্য-কান্ডেতে সীতা হরিল রাবণ ।
কিষ্কি-ধ্যাকান্ডেতে হয় সুগ্রীব মিলন ।।
সুন্দরাকান্ডেতে হয় সমুদ্র বন্ধন ।
লঙ্কাকান্ডেতে হয় রাবণ নিধন ।।
উত্তরাকান্ডেতে হয় সবকথা শেষ ।
সীতাদেবী করিলেন পাতাল প্রবেশ ।।

খ) প্রাচীন সাহিত্য – রামায়ণ ।

দ) বাল্মীকি রামায়ণ, বালকান্ড - ১৭ ।

ধ) বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড - ১২।১৮-১৯

ন) রামায়ণী কথা – দীনেশচন্দ্র সেন ।

প) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস - দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গদর্শন, ২য় বর্ষ, ১৩০১ ।
কৃত্তিবাস সঙ্কলন গ্রন্থ থেকে আহৃত ।

ফ) কৃত্তিবাস – কালিদাস রায়, বঙ্গশ্রী, ১ম বর্ষ, ২ খন্ড, পৌষ এবং মাঘ ১৩৪৮
কবি কৃত্তিবাস থেকে গৃহীত ।

ব) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খন্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সং, পৃঃ ১৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

বাল্মীকি - মাধব কন্দলী - কৃত্তিবাসের সাদৃশ্যাদি বিচার

চতুর্থ অধ্যায়

বাল্মীকি - মাধব কন্দলী - কৃত্তিবাসের সাদৃশ্যাদি বিচার

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও চরিত্রাদি বিচার প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতাদি সহ । এই অধ্যায়ে বিষয় বা কাহিনী ভিত্তিক আলোচনার সেই সূত্রে প্রধান ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করা হল । স্মরণীয় যে কন্দলী আদি ও উত্তর কাণ্ড যথাক্রমে মাধব দেব ও শঙ্কর দেবের রচনা ।

বাল্মীকি রামায়ণে রাজা দশরথের দুটি যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি । দশরথ সন্তান কামনায় বহু তপোনুষ্ঠান করেন কিন্তু বিফল হন । তারপর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্কল্প করেন । এ সময়ে সুমন্ত্র তাঁকে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বলেন আর দশরথ লোমপাদের রাজ্যে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আমন্ত্রণ করেন । সে যাগ সমাপ্ত হওয়ার পর ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্র কামনার কথা জানালে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আরম্ভ করেন । সে যজ্ঞের অগ্নি থেকে এক তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হয়ে রাজাকে পায়সপূর্ণ পাত্র দান করেন। রাজা দশরথ সেই পায়স তিন রাণীকে দেন ও তিন রাণী সন্তানসম্ভবা হন । এখানে নারায়ণের চারি অংশে জন্মের বৃত্তান্ত আছে ।

কন্দলীর রামায়ণেও এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে । তবে তাতে রাজা দশরথ অন্ধক মুনির অভিশাপের কথা বশিষ্ঠের কাছে ব্যক্ত করেছেন । আর বশিষ্ঠ দশরথকে তাঁর কন্যা শান্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । অন্যান্য অংশ বাল্মীকির অনুরূপ ।

কৃত্তিবাসে — অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুবধের বর্ণনায় আছে অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে একটি শ্রীফল দিয়ে তা চরুতে সমর্পণ করার কথা বলেন । আবার নারায়ণের চারি অংশে জন্ম গ্রহণের কথাও অন্ধক মুনিই দশরথকে বলেন । এতেও শান্তা দশরথ কন্যা বলে বর্ণিত হয়েছে । পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অগ্নিতে নারায়ণের আকৃতির চরু ওঠে তাতে অন্ধকের দেওয়া ফলটি দেওয়া হয় — সেই পায়স স্বর্ণথালায় ঢেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি

দশরথকে দেন। রাজা তা দুভাগ করে দুই রাণীকে দেন। আর কৌশল্যাও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে তাঁদের অর্ধাংশ দান করেন। তবে পায়স ভাগের ক্ষেত্রে সুমিত্রার অংশের কথা দশরথের অগোচরে হয়েছে। সুমিত্রা ভাগ চাওয়ায় কৌশল্যা তাকে নিজের অর্ধাংশ দিয়ে তার পুত্রকে নিজ পুত্রের সঙ্গী হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তা দেখে কৈকেয়ীও অর্ধাংশ দান করে বিনিময়ে সুমিত্রা পুত্রের দাসত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। রামায়ণে পায়সের ভাগের বিবরণ ভিন্ন। দশরথের অনুরোধে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে পায়সের ভাগ দিয়েছেন।

কন্দলীতে যজ্ঞোত্থিত তেজোময় পুরুষ ধর্মাশৃঙ্গ মুনিকে পায়স দেওয়ার সময় নারায়ণের চারি অংশে জন্মের কথা বলেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে দশরথ রাণীদের বলেন — দুই রাণী রাজার অনুমতি নিয়ে সুমিত্রাকে ভাগ দেন এবং কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাঁদের পুত্রের সহায় হওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ করেন সুমিত্রাকে।

রামায়ণ কাহিনীতে অবতার বাদের সূত্রপাত হয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণে বিষ্ণু চার অংশে জন্মগ্রহণের কথা শুধুমাত্র দেবতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অপর দুটি রামায়ণে দশরথ জানেন যে তাঁর গৃহে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করবেন। এ তিন রামায়ণেই পায়স চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে তদনুসারে রামাদি চার ভাই বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশ। কিন্তু অবতার হিসাবে রামই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

বানরাদির জন্ম — রামাদির জন্ম স্থির হওয়ার পর তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাদের অমিত বলশালী বানর সৃষ্টি করার নির্দেশ দেন কেননা ব্রহ্মার বরে রাবণ কেবল নরবানরের হস্তেই নিধন হওয়ার উপায় রয়েছে। তাই রামকে সাহায্য করার জন্য দেবতাগণ বানর সৃষ্টি করলেন। কন্দলীর রামায়ণে এ কাহিনী নেই। বানরগণের সঙ্গে দেবতাদের কোন সম্পর্কের কথা নেই। সুন্দরাকাণ্ডে হনুমানের জন্মকথা আছে তাতে বায়ুর কামপরবশ হওয়ার কথা আছে কিন্তু বিষ্ণুর আদেশের কথা নেই। আর নলকে বিশ্বকর্মার দেওয়া বরের উল্লেখ আছে। যাতে কোন জিনিষই নল স্পর্শ করলে জলে ডুববে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বানরদের দেবতার অংশে জন্মগ্রহণের কাহিনী আছে আদিকাণ্ডে।

রামের জন্ম — বাল্মীকি রামায়ণে রামের জন্মের সঙ্গে কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত নয়। শুধুমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে রাশিচক্রের বর্ণনা আছে। তবে রামকে বিষ্ণুর অর্ধাংশ, ভরতকে এক চতুর্থাংশ ও লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অর্ধাংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিষ্ণু পাঁচ অংশে ভাগ হলেই উক্ত বিভাগ সম্ভব।

কন্দলীতে তিন রাণী স্বপ্নে নারায়ণ দর্শন করেন। রাজাকে এই সংবাদ দিতে তিনি নারায়ণের জন্মের কথা অনুমান করেন। এতে রামাদির জন্মের কোন তিথি বা মাসের উল্লেখ নাই। তবে রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাবণের মাথার মণি খসে পড়ার কথা আছে, যা রাবণের দুর্ভাগ্যের সূচনাস্বরূপ। মাল্যবান রাবণকে তাঁর বধকর্তার জন্ম বলে বর্ণনা করেছেন। এতে বিষ্ণুর চার অংশের কথা থাকলেও কোন বিভাগ দেওয়া নেই।

কৃত্তিবাসে রাণী কৌশল্যা স্বপ্নে নারায়ণ দেখা দিয়ে মা বলে ডেকেছেন। এখানে রামের জন্ম চৈত্রমাসের রামনবমী তিথিতে বলা হয়েছে। রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাবণের আসন টলে ওঠে তাঁর মুকুট শিরচ্যুত হয়। বিভীষণ তাকে বধকর্তার জন্ম সংবাদ দেন। রাবণ শুক ও সারণকে এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে পাঠানে শুক সারণ রামের নারায়ণ মূর্তি দর্শন করে তুষ্ট হয় আর রাবণের কাছ থেকে এ সংবাদ লুকিয়ে রাখে। রাবণ সমস্ত তীর্থ জলে স্নান করে অমঙ্গল দূর করেন।

রামাদির বাল্যকাল — বাল্মীকি রামায়ণে রামাদির বাল্যলীলা সম্বন্ধে কোন দীর্ঘ বিবরণ নেই। রামকে সর্বপরাক্রমী ও গুণসম্পন্ন বলা হয়েছে। আর লক্ষ্মণকে রামের দ্বিতীয় প্রাণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুগত, তেমনি শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত ছিলেন।

কন্দলীতে রামের গুণ বর্ণনার সঙ্গে দীর্ঘ শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যা হরি ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। এতেও রামের অনুগত লক্ষ্মণ আর ভরতের শত্রুঘ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তবে তাতে পায়সের বিভাগের কথা উল্লেখ আছে।

কৃত্তিবাসে রামের বাল্যলীলার বর্ণনা আছে । এতেও চার ভাইয়ের সৌহার্দের কথা বলতে গিয়ে চরু বিভাগের উল্লেখ আছে । তবে দশরথ অ-ধমুনির অভিশাপের কথা গৌরবের বলে উল্লেখ করেছেন ।

রামজীবনের উন্মেষ — রামের বাল্যলীলায় মারীচের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আর ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র রেখে যাওয়া অমৃতপূর্ণ ঘৃণান খাওয়ার কথাও এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যা অন্য দুটি রামায়ণে নেই ।

গুহক বৃত্তান্ত — বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কান্ডে গুহককে রামের সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।

কৃত্তিবাসে গুহকের সঙ্গে রামের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । দশরথ একদিন পুত্রদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় গুহক চন্ডাল তাঁর পথ রোধ করে রামকে দেখতে চায় । দশরথ রামকে রথের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গুহককে বন্ধন করে রাখেন । গুহক তখন পায়ের সাহায্যে ধনুক ধরে বান মোচন করে । রাম এ দেখার কৌতূহলে তার সম্মুখে উপস্থিত হলে গুহক তাঁকে প্রণাম করে পূর্ব-জন্মের কথা বলে । পূর্বজন্মে গুহক ছিলেন বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব । অ-ধমুনির পুত্র সি-ধু বধের পর দশরথ পাপ স্খলনের জন্য উপায় অনুস-ধানে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে দিয়ে তিন বার রাম নাম উচ্চারণ করান । বশিষ্ঠ একথা শুনে পুত্রকে চন্ডাল হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন — কেননা এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ মুক্ত হয়, বামদেব সে নাম তিনবার জপ করিয়েছিলেন । পরে তাঁকে শাপ মুক্ত হবার উপায় বলে দেন — যে রামের জন্মের পর তাঁর দর্শনে গুহকের শাপমুক্তি হবে । এ কথা শুনে রাম গুহককে মুক্ত করে অগ্নিসাক্ষী করে মিত্রতা করেন ।

কন্দলীর রামায়ণে আবার অন্য কাহিনী পাওয়া যায় । দশরথ পুণ্যতিথিতে সপুত্র গঙ্গাস্নান করতে গেলে একই ঘাটে গুহকও স্নান করে । এতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গুহককে বেঁধে আনান । রামকে দেখে গুহকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত মনে পড়ে যায় ; যে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুণ গঙ্গাকে অপমান করায় গঙ্গার অভিশাপে একশত জন্ম চন্ডাল যোনিতে যাপন করে । রামের দর্শনে তার শাপ মুক্তি ঘটে । রাম তখন পিতাকে অনুরোধ করেন — তাকে মুক্ত করতে । তিনি গুহকের সঙ্গে মিত্রতা

স্থাপন করেন ।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামের গমন — বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র মুনি সুবাহু ও মারীচের অত্যাচার থেকে নিজের যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করেন । দশরথ প্রথমত: অসম্মত হলেও পরে বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে সম্মত হন । বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমে যাবার পথে রামকে বলা ও অতিবলা নামে মন্ত্র দান করেন ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করলে দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে মুনির সঙ্গে দেন । সরযূ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্র আশ্রমে যাবার দুটি পথের বর্ণনা দিলেন একটি দীর্ঘ অন্যটিতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তবে সে পথে বিপদের আশঙ্কা প্রবল । ভরত দীর্ঘ পথে যাবার প্রত্যাশী হলে বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করেন যে এ রাম নয় । তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলে দশরথ রামকে তাঁর সঙ্গে পাঠান । পথশ্রান্ত রামকে দেখে বিশ্বামিত্র তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দেন । সে মন্ত্র শুনেই লক্ষ্মণ তা শিখে নিলেন ।

কন্দলীর রামায়ণে দশরথ রামকে সঙ্গে দিতে অস্বীকার করলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলে দশরথ রামকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি মুনির সঙ্গে যেতে প্রস্তুত কিনা । রাম সানন্দে মুনির সঙ্গী হতে রাজী হলেন । লক্ষ্মণ রামকে অনুরোধ করেন তাঁকে সঙ্গী করার ; এ কথা শুনে দশরথ লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গী হওয়ার অনুজ্ঞা দেন । বিশ্বামিত্র যাত্রা পথে সরযূর তীরে দুই ভাইকে মহামন্ত্র দীক্ষা দেন ।

রামাদির বিবাহ — বাল্মীকিতে অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় জনকের যজ্ঞে যোগ দিতে যান । সেখানে তিনি জনককে শিবের ধনু দেখাতে অনুরোধ করেন । জনক বলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ দেবরাত দেবতাদের কাছ থেকে এই ধনু পেয়েছিলেন । অতঃপর জনক হল চালনা কালে এক কন্যা প্রাপ্ত হন ; সেই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি পণ করেন যে, যে এই ধনুকে জ্যা আরোপ করতে পারবে — তিনি এই কন্যা লাভ করবেন । এই পণে অসন্তুষ্ট রাজাগণ ধনু উত্তোলন করতে অসমর্থ হয়ে জনকের দুর্গ অবরোধ করেন । এক বৎসর অতীত হলে

জনকের তপস্যায় সন্তুষ্ট দেবগণ জনককে এক চতুরঙ্গ সেনা দান করেন আপনাকে রক্ষা করার জন্য। বিশ্বামিত্রের আদেশে জনক রাম ও লক্ষ্মণকে সেই ধনুক প্রদর্শন করেন। রাম বিশ্বামিত্রাদির সম্মতি ক্রমে সে ধনুক উঠিয়ে তাতে জ্যা আরোপ করে টঙ্কার দেন – সে টঙ্কারে হরধনু ভগ্ন হয়। জনক সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করার বাসনা ব্যক্ত করেন।

এইরূপে রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্ম্মিলার, ভরত ও শত্রুঘ্নর সহিত যথাক্রমে মান্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়।

কৃত্তিবাসের কাহিনী অন্যরূপ। তিন কোটি রাক্ষস বধের পর বিশ্বামিত্র রামকে সীতার স্বয়ম্বরের ও জনকের ধনুর্ভাঙ্গা পণের কথা বলেন। যাহোক হরধনু ভঙ্গ করার পর তাঁকে সীতা বিবাহের প্রস্তাব জানালে রাম বিশ্বামিত্রকে বলেন, যে যে রাজা চারভাইকে চারকন্যা দান করবেন তিনি সেখানেই বিবাহ করবেন। একথা জেনে জনক চিন্তিত হলে তাঁর ম-ত্রী শতানন্দ এর বিহিত করেন এবং জনকও তাঁর প্রস্তাব চার কন্যার সঙ্গে রামাদি চার ভ্রাতার বিয়ে হয়। কৃত্তিবাসের মত ধনুক জনক শিবের কাছ থেকে পেয়েছেন পরশুরামের মাধ্যমে। দেবতারা রামের সঙ্গে সীতার বিবাহের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করেন - রাবণও এই ধনুকে গুণ পরাবার চেষ্টায় বিফল হন।

ক-দলীতে অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় যান। জনক ধনুক সম্বন্ধে জানান যে শিব একদিন মৃগ বধ করার পর ধনুকখানা জনকের দ্বারে ছেড়ে যান। এই দেখে জনক ধনুকে যে গুণ দিতে পারবে তাকে কন্যা দেবার পণ করেন। সেই মত স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। নৃপতিবর্গ মিথিলায় মিলিত হন। রাম ধনুভঙ্গ করার পর সীতা তাঁকে বরমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে চারি ভ্রাতার যথাক্রমে চারি ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

সীতার পূর্বরাগ -- সীতার পূর্বরাগের কথা বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্য দুই রামায়ণে তার উল্লেখ আছে। কন্দলীতে সুয়ম্বর সভায় যাওয়ার সময় সীতা রামকে দেখেন এবং পূর্বরাগ জন্মে। তিনি পিতার অঙ্গীকার ছিন্ন করেও রামকে বরণ করায় আগ্রহী ছিলেন।

কৃত্তিবাসে সীতা এই সময় রামকে দেখে সমস্ত দেবদেবীর কাছে রামকে পতিরূপে পাওয়ার প্রার্থনা করেন -- এবং দৈববাণী হয় যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে।

অন্ধক উপাখ্যান -- বাল্মীকি রামায়ণে রামের বনযাত্রার পর দশরথ নিজের মৃত্যু প্রসঙ্গে সিন্ধুবধ ও অন্ধকমুনির অভিশাপের কথা কৌশল্যাকে বলেন।

কন্দলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামাদির জন্মের সঙ্গে এ উপাখ্যান যুক্ত।

ভরতের রাম সকাশে যাত্রা ও পাদুকা প্রসঙ্গ -- বাল্মীকিতে দশরথের মৃত্যুর পর রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরত পাত্র-মিত্র মন্ত্রী ও মাতাদের নিয়ে চিত্রকূট যান। সেখানে নানা বিতর্ক হয়। রাম পিতৃসত্য রক্ষার্থে দৃঢ় ব্রতী হওয়ায় ভরত রামের কনকথচিত পাদুকা গ্রহণ করে রামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করার অঙ্গীকার করেন। রামও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন।

কন্দলীতেও ভরত মাতাদির সঙ্গে চিত্রকূট গেছেন এবং রামের কনক পাদুকা নিয়ে এসেছেন। আর পাদুকা গ্রহণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপিত।

লক্ষ্মণের সংযম -- লক্ষ্মণের সংযমের কথা বাল্মীকি বা কন্দলীর রামায়ণে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কান্ডে লক্ষ্মণের ১৪ বৎসরের সংযমের কথা আছে। তিনি বিশ্বামিত্রের দেওয়া বলা ও অতিবলা মন্ত্রের সাহায্যে বিনা আহার নিদ্রায় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

লক্ষ্মণ রেখা বা গন্ডী — বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতার কুটীরের দ্বারে লক্ষ্মণের টানা কোন গন্ডীর উল্লেখ নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই রেখার কথা উল্লেখ আছে। সীতা হরণের আগে মারীচ রামের গলার স্বর নকল করে আর্তনাদ করলে সীতা লক্ষ্মণকে রামের রক্ষার জন্য যেতে বলেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে সীতাকে রাম সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেন লক্ষ্মণ। সীতা লক্ষ্মণকে তিরস্কার করলে লক্ষ্মণ কুটিরের দ্বারে একটি রেখা টেনে সীতাকে সেই রেখার বাইরে যেতে বারণ করে রামের সন্ধানে যান।

জটায়ু — বাল্মীকির রামায়ণ সীতা হরণের সময় বাধা দিতে অগ্রসর জটায়ুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবণের অশ্ব, রথ, সারথি ও ছত্র ছিন্ন করার পর পরিশ্রান্ত জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন করে রাবণ সীতাকে হরণ করে। আহত জটায়ু রামকে সীতার সংবাদ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কৃত্তিবাসে-ও অনুরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তবে তার পূর্বে দশরথের শনির দৃষ্টি ও জটায়ুর সঙ্গে বন্ধুত্বের বিবরণ আছে।

সপ্তশাল ভেদ — বাল্মীকি রামায়ণে আছে রাম বালি বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য দেবার অঙ্গীকার করেন। তখন সুগ্রীব রামকে বালির শক্তির বর্ণনা করে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সংশয় নিরসনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন সুগ্রীব সাতটি শালগাছ দেখিয়ে বলেন রাম যদি একটি বাণে সপ্ত শাল ভেদ করতে পারেন আর দুন্দুভির অস্থি দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন তবে নিঃসংশয় হবেন সুগ্রীব। রাম অবলীলায় দুন্দুভির কঙ্কাল অঙ্গুষ্ঠের আঘাতে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করেন ও সপ্তশাল বৃক্ষ ভেদ করেন।

কৃত্তিবাসে আছে বালি এক শরে তিনটি শাল বৃক্ষ ভেদ করতেন।

কৃত্তিবাসে আবার রাবণ ও বালির যুদ্ধের কথা আছে । যাতে বালি রাবণকে লেজে বেঁধে আহ্নিক করেন । সপ্তশাল গাছ নখের চাপে ভেদ করে । অন্যান্য বর্ণনা বাল্মীকির অনুরূপ ।

তারার অভিশাপ — বাল্মীকির কাহিনীতে তারার অভিশাপের কথা নাই । কিন্তু কৃত্তিবাস ও কন্দলী উভয়েই তারার শাপের বর্ণনা দিয়েছেন । যাতে বলা হয়েছে রাম সীতা উদ্ধার করতেও দীর্ঘকাল একত্রবাস করতে পারবেন না ।

হনুমানের জন্মকথা — বাল্মীকির কাহিনী মতে অপ্সরা শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা বা অঞ্জনা হনুমানের মাতা । অভিশাপের ফলে তিনি বানররাজ কুঞ্জরের দুহিতা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর স্বামী কেশরী । একদা বায়ু অঞ্জনার রূপ যৌবন দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করেন এতে অঞ্জনা কুপিত হলে বায়ু তাকে বলেন যে তিনি মনে মনেই সঙ্গম করেছেন এবং তার ফলে অঞ্জনার যে পুত্র হবে সে বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাপরাক্রমশালী আর বায়ুর মত বেগবান হবে । অতঃপর অঞ্জনা গুহার মধ্যে হনুমানকে প্রসব করেন । মহারণ্যে নবোদিত সূর্যকে ফল মনে করে ধরার জন্য আকাশে তিন শত যোজন লাফ দিলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করেন । বজ্রাঘাতে আহত হয়ে তিনি শৈলশিখরে পতিত হলে বাম হনু ভগ্ন হয় বলে তিনি হনুমান নামে পরিচিত । পুত্রকে প্রহৃত দেখে বায়ু ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন যে অস্ত্র দ্বারা হনুমানের মৃত্যু হবে না । ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাতে নিহত না হওয়ায় তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন ।

কন্দলীতে হনুমানের মাতা অপ্সরা কুন্তীকলা । শাপবশে বানররাজ কুঞ্জরের পুত্রী ও কেশরীর স্ত্রী । অন্যান্য বিবরণ একই ; তবে সূর্যকে ধরবার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি পৌঁছে গেলে প্রচণ্ড কিরণে শিখরে পড়ে হনু ভগ্ন হয় । জাম্বুবানের মুখে জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর হনুমান আপন পিতা কেশরীর বীরত্বের কথা বলেন । কেশরী এক বার ভরদ্বাজ মুনিকে একটি হাতী[redacted] আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন - তখন ভরদ্বাজ মুনি তাঁকে অমিত বিক্রমশালী [redacted] পুত্র হবে বলে বর দান করেন ।

কৃত্তিবাসে কুঞ্জর তনয়া নামে বিদ্যাধরী বিশ্বামিত্রের শাপে বানরী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর কন্যা অঞ্জনাকে বিবাহ করে কেশরী। সূর্য্য আহরণ বৃত্তান্ত একই। তবে এখানে রাহু সূর্য্যকে গ্রস্থ হতে দেখে ইন্দ্রকে সংবাদ দেন। ইন্দ্র দ্বিতীয় রাহুকে দেখতে এলে হনুমান ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে ধরবার জন্য ধাবিত হন; এবং ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। অন্যান্য বৃত্তান্ত কন্দলীর অনুরূপ।

রাবণ বধ — বাল্মীকিতে অগস্ত্যের উপদেশে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তিনবার আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ করে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন রাম, তিনি যতবার রাবণের মাথা কাটার চেষ্টা করেন ততবারই নতুন মাথা সৃষ্টি হয়। রাম বহু চেষ্টা করেও রাবণের দশমস্তকের ক্ষতিসাধন করতে পারলেন না। তখন মাতলি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন ব্রহ্মাস্ত্রের কথা। রাম সে বাণে রাবণের হৃদয় ভেদ করে প্রাণ হরণ করলেন।

কন্দলীতে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায় তবে অগস্ত্যের কথা সেখানে নেই। রাবণের শিব আরাধনার কথা আছে যার ফলে মাথা কাটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মস্তক উদ্গম হয়।

কৃত্তিবাসে রাবণ যুদ্ধের আগে দেবী চন্ডিকার পূজা করেন — তাতে বৃহস্পতি চন্ডী পুঁথি পাঠ করেন। রামের আদেশে হনুমান চন্ডী অশুদ্ধ করায় দেবী রণস্থল ছেড়ে চলে যান। তারপর হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে গিয়ে মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করে আনে। বিভীষণ রামকে বলেন শঙ্করের বরের কথা যার ফলে হাত পা বা মাথা কেটে ফেললেও তা নতুন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নাভিমূলে আঘাত করলেই রাবণের মৃত্যু হবে। রাম এইভাবেই রাবণ বধ করেন।

সীতার অগ্নি পরীক্ষা — রাবণ বধের পর রামের আদেশে বিভীষণ সীতাকে রাম সকাশে আনেন। রাম সীতাকে দর্শন না করেই তাকে বর্জনের কথা উচ্চারণ করেন। সীতা এই কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করে লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে নির্দেশ দেন; লক্ষ্মণ রামের সম্মতি পেয়ে চিতা নির্মাণ করেন - সীতা সেই অগ্নিতে প্রবেশ করলে স্বয়ং অগ্নি তাঁকে রামের হস্তে সমর্পণ করেন।

কন্দলীতে অনুরূপ বর্ণনাই আছে ।

কৃত্তিবাসে অনুরূপ বর্ণনা হলেও সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করার পর রামের বিলাপের কথা রয়েছে । রামের অবস্থা দেখে দেবতাগণ ও অগ্নি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করেন ।

সীতা বিসর্জন -- উত্তর কান্ডে বর্ণিত সীতা বিসর্জন মূলত রামায়ণের সমাপন ঘোষণা করে । রাম ভদ্রকের মুখে প্রজাদের মধ্যে সীতা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনে সীতাকে বর্জন করার সঙ্কল্প করেন এবং লক্ষ্মণকে সে ভার অর্পণ করেন । রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবন দেখানোর ছলনায় বাল্মীকির তপোবনে রেখে আসেন ।

মাধব কন্দলীর উত্তরাকান্ড পাওয়া যায় না বা তিনি রচনা করেন নি । কাজেই সীতা বিসর্জনের প্রসঙ্গ কন্দলীতে ওঠে না ।

সীতার পরিবাদ সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের রাম প্রথম [illegible] ভদ্রের মুখে, পরে রজকের কলহে সীতার কলঙ্কের কথা শোনেন শেষে রাবণের চিত্রের পাশে সীতাকে সুপ্ত দেখেন । এই তিন ঘটনায় রাম সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এবং লক্ষ্মণকে সে দায়িত্ব দেন ।

শম্বুক বধ - উত্তর কান্ডে বর্ণিত আছে রাম রাজত্বের কালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামের কাছে আসে তাঁর কিশোর পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে । সেই ব্রাহ্মণ রামের রাজত্বে ব্রাহ্মণের অকাল মৃত্যুতে রাজাকেই দোষী করেন । রাম তাঁকে আশ্বস্ত করে এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন । তিনি নানা মুনি ঋষিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন - তখন নারদ তাঁকে বলেন যে তাঁর রাজ্যে কোন শূদ্র তপস্যা করছে যার ফলে এ অকাল মৃত্যু হয়েছে । রাম ব্রাহ্মণকে পুত্রের দেহ তৈলপাত্রে রাখার নির্দেশ দিয়ে শূদ্র তপস্বীর সন্ধানে নির্গত হন । তিনি এক তপস্বীকে দেখে তাঁর তপস্যার কারণ জানতে চাইলে তপস্বী নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিয়ে সশরীরে স্বর্গবাসের আকাঙ্খার কথা বলে । এই কথা শুনে রাম খড়্গের আঘাতে তপস্বীর শিরচ্ছেদ করেন এবং ব্রাহ্মণ পত্র পুনর্জীবন লাভ করে ।

কৃত্তিবাসেও একই বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। মাধব কন্দলীর উত্তর কান্ড নেই।

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির তুলনামূলক বিচারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কন্দলী ও কৃত্তিবাস দুজনেই বাল্মীকির বৃত্তান্ত থেকে বহু ক্ষেত্রে দূরে চলে এসেছেন। তবে এই দূরত্ব কন্দলী অপেক্ষা কৃত্তিবাসে সমধিক। অন্যভাবে বলা যায় কৃত্তিবাসের চেয়ে বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য কন্দলীর বেশি। অপ্রধান ঘটনা আলোচনা করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও স্পষ্টতর তথা দৃঢ়তর হয়।

চরিত্র সৃষ্টি পর্যায়ে দেখা যায় বাল্মীকি রামচন্দ্র মুখ্যত: নর, নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম। তাঁর ভগবত্তা অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে কন্দলী ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে শুধু ভগবত্তা দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। ভক্তাধীন ভগবানের পরম করুণাময় ত্রাতা রূপে বর্ণনা করেছেন। একই ভক্তি আন্দোলনের বন্যায় — রামভক্তির প্লাবনে পূর্ব ভারতের দুই কবিই অবাধে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন ভাবাবেগের ভক্তিবিশ্বাসের দিক থেকে এই দুই কবি সমধর্মা।

শুনিয়োক সভাসদ মধুর কোমল পদ
পুণ্যকথা রামর চরিত্র।
যম পন্থ নিবারণ কলিমল সংহারণ
মহারহস্য শ্রবণে অমৃত ॥

আর শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।

এই বিশ্বাস ও শরণাগতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পঞ্চম অধ্যায়

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাস

পঞ্চম অধ্যায়

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাস

কন্দলী মাধব ও পন্ডিত কৃত্তিবাস – এই দুই কবির উদ্ভবের মধ্যে অব্দগত বিচারে অবশ্যই ব্যবধান আছে কিন্তু রামভক্তি প্রবন উচ্ছ্বাসের মধ্যে– মধ্যযুগীয় ভাব আন্দোলনের অভিঘাতে উভয়ের অন্তর একই তরঙ্গে উদ্বেলিত, একই সুরে ধ্বনিত, একই বিশ্বাসে সুস্থিত। এইদিক থেকে তাঁরা একাত্মক।

কন্দলী শব্দের মধ্যে যে তর্ক যুক্তি বিচারের ব্যঞ্জনা আছে, পন্ডিত কথার মধ্যেও তারই আভাস। কৃত্তিবাসের ভনিতায় মুখ্য বিশেষণ দুইটি পন্ডিত ও বিচক্ষণ।

কৃত্তিবাস পন্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥

অথবা বাল্মীকি বন্দিনা কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিলা ভাষা রামায়ণ ॥

মাধব ও কৃত্তিবাস দুই জনেই রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভে রামায়ণ রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। মাধবের উক্তি –

মহাঋষি বাল্মীকিয়ে রামায়ণ করিলন্ত
সাক্ষাতে জানিবা যেন বেদ।
শ্রবণে অমৃতময় সকল পাপর ক্ষয়
সংসারের বন্ধ হব ছেদ ॥
*** *** *** ***
কবিরাজ কন্দলি যে আমাকে সে বুলিবয়
করিনোহো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে ॥

কৃত্তিবাসের উক্তি —

বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকান্ড গান ॥
সাতকান্ড কথা হয় দেবের সুজিত ।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পন্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে ॥

কান্ডে কান্ডে বিস্তৃত মূল বিষয়বস্তু এক হলেও রামকথার বিন্যাসে কোথাও নাঘব খানিকটা অমিল আছে দুই কবির রচনায় । অযোধ্যাকান্ড কন্দলী শেষ করেছেন রামচন্দ্রের অত্রি আশ্রম ও বনান্তর ভ্রমণের কথায় । কৃত্তিবাস বৎসরান্তে গয়াতে রামের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনায় । অরণ্য কান্ডের মুখ্য বিষয় সীতা-হরণ ও সীতা অন্বেষণ । কৃত্তিবাস কবন্ধ বধ ও শবরীর উপাখ্যানেই ইতি টেনেছেন আর কন্দলী চম্পা সরোবরের বর্ণনা দিয়ে শেষ করেছেন । কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের বিষয় সুগ্রীব মিলন, বালীবধ ও সীতান্বেষণ । উভয় কবির বিন্যাস মোটামুটি এক । সুন্দরা কান্ডে একটু পার্থক্য আছে । কন্দলী রামশিবিরে বিভীষণের আগমন দিয়ে শেষ করেছেন । কৃত্তিবাস আর একটু এগিয়ে ভগ্নলোচনের বধ ও লংকাপ্রবেশ । বাল্মীকির যুদ্ধকান্ডকে উভয় কবিই লংকাকান্ড বলেছেন । মূল বিষয়গত ঐক্য থাকলেও বিবরণে বহু অনৈক্য আছে । বহু অন্যকথা যোজনা করেছেন কৃত্তিবাস — যা কন্দলী করেন নি । এই পার্থক্য বা বিভিন্নতার মূল কারণ উভয় কবির রচনাদর্শের ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্য । কন্দলী বলেছেন

সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরিহরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিকর বোলে কাব্যরস কিছো দিল
দুগ্ধক মথিলে যে ঘৃত ॥

অর্থাৎ কন্দলী মূলতঃ বাল্মীকি রচিত কথাকেই সংক্ষেপে লম্ভা বা অসার পরিহার করেই রচনা করেছেন । কিছু কিছু কাব্যকথা আছে বটে, রাজা রস সৃষ্টির জন্য তা করতে বলেছিলেন — আর তা দুগ্ধমন্থনে ঘৃতের মতো স্বাভাবিক বর্ণনার পরিণতির সঙ্গে

সংযুক্ত । কিন্তু কৃত্তিবাসে অনাবশ্যক অর্থাৎ বাল্মীকির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে অসম্পর্কিত বহু বিষয়ে সন্নিযোজনা করেছেন । কারণ কৃত্তিবাস, কন্দলীর মতো কেবল বাল্মীকিকেই অনুসরণ করেন নি, জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পদ্মপুরাণ – পাতাল খন্ড, প্রমুখ নানা স্থান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন । কৃত্তিবাস নিজেও কবুল করেছেন —

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে ।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার ।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥
কৃত্তিবাস পন্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে ।
লঙ্কাকান্ড গাইলেন গীত রামায়ণে ॥

বাল্মীকির প্রতি অবিচলিত একনিষ্ঠ আনুগত্য কন্দলীর উপজীব্য – কৃত্তিবাসে তার একান্ত অভাব । এই কারণে বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণিত তরণীসেন বধ, মহীরাবণ বধ, অকাল বোধন, রাবণের মৃত্যুবাণ প্রমুখ অনপ্রিয় বিষয়গুলি কন্দলীতে পাওয়া যায় না । ছোটখাট বিষয়ের বিন্যাসেও দুই কবির মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অনেক ।

বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে বাল্মীকির ধারা থেকে কন্দলীও খানিকটা সরে এসেছেন, কিন্তু তা বস্তুগত ভাবে নয়, প্রয়োগ গত কৌশলের দিক থেকে । যেমন -- জয়ন্ত কাকের উপাখ্যান–হনুমানের কাছে সীতা বলেছিলেন অশোক বনে অভিজ্ঞান রূপে – তা উভয় কবিই পূর্বে বর্ণনা করেছেন । সুগ্রীব রামের কাছে বালি-বিরোধের বর্ণনা করতে গিয়ে – প্রথম তারার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা গোপন করেছিলেন । কন্দলী ও কৃত্তিবাস উভয়েই কিন্তু তা রামকে প্রথমেই বলেছিলেন । এই প্রস্তুত নিবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয় বিশ্লেষণের মধ্যে দুই কবির পার্থক্য বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে । বাহুল্যবোধে পুনরুক্তি করা থেকে বিরত থাকা উচিত ।

কন্দলী ও কৃত্তিবাস দুজন কবি-ই রামচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে কেবল বিশ্বাসী নয় – রামনাম প্রচারের ব্যাপারে সমান উৎসাহী । কিন্তু বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য হেতু কৃত্তিবাস অপেক্ষা কন্দলী এই ক্ষেত্রেও অধিকতর সংযত । রাবণকেও শেষে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিলেন চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে কন্দলী তা পারেন নি । রাবণ রাবণ-ই থেকে গেছেন ।

রামচরিত্র বর্ণনায় তাঁর প্রেমিকরূপ – সীতা বিরহে ও বনযাত্রার প্রাক্কালে উভয় কবি-ই আলোচনা করেছেন – কিন্তু কন্দলীতে রতিভাবের প্রাধান্য আছে, কৃত্তিবাস সেখানে সাদামাটা । অঙ্গদ রায়বারে অঙ্গদের মতো কৃত্তিবাসের বহু চরিত্রে কৌতুক-রসের প্রাধান্য আছে কন্দলীতে তা অনুপস্থিত । পৌরাণিক সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে রামায়ণেও বর ও অভিশাপ এই দুইটি কাহিনীও চরিত্র নিয়ন্ত্রণের একটি মুখ্য উৎস । কারণে অকারণে দশরথ, রাম, সীতা, রাবণ প্রমুখ কেন্দ্রীয় চরিত্র ও সহায়ক বিভিন্ন চরিত্র অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন আবার হনুমান প্রমুখরা বরে উদ্দীপ্ত হয়েছেন । পতির মৃত্যুতে কৃত্তিবাসের তারা ও মন্দোদরী দুজনেই সীতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কন্দলী কেবল তারার শাপের বর্ণনা করেছেন । তুলনামূলক বিচারে ভাষার তীব্রতা ও ক্রোধের প্রকাশ কন্দলীর তারার বাক্যে সমধিক প্রকাশিত কৃত্তিবাসের তারা –

সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে ।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
*** *** ***
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে ।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥

কৃত্তিবাসের তারা তা কন্দলীর দুইটি পদস্তবকে আরও গাঢ় ও গভীরভাবে প্রকটিত –

বাহুর প্রতাপে তুমি সীতাকে লভিয়া ।
অগণিত পরীক্ষিয়া অযোধ্যাক নিবা ॥

তবু জায়া সীতাদেবী হন্ত মহাশান্তি ।
তোমাক বিছুই অন্তকালে এরিবন্তি ।।
মই যেন মরো হেয়া স্বামীর বিয়োগে ।
তোমাক বঞ্চিব সীতা দেবীর সম্ভোগে ।।
বিছোই লগাইয়া হৃদয়ত দিয়া শাল ।
করিবা কাতর তভো যাইবন্ত পাতাল ।।

মূল রামায়ণে নিসর্গ বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্য অনুপম । এই বিষয়ে কন্দলী মূল কবির প্রেরণায় ও আদর্শে যতটা আগ্রহী ও সার্থক কৃত্তিবাস কবি ঠিক ততখানি উদাসীন । সীতার সঙ্গে ভ্রমণকালে চিত্রকূট, দন্ডকারণ্যের শোভা এবং সীতাহারা রামের চোখে পম্পার বর্ষাশরৎ ঋতুর সৌন্দর্য দর্শনের বেদনা — একটাও কৃত্তিবাসকে আকর্ষণ করেনি ।

স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর ।।
নানা বিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল ।
ধবল রজনী - পূর্ণ চন্দ্র সুশীতল ।।
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ ।
সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত ।।
শয়ন ভোজন তার কিছু নাহি মনে ।
দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে ।।

কৃত্তিবাস চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে একেবারে নীরব কিন্তু কন্দলী চিত্রকূটের বর্ণনা দিয়েছেন —

জাই যূথী বকুল কন্দুলি কর্ণিকার ।
কাঞ্চন টগর কুন্দ শেফালী মান্দার ।।
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হাসি হিসি ।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি ।।   ইত্যাদি

প্রায় দশটি পদস্তবকে সুদীর্ঘ বর্ণনা । শুধু তাই নয়, শৃঙ্গার রস রসিক কন্দলী — এই স্থলেই রামের উক্তির মাধ্যমে সীতার সৌন্দর্যের কাব্যগুণসমৃদ্ধ চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন —

সীতাক সম্বোধি রামে বুলিলা বচন ॥
রাজহংস দেখা সীতা তোমার গমন ।
চক্রবাক যুগল তোমার দুই তন ॥
কলহংস যার কান্তি নূপুরর নাদ ।
বদনকমল তোর দেখন্তে আহ্লাদ ॥
বদন উপরে তোর নয়ন যুগলে ।
খঞ্জন দুতয় যেন চলয়ে কমলে ॥ ইত্যাদি

শুধু নিসর্গ বর্ণনাদি ক্ষেত্রেই নয়, ক্রোধ প্রকাশ তথা আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও কন্দলীর ভাষা থেকে কৃত্তিবাসের ভাষা কোমল, খানিকটা যেন পালশু। রাম বনবাসের পর ভরত অযোধ্যায় এসে সব শুনলেন। কৈকেয়ী-ই শোনালেন নিজের কৃতিত্বের কথা, কি কৌশলে রামকে বনে দিয়ে ভরতকে রাজা করেছেন। কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের ভর্ৎসনা –

নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী ।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী ॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন ।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন ॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥ ইত্যাদি ।

কন্দলীর ভরতের উক্তি –

স্বামী ঘাতিনীক পৃথিবীয়ে কেনে ঘরে ।
ফাট দিয়া লুকাই খৈয়া তোক নমস্বরে ।
শুষিণী নাগিনী নিকারুণী সংহারিণী ॥
নির্দরিণী রাক্ষসিনী বাঘিনী দারুণী ।
যক্ষিণী ডাহিনী তই সুস্বামী ভক্ষিণী ।
পিশাচিনী আরো রান্ডী ভৈলি অলক্ষিণী ॥
সকলো লোকক শোকে মারিলি বিছুই ।
অযোধ্যা রাজ্যত তই ভৈলি মোনশুই ॥

কাহিনীর বিবরণে ও সরল ভাবে কথাবস্তুর বিস্তারে কৃত্তিবাস যতটা উৎসাহী ও পটু – নিসর্গাদি বর্ণনামূলক রচনায় বা আবেগপ্রধান সংহত সলাপের ক্ষেত্রে, কন্দলীর তুলনায় কৃত্তিবাস ততখানি নিষ্প্রভ । তবে অদ্ভুত রসের সৃষ্টিতে বা উৎকট-উদ্ভট বাগবিস্তারে কৃত্তিবাস বহুক্ষেত্রে শ্রোতৃমন্ডলী বা পাঠকবর্গের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছেন । অস্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা তাঁর যোদ্ধারা বাক্যযুদ্ধে বেশি পটু । যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে কল্পনার ক্ষেত্রবিস্তৃতি করাও সহজতর । অঙ্গদ বারবারের সভায় রাবণকে রামের বাণের অর্থাৎ অস্ত্রের একটা ভয়াবহ তালিকা শুনিয়েছিলেন ।

অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ মহাবন ।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ ধরশান ।
গ্রহপতি নক্ষত্র পবন রুদ্র বাণ ॥
সূচীমুখ শিখীমুখ ঘোর দরশন ।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥

ইত্যাদি প্রায় ৬০টি এই জাতীয় অশ্রুত পূর্বনাম আছে ।

কন্দলীও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন – নাম উল্লেখ করে বাণ নিক্ষেপ করেছেন – কিন্তু উৎকট নাম ব্যবহার করেন নি, মাত্রার মধ্যে রেখেছেন তাঁর বাক্যযুদ্ধ – কল্পনা আকাশে উধাও হয়নি ।

এই বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন মনে আসে । প্রভূত জনপ্রিয়তার জন্য কৃত্তিবাসের পুথির বহু পাঠান্তর, সংশোধন এবং সংযোজন পরিবর্জনাদি হওয়াতে – পন্ডিত কৃত্তিবাসের মূল রচনা চিহ্নিত করা কঠিন । যেহেতু রামায়ণ তখন গান-রূপে পরিবেশিত হোতো সেক্ষেত্রে নিসর্গাদি কোন বিশেষ সৌন্দর্য বর্ণনার দ্বারা রসসৃষ্টি অপেক্ষা কাহিনীর বংকিম বিস্তারের মাধ্যমে, উদ্ভট নতুন শব্দ রচনায় অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষাদি অলংকরণের প্রয়োগে শ্রোতৃমন্ডলীর চিত্তাকর্ষণ সহজতর পন্থাটি ছিল । কন্দলীর রামায়ণে পাঠান্তরের কোন প্রমাণ নেই । কাজেই তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় রামায়ণে মূল কন্দলীতেই পাওয়া যায় । কিন্তু কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে তা আলাদা ।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাল্মীকি-কন্দলী-কৃত্তিবাসের রামায়ণের সাদৃশ্যাদি বিচারে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে – কৃত্তিবাস বহু বিষয়ের সংযোজন করেছেন এবং তিনি কেবল বাল্মীকি রচিত রামায়ণে নয়, পুরাণাদি, জৈমিনী মহাভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, লোককথা – সবকিছু থেকেই রামমহিমামূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কন্দলী বাল্মীকির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। মাধব কন্দলী রচিত আদিকান্ড ও উত্তরকান্ড পাওয়া যায় না – মাধবদেব ও শঙ্করদেব তা রচনা করে পূর্ণাঙ্গ সপ্তকান্ড রামায়ণ রচনার সহায়ক হয়েছেন। এই দুই উত্তরকান্ডের অনুবাদকের হাতেও বাল্মীকি কৃত আদি ও উত্তর রামায়ণের যথার্থ অনুবাদ। কাজেই মনে হয় রামায়ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে মাধব কন্দলী ও তাঁর উত্তরসূরিগণ শঙ্করদেব ও মাধবদেব রামায়ণ রচনায় বাল্মীকি ব্যতীত অন্য সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

কন্দলী যে নতুন কথা বলেন নি এমন নয়। অনেক ছোটখাট বিষয় – যেমন জয়ন্ত কাকের বৃত্তান্ত, বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত, শব্দভেদন আনবার কালে হনুমান কর্তৃক কালনেমি বধ – এসব কথা কন্দলী রামায়ণেও আছে। এইগুলি কৃত্তিবাসেও আছে। কোন সমসূত্র থেকে কি উভয় কবি এইসব বৃত্তান্ত আহরণ করেছিলেন? যদি তা না হয়, তবে একজন আর একজনের কাছে ঋণী। কাল-বিচারে মাধব কন্দলী পূর্ববর্তী কবি – কাজেই কৃত্তিবাসই হয়ত সরাসরি দেশ অসমের কাব্য থেকে এটা নিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল – তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে পরবর্তী কোন পুথি লেখক এই চমৎকার কাহিনীগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে সংযুক্ত করেছেন।

বস্তুতঃ বাঙ্গালী ও অসমীয়া সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই প্রবল, বর্ণমালাও প্রায় এক, ভাষাও সহোদরা কাজেই দুই কবির কাব্যের বর্ণনা, সামাজিক সংস্কারাদির সমতা স্বাভাবিকভাবেই কাব্যে প্রবেশ করেছে।

মায়ামৃগ বধ করে রাম ফিরছেন। সীতার সমুদ্বেধ চিত্ত উদবিগ্ন, দুর্নিমিত্ত দেখছেন সব।

আথে যেথে চলিলন্ত আপোনার থাব ।
পাচত শৃগালে কান্দিলেক চন্ডবার ।।
* * *   * * *   * * *

কৃত্তিবাস –

হাতে ধনুর্বাণ রাম আইসেন ঘরে ।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ।।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল ...... দক্ষিণে ।
তোনা পাবা কত করেন রাম মনে ।।

সামাজিক পাপপুণ্যের ধারণা সম্বন্ধে কন্দলী ও কৃত্তিবাসের বিবরণের মধ্যে যে স্মার্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের ঐক্য দেখা যায় তা দ্বারা পূর্বাঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন মেলে । রামের বনযাত্রার পর ভরত এসেছেন অযোধ্যায় । কৌশল্যা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ভরতের যোগ আছে অন্তত: সমর্থন আছে মনে করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন । তখন ভরত নিজে নিষ্পাপ, রাম বনবাসের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য সমকালের প্রথানুসারে কতগুলি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন । কন্দলীর ভরতের উক্তি —

মোহোর কপট যেবে সত্য পটুরাও ।
মিছা যেবে বোলো ব্রহ্ম বধ পাপ পাওঁ ।।
দশ কপি লোক মারো গুরুভার্য্যা হরো ।
রামক পাঠাইলো বনে আত্মঘাত করো ।।
মোর বোলে বুলিলা কৈকেয়ী নিজ মায় ।
ঘোর নরকত তেবে মোর হৌক ঠায় ।।
বচনে দিলেক দান নিদিলে অধর্ম ।
রাজদ্রোহ করিলে যতেক পাপ কর্ম ।।
সব পাপ পাওঁ যেবে মোর আছে মন ।
যত ধর্ম করি আছো পিণ্ড হবে ক্ষুন ।।

কৃত্তিবাসের ভরতের উক্তি –

মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে ।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ।।
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন ।
আমারে করুন বিধি সে পাপ ভাজন ।।
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে ।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ।।
বিদ্যা পেয়ে গুরুকে যে না করে সেবন ।
কর্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ।।
আপনা বাখানে যেবা পর নিন্দা করে ।
সেই মহাপাপ রাশি ঘটুক আমারে ।।
স্থাপ্য ধন হরণেতে যে হয় পাতক ।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক ।।
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই ।
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ।।

এই জাতীয় দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায় । আসলে মোটামুটি এক জাতীয় সংস্কার সংস্কৃতি জীবনবোধ ও সামাজিক চেতনার পরিমন্ডলে উভয় কবির স্থিতি - কাল ব্যবধানের খানিকটা বিভিন্নতা, স্থানের দূরত্ব জনিত কিছুটা পার্থক্য আছে বটে, তবে তা নগণ্য । কারণ মধ্যযুগের ভূগোল - ইতিহাসের মন্থরতার মধ্যে জীবনধারার পরিবর্তন, রাজ্যবিপ্লব না ঘটালে, তেমনটা হতো না । কন্দলী ও কৃত্তিবাস উভয়েই মধ্যযুগের এই ধারার প্রতিনিধি । প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই উভয় কবির রামায়ণ অনুবাদে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় । কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে, পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি গুরুতর কারণ ছিল, বিপুল জনপ্রিয়তার হেতু বিপুল পাঠান্তর । তবুও মূল কাঠামোটির খুব একটা পরিবর্তন হয় নি, এটা ধরে নেওয়া যায় ।

এবার দুই কবির ভণিতা অংশের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে — তাঁদের মানসিকতার ঐক্য ও অনৈক্যের পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক্‌। কন্দলীর কয়েকটি ভণিতা —

১) পরম অমৃত   রামর চরিত্র
শুনা সামাজিক যত।
অসার সংসার   আর আশা এরি
করিয়ো মতি রামত ॥
রামর ভকতি   এহি সে সম্পত্তি
সমস্ত শাস্ত্র সমত।
থিরমন করি   বোলা হরি হরি
নাশোক দুই শপত ॥

২) অযোধ্যা কান্ড শেষে রামের বনবাস সম্বন্ধে কন্দলীর ভণিতা অংশ দীর্ঘ। সেখানে তিনি রামের মহিমার সঙ্গে মন্থরার মতো কুসঙ্গ ত্যাগের কথা বলেছেন —

হেন নিশ্চে জানি   দুঃসঙ্গ তেজিয়া
লৈয়ো সঙ্গ মহন্তর।
তোমাসবে সহিতি   বসি এক প্রীতি
শুনিয়ো কথা রামর ॥
...   .
কলিত সম্প্রতি   নাহি আন গতি
বিনে মাধবর নাম।
মাধব কন্দলী   কহে নিরন্তরে
ডাকি বোলা রাম রাম ॥

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের শেষ ভণিতা —

বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র পদ্য পদ্য ছন্দে ।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ।।
আপোনার বুধি অর্থ যিমত বুজিলো ।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ।।
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে ।
পক্ষী সব উরয় যেন পক্ষা অনুসারে ।।
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে ।
কতো নিজ কতো লম্ভা কথা অনুসারে ।।
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা ।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ।।
রামর চরিত্র বুলি তরিয়ো সংসার ।
অলস ত্যজিয়া রাম বোলা বারে বার ।।

৪) সুন্দরা কান্ডের অন্ত্য ভণিতা-টি দীর্ঘ ।

* * *   * * *   * * *

শুনিয়োক সভাসদ   মধুর কোমল পদ
পুণ্য কথা রামর চরিত্র ।
যমপথ নিবারণ   কলিমল সংহারণ
মহারস শ্রবণে অমৃত ।।
ভবভয় বিনাশন   মহামোক্ষ প্রকরণ
সমস্ত ধর্মরে ইসে সার ।
জানি শুনা যত্ন করি   ডাকি বোলা হরি হরি
তেবে সুখে তরিবা সংসার ।।

৫) লঙ্কাকাণ্ডের শেষ ভণিতাটি সুদীর্ঘ। তার একাংশে কাব্য রচনার ইতিহাস, পৃষ্ঠপোষক মহামানিকের কথা আছে। ভণিতাটি কন্দলীর কাল ও পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ভণিতার প্রথমাংশটি মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি —

রামায়ণ কথা শুনি   শরীর নিষ্পাপ সব
সকল আপদ হেলে তরি।
যত সব ধর্ম্ম চয়   সব অপ্রয়াসে নিজে
ন যাইবেক যমর নগরী॥
গুর্বিনী প্রেপুত্র জনে   রূপবতী কন্যাগণে
মন অভিলাষে পাবে স্বামী।
আর বাঢ়ে পাবে সুখ   আরোগ্য জীবয় লোক
অন্তকালে হোবে স্বর্গগামী॥
...   .
পণ্ডিত লোকর যেবে   অসন্তোষ উপজয়
হাত যোরে বোলে শুধ বাক॥
পুস্তক বিচারি যেবে   তৈত কথা না পবাহা
তেবে সবা নিন্দিয়া আমাক॥
...   .
অগণিত পরীক্ষিয়া   সীতাক অযোধ্যা নিয়া
সকটুযুে ভৈলা একঠাই।
মাধব কন্দলি গাইলা   শ্রীরাম অযোধ্যা পাইলা
জয় জয় আনন্দ বধাই॥

কৃত্তিবাসের ভণিতা সাধারণত: একটি পয়ারে অর্থাৎ দুটি চরণে রচিত। শেষ চরণটিতে কেবল নিজের নাম 'আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।' 'আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।' দুচরণের পয়ারের দৃষ্টান্ত —

১) আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন॥

২) শ্রীরাম যে জন তার হয় সর্বনাশ ।
পাইল অযোধ্যা কান্ডে কবি কৃত্তিবাস ।।

৩) কৃত্তিবাস পন্ডিতের রহিল বিষাদ ।
শ্বশুরের পিন্ডদানে বধূর প্রমাদ ।।

৪) ফুলিয়ার কৃত্তিবাস পায় সুধা ভান্ড ।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কান্ড ।।

৫) জিজটার স্বপ্ন সত্য কহে কৃত্তিবাস ।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশে বিনাশ ।।

৬) কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস ।।

ভণিতার মধ্যে কবির অনুভব ও সহানুভূতির যে প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে উত্তরকালে প্রচলিত পাঁচালী সাহিত্যেও তার অনুরূপ হয়েছিল কিন্তু কৃত্তিবাসে তা একান্ত অস্ফুট । কন্দলীর মতো বিশদ নয়, তবু কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ । বালিবধ রামচরিত্রের একটি কলঙ্ক বলে পরবর্তী সাহিত্যে চিহ্নিত । এমন কি মহাভারতে দ্রোণবধের সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই প্রতারণাপূর্ণ বাক্যে যে পাপ হয়েছে – তা রামের বালিবধের তুল্য – এমন কথা বলেছিলেন অর্জুন । বালিবধে কৃত্তিবাসের ভণিতা –

কৃত্তিবাস পন্ডিতের থাকিল বিষাদ ।
ধার্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ ।।

কিন্তু কন্দলী সরাসরি কোন মন্তব্য করেননি তবু তাঁর ভণিতার মধ্যে করুণাময় রামের বেদনা আভাসিত —

তারার বিলাপ দেখি লক্ষ্মণ সুগ্রীব বীর
শ্রীরামচন্দ্র কৃপাময় ।
বিপরীত শোক শেলে তিনিয়ো শরীর দহে
চক্ষু ঢাকি লোতক বহয় ।।

উপসংহার

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনামূলক মূল্যায়ণকে - কেবল অসমীয়া ও বাঙালী দুই কবির বা রামায়ণের অসমীয়া ও বাংলা অনুবাদক হিসেবে মাত্র গণনা ও হিসেব করলে, মনে হয় খুব বেঠিক ও অযথার্থ কাজ হবে । কারণ মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গটি রামানন্দের শক্তিসঞ্চারে উত্তর ভারতের-সকল দিকে, সকল ভক্তমানসে রামচন্দ্র তথা রামায়ণকে কেন্দ্র করে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল । পূর্ব ভারতে তার দুটি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শীর্ষ কন্দলী ও কৃত্তিবাস । তাঁদের পূর্বাপর স্থিতি, কাল ব্যবধানের সাল তারিখের চুলচেরা বিচার এক্ষেত্রে গৌণ এমন কি অবান্তর-ও বলা যায় । আসলে তাঁরা দুজন রাম-ভক্তি আন্দোলনের, দুই সহোদরা ভাষার ও সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি মাত্র । দুই কবির মানসে রামভক্তির আবেগ যে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল এবং অসমীয়া ও বঙ্গভাষী জনগণের অন্তরে যে রাম-ভক্তির বন্যা সৃষ্টি করেছিল - সেটাই মুখ্য । অবশ্য কন্দলীর কাব্যে শঙ্করদেব ও মাধবদেব ভক্তিরস দিয়েছেন বলে উক্তি আছে। তবে আমা-দের মাত্র পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভণিতাশ্রয়ী আলোচনাতে - রামভক্তির যে কথা সর্বদা দুই কবি আভাসে, কাহিনী বর্ণনার অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে । কিন্তু কাহিনী সংপৃক্ত মুখ্য ভাবে রাম কথা ততোধিক রাম নাম মাহাত্ম্য বর্ণনায় যে দুই কবি সমান ভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন - তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক ।

কন্দলী - প্রণাম সূত্র রূপে সুন্দরাকাণ্ড ও লংকাকাণ্ডের প্রারম্ভে এই দুলড়ীটি দিয়েছেন -

নমো নারায়ণ বিঘিনি খণ্ডন
রঘুর নন্দন রাম ।
সহস্রেক বাহু সহস্রেক শির
যার সহস্রেক নাম ।।
বাপর সত্যক পালিয়া রাঘব
সীতা সমে গৈলা বন ।
বোলন্ত কন্দলি আন গতি নাই
রাঘব দুই চরণ ।। (১১১৫।৪৮৯)

অরণ্য কাণ্ডের শেষে কোন কাহিনীর সঙ্গে অসংযুক্ত একটি রাম প্রার্থনার দুলড়ী আছে । তার খানিকটা অংশ —

নমো নমো রাম　　দূর্বাদল শ্যাম
　　তনু অতি অনুপাম ।
সর্ব পুরুষার্থ　　শিরত প্রকাশ
　　করে যার গুণ নাম ।।
সর্ব শ্রুতিরত্ন　　শিরত বিরাজ
　　যাহার পদ কমল
সর্ব ধর্ম সার　　যার যশরাশি
　　মঙ্গলরো সুমঙ্গল ।।"　(১৩৮৭)

***　　***　　***

মলিন জনর　　ধর্মত কর্মত
　　জানা নাহি অধিকার ।
দুই গুটি অক্ষর　　রাম নাম লৈয়া
　　তরিয়ো সুখে সংসার ।　(৩৩৯০)

***　　***　　***

হেন জানি জন্ম　　জীনৱ সাফলি
　　ধরা মাধবর নাম ।
ডাকি মুখ ভরি　　বোলা উচ্চ করি
　　নিরন্তরে রাম রাম ।।　(৩৩৯১)

এবার কৃত্তিবাসের কাহিনী সম্পর্ক বিরহিত রাম মাহাত্ম্য রচনা —

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।।
সুকৃত জনন দুষ্কৃত দমন শ্রুতি সুখ রামায়ণ ।
শ্রবণ মনন করে যেই জন তারে তুষ্ট নারায়ণ ।।

রামনাম জপ ভাই অন্য কর্ম মিছে ।
সর্বধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে ।।
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে ।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেব লোকে ।।

*** *** ***

অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা ।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ।।
রাম জন্ম পূর্বে সহস্র বৎসর ।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ।।
রামনাম স্মরণে বৎসর দায় এড়ি ।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী ।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ ।।

ভক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় কৃষ্ণকথার উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল – পূর্বপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশংকরদেব । ভক্তি-ধর্মেরই নব রূপ । যেন ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের পর দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের অবতার । ভক্তি ধর্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত । কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম ষোড়শাক্ষের ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

তিনটি নাম – হরি, কৃষ্ণ, রাম । হরি হচ্ছেন স্বরূপে স্থিত অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্ম পুরুষ – অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের দুই রূপ – শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ । এইজন্যই বোধহয় নামের অনুপাত হরি - ৮, রাম - ৪ ও কৃষ্ণ - ৪ ।

যাহোক রামকথা ও রামায়ণ সংস্কৃতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুনরুল্লেখ করি – 'গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি । রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য । ... রামায়ণে ভারত যাহা চায় তাহা পাইয়াছে ।" এই পরম প্রাপ্তির জন্য অসমীয়া ও বাংলা ভাষী মানুষ কবিদলী কৃত্তিবাসের কাছে চিরঋণে বদ্ধ চিরকাল ।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী *

১। অসমীয়া সাহিত্যর চমু বুৰঞ্জী – যতীন্দ্র নাথ গোস্বামী, ৪র্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮৬

২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ড: মহেশ্বর নেওগ, ২য় তাঙৰন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

৩। অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য (১ম খণ্ড), কেশদা মহন্ত, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

৪। অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য (২য় খণ্ড) – কেশদা মহন্ত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৫। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস – বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, সাহিত্য একাডেমী

৬। অসমীয়া সাহিত্য – শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী

৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের [redacted] ইতিবৃত্ত – ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, [redacted] দ্বিতীয় সংস্করণ

৮। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও তুলসীদাসের রামচরিত মানসের তুলনামূলক আলোচনা – তিথী প্রসাদ, ১৯৮৬

৯। বিচিত্র রামায়ণী কথা – কেশদা মহন্ত, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬

১০। বাল্মীকি রামায়ণ – হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলি-কলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪

১১। বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ – রাজেশ্বর বসু, নবম মুদ্রণ, ১৩৯০ বাং

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) – শ্রীসুকুমার সেন, ৩য় সংস্করণ

১৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ), ৬ষ্ঠ সংস্করণ

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্য বিকাশের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫। মাধব কন্দলীর রামায়ণর ভাষা – ড: লীলাবতী শইকীয়া বরা, ১মপ্রকাশ, ১৯৯৩

১৬। মাধব কন্দলীর রামায়ণ (ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা), শ্রী শশী শর্মা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭

* এর সঙ্গে তথ্যসূত্র সূচী – ৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

১৭। রামকথা (হি) ফাদার কামিল বুল্কে – ৩য় সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৭১

১৮। রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত – শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৪ বাং

১৯। রামায়ণ কথা – অমলেশ ভট্টাচার্য, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯

২০। রামায়ণের ইতিবৃত্ত – শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪

২১। সপ্তকান্ড রামায়ণ – মহাপুরুষ মাধব দেব, মাধব কন্দলী, আর শ্রীশ্রীশঙ্করদেব বিরচিত

২২। ষ্টাডিজ ইন দি লিটারেচার অফ আসাম – সূর্য্যকুমার ভূঞা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৬

২৩। অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত – ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা

২৪। বাল্মীকি রামায়ণ – শিশিরকুমার নিয়োগী, এ.মুখার্জি কোং, কলিকাতা ১৩৬৮

২৫। বাল্মীকি রামায়ণ (সংক্ষিপ্ত) বঙ্গবাসী

২৬। কৃত্তিবাসের রামায়ণ (উত্তরা কান্ড) - শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ঘড়াণ বুক হাউস।

২৭। কবি কৃত্তিবাস সংগ্রহ (সংকলন গ্রন্থ) – কবি কৃত্তিবাস স্মারক গ্রন্থ প্রকাশক সমিতি, ফুলিয়া

২৮। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় – সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা

২৯। কৃত্তিবাস পরিচয় – সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় - হুগলী

৩০। বঙ্গ ভাষা সাহিত্য – দীনেশচন্দ্র সেন (পশ্চিমবঙ্গ পর্ষৎ)

৩১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব – রামগতি কাব্যরত্ন (১৩৭১)

৩২। রামায়ণের চরিতাবলী – সুখময় ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা